বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম

চিন্ময় সেনগুপ্ত



বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম

চিন্ময় সেনগুপ্ত

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

BINA OSUDHEY ROG NIRAMOY
PRITIKIN PROGRAM
By
CHINMOY SENGUPTA.
WITH
PRITIKIN DIET RECIPE
By
MANASI SEN

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রকাশক
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫৪

মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র

অগ্রজ

অধ্যাপক মণিময় সেন

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি ডিজেনারেটিভ তথা বিপাকীয় রোগ নিয়ে পৃথিবীতে নানারকম গবেষণা নিত্য চলেছে। এজন্য অর্থব্যয় হচ্ছে প্রচুর, তবু মনুষ্য সমাজে এ-জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

একজন চিকিৎসক হিসেবে আমার মনে হয়, এদেশে ওদেশে সর্বত্র এইসব রোগের মূলে আছে আধুনিক জীবনধারা এবং বিশেষ করে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের ভয়াবহ অজ্ঞতা। কোন্ খাদ্য দেহকে কতটা উপকৃত করে বা কতটা বিপর্যস্ত করে আজও সে খবর সমাজে বহু শিক্ষিতরাও রাখেন না। রোগ-সংক্রান্ত সমস্যাটা তাই আসলে একটা সামাজিক সমস্যা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার শ্রীচিন্ময় সেনগুপ্ত ডিজেনারেটিভ রোগের সমস্যাটিকে সামাজিক সমস্যা বলেই ধরেছেন। এবং তার সমাধান প্রসঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্যে বিপুলভাবে অনুসৃত বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়ের অনন্য সন্ধান—প্রিটিকিন প্রোগ্রাম। সেই সঙ্গে নিরসন করার চেষ্টা করেছেন প্রতিটি প্রধান খাদ্য-উপাদান সম্পর্কে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণা।

ডিজেনারেটিভ রোগ নিরাময় এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীর্ঘায়ুর চাবিকাঠি প্রিটিকিন প্রোগ্রাম—বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শ্রী সেনগুপ্তের এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী
বি. এস. সি ; ডি. এম. এস. ; এম. বি. এস. হোমিও (ক্যাল) ; ডি এফ. হোমিও (লণ্ডন) ; এল. এম. (ডাবলিন) ;
ভারতের রাষ্ট্রপতির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ; হোমিওপ্যাথিক উপদেষ্টা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; জাতীয় উপ-সভাপতি, এল. এম. এইচ. আই. (জেনেভা)

৩২, 'প্যালেস কোর্ট',
১, কিড্ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১৬

প্রসঙ্গ-কথা

আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান চিন্ময় সেনগুপ্ত তাঁর লেখা 'বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়ঃ প্রিটিকিন প্রোগ্রাম'—বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়ে বললেন, 'বইটি সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে হবে'। 'পরিবর্তন' পত্রিকায় তাঁর লেখা যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল—আমি ছিলাম তার একনিষ্ঠ পাঠক। খুব ভালো লাগত—তাঁর লেখা, পরিবেশনের সাবলীলতা এবং তাঁর বস্তুনিষ্ঠ আন্তরিক প্রয়াসকে।

রোগ নিরাময়ের ভাবনা শুধু আজকের নয়—সর্বকালের।

হিমালয়ের পাদদেশে ঋষি সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত ঋষিবরিষ্ঠ ভরদ্বাজ, গর্গ, পরাশর, হারীত, কাপ্য, গোভিল্, শৌনক এবং আরও অনেক অমিততেজা ঋষি। তাঁদের আলোচনাতে প্রথম প্রাধান্য পেল—

রোগাঃকার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরাঃ
দৃষ্ট্যদীন্দ্রিয়শক্তি সংক্ষয়করাঃ সর্বাঙ্গপীড়াকরাঃ।
ধর্মার্থখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ
প্রাণানাষু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ প্রাণিনাম্॥

—অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মূলই দেহ ; দেহ যদি নীরোগ থাকে তবেই ঐ ধর্ম-টর্ম ইত্যাদি লাভ হতে পারে, কিন্তু নীরোগ থাকবার উপায়টা কি ?

সুরলোকের বৈদ্য ধন্বন্তরি একদিন অলকানন্দার তীরে ধ্যানরত। তাঁর মনে হল, কোহরুক ? কে অ-রোগী ? গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঋষির মাথার উপর দিয়ে একটা পাখিও উড়ে যেতে যেতে যেন ডেকে উঠল, 'কোহরুক'। ঋষি ভাবলেন, তাহলে পাখিটার মনেও ঐ চিন্তা এসেছে। ধ্যানস্থ হলেন তিনি। তাঁর মনে হল—

'জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্'।

ঋষি ভাবলেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর বোধহয় তিনি পেয়েছেন। পাখি আবার ডেকে উঠল, 'কোহরুক ?' তাহলে কি সঠিক উত্তর পাননি ?. আবার ধ্যানস্থ হন ঋষি। এবার তাঁর মনে হয় —

'জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্ শত পদগামী বাম শায়ীচ'।

—অর্থাৎ পূর্বাহার জীর্ণ হলে, হিতকর খাবার পরিমিত মাত্রায় আহারের পর, শ্রমশীল মানুষ যদি শতপদ ভ্রমণ করে বামপাশে শয়ন করে, তবে সে অরোগী থাকবে।

কিন্তু এবারও সেই পাখি 'কোহরুক, কোহরুক', ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ঋষি বুঝলেন তখনও ঠিক উত্তর পাননি। পুনরায় ধ্যানে বসলেন তিনি। আর তাঁর মনে ভেসে উঠল—

'জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্ শত পদগামী বাম শায়ীচ।
অবিজীত মূত্র পূরীযি খগেন্দ্র সোহরুক, সোহরুক, সোহরুক'॥

—অর্থাৎ হে খগেন্দ্র। পূর্বাহার জীর্ণ হলে, হিতকর খাবার পরিমিত মাত্রায় আহারের পর, শ্রমশীল মানুষ যদি শতপদ ভ্রমণ করে বামপাশে শয়ন করে এবং কখনও মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, তবে সে অরোগী থাকবে।

আরও পিছনের দিকে ফিরে তাকাই।

'সমবেতা যুযুৎসব' কুরুক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি—এই সবগুলোর বিশেষ রূপে বৃদ্ধিকর অথচ রসযুক্ত, সারবান এবং দেখামাত্রই আনন্দ দেয়, এইরকম আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী খাবারগুলো হৃদয়ের সন্তাপাদি, চিত্তের অপ্রসন্নতা আর খাবার পরে রোগ সৃষ্টি করে—এইগুলো রাজসিক ব্যক্তির প্রিয়। প্রস্তুত হওয়ার পরে ১ প্রহর অতীত হয়ে গেছে, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, আগের দিনের রান্না, অন্যের উচ্ছিষ্ট এবং অখাদ্য—এইগুলো তামসগণের প্রিয়।

এবার ঐ পুরনো দিনের কথা ভুলে এ যুগের দিকে দৃষ্টি মেলি।

নিরামিষাশী জর্জ বার্ণাড শ একবার এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন—It is as plain as pike-staff that man can get his three score and ten out of beef steaks just as out of bread and cheese. The real question is—does he get a higher or lower quality of life out of the beaf steaks? I believe he gets a lower.

তাঁর কবিতা 'Song of peace'-এ আরও সুন্দর করে বললেন—

We are the living graves of murdered feasts
Slaughtered to satisfy our appetites
We never pause to ponder at our feasts.

—সত্যিই তাই। আমরা কখনও ponder করিনা আমরা কি খাব, কি খাবনা। অথচ তারই ভেতর লুকিয়ে আছে আমাদের জীয়নকাঠি আর মরণকাঠি। কাজেই খাদ্যের ব্যাপারে চোখ বুজে বসে থাকার দিন আর নেই।

মনীষী লিও টলষ্টয় এই আহারের ব্যাপারেই তাঁর বই 'First Step'-এ মজার উদাহরণ দিয়ে বললেন—We cannot pretend that we do not know this. We are not ostriches, and can not believe that if we refuse to look at what we do not wish to see, it will not exist. This is especially the case when what we do not wish to see is what we wish to eat.

এই প্রসঙ্গে যাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার জনক বলা হয় সেই মনীষী হিপোক্রেটসের একটা অতুলনীয় নির্দেশ মনে পড়ছে—

Your means of cure should be means of nourishment and your means of nourishment should be means of cure.

—'Nourishment'-এর মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে সুস্থ থাকার সঞ্জীবনী মন্ত্র। এ কথা শুধু সাগর পারের ঋষিরই নয়, ভারতবর্ষের ঋষি বাগভট্টও তাঁর আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে বলেছেন—সকল ব্যাধিই ঔষধের বিনা সাহায্যে কেবলমাত্র উপযুক্ত পথ্যের দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রকৃত পথ্যের অভাব হয় তাহা হইলে শত ঔষধেও আরোগ্য করিতে পারে না।

প্রিটিকিনের পথ্য-সংক্রান্ত নির্দেশ মানুষের কল্যাণবার্তা নিয়ে আসবে সন্দেহ নেই, এদেশে সব দেশে। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে, ঋতুভেদে, প্রকৃতিভেদে, এর পরিমার্জন হয়তো প্রয়োজন হবে কখনও কখনও। কারণ আইনষ্টাইনের যুগে মানুষকে আজ শুধু ত্রিমাত্রিক পটভূমিকাতেই বিচার করব না, চতুর্মাত্রিক বিচারও আজ অপরিহার্য। সেই চতুর্মাত্রিক চিন্তাভাবনা গ্রন্থকার শ্রীচিন্ময় সেনগুপ্ত সুন্দর করে জাগিয়েছেন।

কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক: ট্রাষ্টি বোর্ড,
শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ পরিষদ;
উপ-সভাপতি:
পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতি;
সদস্য: পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ।

৮৯, অরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৫

নিবেদন

নাথান প্রিটিকিন তাঁর প্রিটিকিন প্রোগ্রামের মাধ্যমে অকালে জীবননাশী সভ্যতার নানা ব্যাধি—হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, হাঁপানী প্রভৃতির সফল নিবারণ ও সার্থক নিরাময়ের সন্ধান দিয়েছেন পাশ্চাত্য জুড়ে। আমার নিজের দেশের অগণিত রোগজীর্ণ মানুষও প্রিটিকিন-নির্ধারিত আহার বিধি এবং দেহচর্চার অনুসরণে নীরোগ দেহ আর দীর্ঘ জীবন ফিরে পাবে—এই প্রত্যয়েই প্রিটিকিন প্রোগ্রাম নিয়ে গ্রন্থ রচনা।

এ-প্রসঙ্গে আমি স্বর্গত নাথান প্রিটিকিনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষে তাঁর প্রোগ্রামের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে আমাকে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছেন তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের কথা অগ্রজপ্রতিম ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জানালে তিনি আমাকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'পরিবর্তন' পত্রিকায় বৎসরাধিক কাল ধরে 'প্রিটিকিন-পথ্য' সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করবার সুযোগ দেন। একটি সংবাদ সাপ্তাহিকের সম্পাদক হিসাবে রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্যের সমাচার দেশবাসীর গোচরে আনার জন্য তাঁর আন্তরিক ব্যাকুলতা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এই সুযোগে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাচ্ছি।

এছাড়া প্রিটিকিন প্রোগ্রামটিকে স্থান-কালে-পাত্র ভেদে যথার্থ ভারতীয় করে তুলতে স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত আমাকে প্রচুর উৎসাহ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

'পরিবর্তন'-এ প্রচ্ছদ-কাহিনী হিসাবে পর পর প্রকাশিত হলে অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে পেয়েছি অজস্র অভিনন্দন। বন্ধু

খ্যাতনামা চিকিৎসকও জানিয়েছেন তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। প্রোগ্রামটি সর্বস্তরে এইভাবে সমাদৃত হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। জনহিতের উদ্দেশ্য নিয়ে যে কোন সামান্য কাজেও যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়, সে কথাই আমাকে উপলব্ধি করবার সুযোগ দিয়েছেন এঁরা।

'পরিবর্তন'-এরই জনৈকা প্রবাসী পাঠিকা শ্রীমতী মানসী সেন সুদূর নিউজিল্যাণ্ড থেকে **বাঙ্গালীর প্রিটিকিনী রান্নার রেসিপি** পাঠিয়ে ভারতে এই প্রোগ্রাম অনুসরণের একটা বাস্তব বাধা দূর করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতী সেনের কাছে তাই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ রচনার বিবিধ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন পরম পূজনীয়া পরিব্রাজিকা আনন্দহৃদয়া, পরিব্রাজিকা বেদহৃদয়া, শ্রীমতী অপর্ণা সেনগুপ্ত, ডক্টর সুখময় সেনগুপ্ত, শ্রীবিমল সেন এবং আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীশ্যামল নায়েক, শ্রীঅমিয় কুমার গিরি ও শ্রীপূণ্য চন্দ্র হাজরা। গ্রন্থটি প্রকাশের সময় এঁদের মূল্যবান অবদানের কথা বার বার মনে পড়ছে।

সুখ্যাত প্রকাশক শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল, প্রিটিকিন তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই গ্রন্থটি সযত্নে প্রকাশ করেছেন। এ জন্যে আমি ঐ সংস্থার, বিশেষ করে, শ্রীশংকর মণ্ডলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি রোগাক্রান্ত তথা স্বাস্থ্য-সচেতন পাঠক-পাঠিকার যথার্থ উপকারে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

চিন্ময় সেনগুপ্ত

'নিরিবিলি'
ডাকঘর : ঝাড়গ্রাম
পিনকোড : ৭২১.৫০৭

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়ঃ প্রিটিকিন প্রোগ্রাম'—গ্রন্থটি দীর্ঘ শ্রম ও যত্নের পর গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই ক'মাসের মধ্যেই literally নিঃশেষ হয়ে গেল। এই অতি প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যচেতনার জন্য বঙ্গভূমি (পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশ), ভারত এবং পাশ্চাত্যের প্রবাসী বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এঁদের উৎসাহ ও শুভেচ্ছা সম্বল করে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

বর্তমান সংস্করণে মানব-প্রেমিক স্বর্গত নাথান প্রিটিকিন সাহেবের শেষ গ্রন্থ 'The Pritikin Promise: 28 Days To A Longer Healthier Life' থেকে অনেক তথ্য পরিবেশিত হল। এছাড়া আহার্যের মধ্যে কোলেসটেরল, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, আর দেহচর্চার মধ্যে হাঁটা ও জগিং সম্পর্কে সংযোজিত হল সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য।

আশা করি, এই সংযোজন প্রিটিকিন অনুসারী ও আগ্রহী নবীন স্বাস্থ্যামোদী এবং রোগাক্রান্তদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

আমার এই উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা, যাঁরা আমাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি এবং সেই সঙ্গে কামনা করছি অগনিত অজানিত পাঠক-পাঠিকার সহৃদয়তা।

চিন্ময় সেনগুপ্ত

'নিরিবিলি'
ডাকঘর : ঝাড়গ্রাম
পিনকোড : ৭২১.৫০৭
কলকাতা দূরভাষ : ৫৫-৪২১৪

বিষয়-সূচী

প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টারের বিদায়ী রোগী জর্জ পেরীর সঙ্গে সহাস্য নাথান প্রিটিকিন।



যে-হৃদরোগে একমাত্র পথ ছিল শল্য চিকিৎসা তাই নিয়ে বাঁচবার শেষ চেষ্টায় সেণ্টারে ভর্তি হয়েছিলেন পেরী। চার সপ্তাহের প্রোগ্রাম শেষে রোজ ৭ মাইল হাঁটবার সামর্থ্য নিয়ে তিনি বিদায় নিচ্ছেন সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক সেই নাথান প্রিটিকিনের থেকে যিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে সারা পৃথিবীর চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করে উদ্ভাবন করেছেন বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়ের এক অনন্য পদ্ধতি, শুধু তাই নয় এরই সাথে আমেরিকা ও ইউরোপে যিনি আবিষ্কার করেছেন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং ইলেকট্রনিক্সের ৫০টি পেটেণ্ট।



সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন সিনিয়র অলিম্পিকে ১ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ক্রমান্বয়ে ১০টি স্বর্ণপদক বিজয়িনী ৮৫ বছরের যুবতী প্রিটিকিন অনুসারী ইউলা উইভার।

৮১ বছর বয়সে শ্রীমতী উইভার যখন প্রিটিকিন প্রোগ্রাম শুরু করেন তখন তিনি ক্লডিকেশন, কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর, হাই ব্লাড প্রেশার এবং আরথ্রাইটিসের রোগী। এর ৪ বছর পর ১৯৭৪ সালে ৮৫ বছরের যুবতী ইউলা, আরভিনের (ক্যালিফোরনিয়া) সিনিয়র অলিম্পিকে আধ ও এক মাইলের দৌড়ে লাভ করেন ২টি সোনার মেডেল। ৮৬ বছর ৬ মাসে ঐ একই প্রতিযোগিতায় পান ৪টি সোনার মেডেল। ৯১ বছর বয়সে তাঁর প্রাপ্ত মেডেলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের 'সার্কুলেশন' পত্রিকায় Dr. Nash বলেন :

সন্দেহাতীতভাবে প্রিটিকিন প্রোগ্রামই সর্বপ্রথম হৃদরোগ 'নিরাময়' করতে সমর্থ হয়েছে।

মিয়ামি হার্ট ইনস্‌টিটিউট-এর Dr. Lehr-এর মন্তব্য :

আন্তর্জাতিকভাবে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করলে পৃথিবী থেকে হৃদরোগ একেবারে অন্তর্হিত হবে।

কেন্টাকি মেডিক্যাল সেণ্টার ইউনিভার্সিটির Dr. J. Anderson-এর অভিমত :

প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ৩০-৯০ দিনের মধ্যেই ৮০% ডায়াবেটিস রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

আমেরিকার লোমালিণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষক দল লক্ষ্য করেন প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করে মাত্র ২৮ দিনে গড়ে—

৮৬% রোগীর হাই ব্লাডপ্রেশার শুধু যে স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে তাই নয়, কোনো ওষুধেরই আর প্রয়োজন হয় না ; কোলেসটেরল-মাত্রা 300 mg.% থেকে 175 mg.% এ নেমে আসে, ৬২% অ্যানজাইনা রোগী ওষুধ-মুক্ত হন, ৯০% ডায়াবেটিক রোগীর ব্লাড সুগার স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে ; ওষুধ-মুক্ত হন ৭০% বাতের রোগী ; মেদভার কমে যায় ৪ সপ্তাহে ৬ কেজি, ধূমপান ত্যাগ করেন ৮৫% ধূমপায়ী ; আরথ্রাইটিস, স্পনডিলাইটিস ও হাঁপানী রোগীদের অবস্থার অভাবিত উন্নতি হয়, ৮০% হৃদরোগী যাঁদের বাইপাস-সার্জারি অত্যাবশ্যক বলে নির্ধারিত হয়েছিল, তারা ঐ ব্যয়বহুল সার্জারি থেকে নিরাপদ অব্যাহতি লাভ করতে পারেন।

প্রখ্যাত জরাতত্ত্ববিদ্‌ J. Bjorksten বলেন :

প্রিটিকিন প্রোগ্রামই হচ্ছে যেকোন মানুষের আয়ুষ্কালের সঙ্গে তারুণ্য-দীপ্ত ২০-৩০ বছর যোগ করার সর্বোত্তম পন্থা।

ওষুধও ছাড়িনি, অসুখও সারেনি

যদি বলি, সভ্যতার কোন অসুখই ওষুধে সারে না, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। যদি বলি, আমরা ডাক্তার দেখাই অসুখ সারাতে নয়, অসুখ কমাতে—আপনি হয়তো চমকে উঠবেন। বলবেন, তাহলে এই যে স্পেশালিস্টদের চেম্বারে হাজার হাজার রোগী ভিড় করছেন, এঁরা কি অসুখ কমাতেই যাচ্ছেন, সারাতে নয়? ওষুধের কি কোন মূল্যই নেই?

ওষুধের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। নতুন নতুন ওষুধ, উন্নততর চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের অপুষ্টিজনিত রোগ, যেমন—স্কারভি, রিকেট, বেরিবেরি প্রভৃতি এবং সংক্রামক রোগ, যেমন কলেরা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি থেকে নিশ্চয়ই যথার্থ মুক্ত করতে পারে। কিন্তু এসব বাদ দিলেও আছে অকালে জীবননাশী সভ্যতার অগণিত ব্যাধি—সেই হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি যাদের একটিরও পিছনে অপুষ্টি বা সংক্রমণের কোন ভূমিকা নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওষুধে এইসব ডিজেনারেটিভ (metabolic) রোগ কোনদিনই সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না সাময়িকভাবে প্রশমিত হয় মাত্র।

কিন্তু ডিজেনারেটিভ রোগগুলি ওষুধেই নির্মূল হবে—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের মনে এসেছে সংক্রামক রোগ দমনে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের নিশ্চিত সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকে। এই বিশ্বাসেই কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে ঐ রোগগুলি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ব্যয়বহুল গবেষণায়। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে ওষুধ দিয়ে ঐ সব রোগের মূলে অব্যর্থ আঘাত করা যাচ্ছে না। কেবল 'জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে'র মতো একট অবস্থা চলেছে।

এই ওষুধ-সভ্যতার ফল কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে Dr. S. Mendelsohn তাঁর 'The Confessions of a Medical Heretic' গ্রন্থে আলোচনাক্রমে জানিয়েছেন ঃ

১৯৭৩ সালে ইসরাইলে এবং ১৯৭৬ সালে কলম্বিয়াতে ডাক্তাররা ধর্মঘট করলেন, জানালেন—এমারজেনসি ছাড়া অন্য কোন রোগীদের চিকিৎসা তাঁরা করবেন না। চিকিৎসা হল না। রোগী ওষুধ পেল না। কিন্তু যথাসময়ে বার্ষিক হিসাব নিয়ে দেখা গেল ডাক্তার ধর্মঘট সত্ত্বেও ইসরাইলে রোগীর মৃত্যুর হার অর্ধেক হয়েছে আর কলম্বিয়াতে মৃত্যু-হার কমে গেছে ৩৫ শতাংশ!

●

সভ্যতার নানা ব্যাধি—ডিজেনারেটিভ রোগগুলি হাল আমলের। বিশ শতাব্দীতে সমস্ত শিল্পোন্নত দেশে যখন মানুষের আয় বাড়ল, রসনার তৃপ্তির জন্য প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক খাদ্যকে করা হল অতিমাত্রায় বিকৃত, বেড়ে উঠল মানসিক চাপ (stress), আর কমে গেল শরীর চালনার সময়, সুযোগ এবং প্রবৃত্তি—তখনই দেখা দিল ঐ সব রোগের প্রাদুর্ভাব।

আজকের সমাজে অকালে জীবননাশী ডিজেনারেটিভ রোগ মানুষের ঘরে ঘরে। আর অগণিত শোক-সন্তপ্ত পরিজনদের মনে জাগছে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন—

এই পরিস্থিতি থেকে কি পরিত্রাণ নেই?

—এই পরিত্রাণের খবর এসেছে আমেরিকার সান্টা মনিকার (ক্যালিফোর্নিয়া) 'PRITIKIN LONGEVITY CENTER থেকে। ওষুধ নয়, কোন স্বপ্নদত্ত জড়িবুটি নয়, কোন তুক-তাক বা ম্যাজিক নয়, কোন অপারেশন নয়—শুধুমাত্র আহার-বিধি আর স্বাভাবিক দেহচর্চার প্রয়োগে সব রকমের ডিজেনারেটিভ রোগকে সাফল্যের সঙ্গে নির্মূল করে চলেছে নাথান প্রিটিকিন প্রতিষ্ঠিত প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টার'।

যে-আমেরিকা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির শিখরে, যেখানে রোগ নিরাময়ের জন্য নিত্য নতুন ওষুধ ও পদ্ধতির আবিষ্কার, সেই আমেরিকারই বুকে বসে নাথান প্রিটিকিনের লন্‌জিভিটি সেণ্টার মৃত্যুপথযাত্রী হাজার হাজার মানুষকে বিনা ওষুধে রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবনের আশ্বাস দিচ্ছে।

কে এই প্রিটিকিন?

আমেরিকায় গত দশ বছর ধরে সভ্যতা-ব্যাধিগ্রস্ত অগণিত মানুষকে অতি অল্প সময়ে অত্যাশ্চর্যভাবে রোগমুক্ত করেছেন নাথান প্রিটিকিন। প্রাচীন ও আধুনিক কালের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সারা আমেরিকা জুড়ে খাদ্যবিধান ও স্বাস্থ্য নিয়ে প্রিটিকিনের রক্তপাত-হীন বিপ্লব। শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশে, অস্ট্রেলিয়ায়, মানুষের কাছে আহার ও জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রিটিকিন উন্মোচন করেছেন এক নতুন দিগন্ত।

ইতিপূর্বে আহারবিধি ও দেহচর্চার নিরাময় গুণ নিয়ে গবেষণাকালে প্রিটিকিন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ অব পেডিয়াট্রিক মেডিসিনের পুষ্টিতত্ত্ব গবেষণা বিভাগের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা।

এরপর গবেষণার বাস্তব প্রয়োগে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে ১৯৭৫ সালে প্রিটিকিন আমন্ত্রিত হন আমেরিকার 'কংগ্রেস অব রিহ্যাবিলিটেশন' এবং 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন'-এর বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে। সেখানে বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রিটিকিন পেশ করেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সে সবের সাফল্য সম্পর্কে নানা তথ্য ও বিবরণ। প্রিটিকিন পদ্ধতি বা 'Pritikin Program' এই সম্মেলন-গুলিতে লাভ করে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের বিপুল সমর্থন এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় পাশ্চাত্য জুড়ে।

হাজার রোগের একটি দাওয়াই
প্রিটিকিন প্রোগ্রাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার পক্ষ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন নাথান প্রিটিকিন। যুদ্ধ-জনিত মানসিক চাপের ফলে জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার গবেষণা করে তাঁকে রিপোর্ট দিতে হত। এই মানসিক চাপকেই তখন হৃদরোগের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হত।

প্রিটিকিন সেই কাজে নেমে লক্ষ্য করলেন, অবিরাম বোমা বর্ষণের দুঃসহ মানসিক চাপের ফলেও যুদ্ধপীড়িত মানুষের মধ্যে হৃদরোগ এবং অন্যান্য ডিজেনারেটিভ রোগের হার অদ্ভুতভাবে কম! প্রিটিকিন অবাক হয়ে গেলেন! তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে যুদ্ধকালীন খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ফলেই রোগ আক্রমণের হার কমে আসছে।

তাঁর নিজের তখন চলেছে অসম্ভব কর্মব্যস্ত জীবন। খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম, সময় নেই। শরীরচর্চার কোন অবসর নেই। সারাদিন শুধু রোগ ও চিকিৎসা নিয়ে অক্লান্ত গবেষণা আর ঐ-সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ।

যুদ্ধ, মানসিক চাপ, হৃদরোগ নিয়ে এইভাবে দিনের পর দিন ব্যস্ত থেকে মাত্র ৪২ বছর বয়সে একদিন হঠাৎ তাঁর নিজেরই হৃদরোগ ধরা পড়ল। দেখা গেল হার্টের অবস্থা বিপদজনক। এই আকস্মিক অসুস্থতায় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। স্বাস্থ্যের এমন অবনতি হল যে তখন মাত্র কয়েক ফুটের বেশি হাঁটাচলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডাক্তাররা বললেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে। প্রিটিকিন অনুভব করলেন এই অবস্থায় দীর্ঘদিন তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের হাতে এইভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজি হল না নাথানের উদ্ভাবনী মন। প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি ছেড়ে তিনি শুরু করলেন নতুন কোন পদ্ধতির অনুসন্ধান। ঐ সময় উন্নত দেশগুলিতে হৃদরোগ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। মানসিক চাপের প্রভাব ছাড়াও হৃদরোগ প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে খাদ্য ও দেহচর্চার ফলাফল নিয়ে পশুদের উপর শুরু হয়েছে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রিটিকিনও তাঁর চিন্তাধারার ভিত্তি করলেন খাদ্য ও দেহচর্চা নিয়ে সেই-সময়ের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর।

প্রথমত, তিনি দেখলেন যে প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণকারী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হৃদরোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করলেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব অভাবিত ভাবে কমে গেছে। এর উপর বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখালেন যে পশুদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আহার্যের পরিবর্তন করে হৃদরোগ নিরাময় সম্ভব। তাছাড়া সমস্ত রক্তবাহী নল বা ধমনী বন্ধ হয়ে গেলেও নিয়ন্ত্রিত দেহচর্চার ফলে শরীরে নতুন রক্ত সংবহনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব।

প্রিটিকিন ঠিক করলেন যেহেতু হৃদরোগের সঙ্গে সন্দেহাতীত-ভাবে জড়িত কোলেসটেরলের মাত্রাবৃদ্ধি, তাই তাঁর নিজের চিকিৎসার প্রথম লক্ষ হবে অতিরিক্ত কোলেসটেরল-মাত্রাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রিটিকিন ডিম, চর্বি, মাংস, মাখন প্রভৃতি সমস্ত কোলেসটেরল-সম্পন্ন খাদ্য বর্জন করে পুরোপুরি প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক খাদ্য অর্থাৎ খাদ্যশস্য, শাক-সবজি, ফলমূল খেতে শুরু করলেন। দু-সপ্তাহ অন্তর পরীক্ষা করা হতে থাকল তাঁর রক্তের বিভিন্ন উপাদান। প্রথম ১৮ মাসে কিছু ফল হল। কোনরকম শারীরিক অবনতি ছাড়াই

কোলেসটেরল-মাত্রা নেমে এল 300 mg% থেকে 160 mg%-এ। একই রকম খাদ্য গ্রহণ করে পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে আশ্চর্যভাবে কোলেসটেরল-মাত্রা নেমে দাঁড়াল 100 mg%। অর্থাৎ, এমন সন্তোষজনক মাত্রায় যা একজন মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সচরাচর দেখা যায় না।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হল খুব সন্তর্পণে মাত্রা বাড়িয়ে অল্প-স্বল্প চলাফেরা।

এইভাবে যখন প্রতিদিন ২ মাইল করে হাঁটতে পারেন, তখন তাঁর হার্টের ই সি জি-তে দেখা গেল অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। যখন প্রতিদিন ৪ মাইল করে হাঁটলেন তখনও হার্টের কোন গোলযোগ দেখা গেল না। শেষে যখন প্রতিদিন ৬-৭ মাইল করে দৌড়তে শুরু করলেন, তখন ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করে সানন্দে ঘোষণা করলেন—প্রিটিকিন সম্পূর্ণ হৃদরোগমুক্ত! এবং সচরাচর হৃদযন্ত্রের এমন ভাল অবস্থা খুবই কম দেখা যায়।

এইভাবে নিজেকে দিয়ে পরীক্ষা করে আপন সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রিটিকিন সর্বপ্রথম লস এনজেলেস-এর ভি এ হাসপাতালে হৃদরোগীদের আরোগ্যের দায়িত্ব নেন। শুরু হয় প্রিটিকিন প্রস্তাবিত আহার্য—'প্রিটিকিন ডায়েট', আর সেই সঙ্গে নির্ধারিত দেহচর্চা 'রোভিং'-এর সমন্বয়ে—'প্রিটিকিন প্রোগ্রাম'।

সাফল্য আসে অপূর্বভাবে।

হাসপাতালের রোগীদের ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু বিশিষ্ট রোগীর নিরাময় সম্ভব করে প্রিটিকিন তাঁর প্রোগ্রামের সার্থকতা, সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। এর অব্যবহিত পরেই গবেষণার ব্যাপক বাস্তব প্রয়োগেব জন্য সান্টা মনিকায় (ক্যালিফোর্নিয়া) প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেন্টার'।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই সেণ্টার প্রতিষ্ঠার ৫-৬ বছর পরেই শুধু হৃদরোগই নয়, নানা ধরনের ডিজেনারেটিভ তথা বিপাকীয় রোগগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের চিকিৎসায় অবিশ্বাস্য রকম সাফল্য লাভ করে, নাথান প্রিটিকিন নাটকীয়ভাবে প্রভাবিত করেন পাশ্চাত্য জীবন-যাপন পদ্ধতিকে।

সেণ্টারে দেখা গেছে এই প্রোগ্রাম অগণিত অপ্রধান রোগ ছাড়াও কমপক্ষে কুড়িটি প্রধান রোগের ক্ষেত্রে আনে সার্থক নিরাময়।

লন্‌জিভিটি সেণ্টারে প্রিটিকিন প্রোগ্রামের এই সাফল্যের কথা প্রথম দিকটায় মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়েছিল। তারপর থেকে নানা পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারিত হতে থাকে।

●

সেণ্টারে রোগীদের **চার সপ্তাহ** শুধু নির্ধারিত খাদ্য এবং স্বাভাবিক দেহচর্চার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। এই নির্ধারিত খাদ্য তালিকায় থাকে খাদ্যশস্য, শস্যজাত খাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল আর মাখন-তোলা দুধ। মাছ-মাংস থাকে রীতিমতো অল্প পরিমাণ, বাদ দেওয়া হয় সবরকমের ফ্যাট, ডিমের কুসুম, শর্করা, ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি। এর সঙ্গে স্বাভাবিক দেহচর্চার মধ্যে অবস্থাবিশেষে থাকে সাধ্যমতো হাঁটা, জগিং বা দৌড়ানো।

এই চিকিৎসার ফলে ওষুধপত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত কমে যায়, নয়তো ওষুধ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ রোগীই দেহ-মনে আশাতীত উন্নতি লাভ করেন। তাঁদের রোগ-লক্ষণ প্রায় অপসারিত হয়ে যায়। রক্তের অবস্থার উন্নতি হয়, রক্তচাপ কমে যায়। পূর্ব-ব্যবহৃত ওষুধের বিষম প্রতিক্রিয়া থেকেও দেহ মুক্ত হয়। পরিপাক ও রেচন ক্ষমতা উন্নত হয়। শিথিল যৌন জীবনে দেখা দেয় সম্ভবমত পুনরুজ্জীবন!

চার সপ্তাহের প্রোগ্রামে প্রতিদিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে থাকে প্রত্যেক রোগীর রক্তচাপ এক বা একাধিকবার পরীক্ষা করা। রোগীরা তাঁদের সাধ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যমত হাঁটেন এবং অল্প অল্প করে বারে বারে সারাদিনে কত মাইল হাঁটলেন তার হিসাব রাখা হয়। তাঁদের খেতে দেওয়া হয় সারা দিনে মোট ৮ বার। তাছাড়া তাঁদের প্রতিদিন রোগ-নিরাময়ে প্রিটিকিন প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বোঝান হয় বক্তৃতা ও নানা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

যখন চার সপ্তাহ পরে রোগীরা বাড়ী ফেরেন তখন দেখা যায় আজীবন এই প্রোগ্রাম অনুসরণ করার জন্য তাঁদের দারুন উৎসাহ।

এর প্রথম কারণ তাঁরা বোধ করেন যে প্রিটিকিম প্রোগ্রামে অল্পকাল মধ্যে তাঁদের দেহ-মনের যে অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটেছে তা আজীবন বজায় রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সেণ্টারে থাকাকালীন তাঁরা বুঝেছেন কেন এবং কীভাবে তাঁদের এই অভাবিত উন্নতি ঘটল। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে প্রোগ্রামটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা হওয়ার ফলেই তাঁরা বাকি জীবন অবিচলিতভাবে অনুসরণ করে চলেন প্রিটিকিন প্রোগ্রাম।

দীর্ঘ যৌবন লাভের মোক্ষম উপায়

রসে বশে না থেকে যাঁরা চান রসের বশে থাকতে, যাঁরা স্বাস্থ্যের কথা ভালবাসেন না, ভালবাসেন রসনার মধ্য দিয়ে লোভের পরিতৃপ্তি তাঁদের—

প্রিয় খাদ্য ঃ তেল, ঘি, মাখনের ঢালাও প্রয়োগে সবজি-মাছ-মাংস-ডিমের বিবিধ রান্না,

প্রিয় শ্লোগান ঃ 'কোরমা কালিয়া পোলাও—জলদি লাও, জলদি লাও'। তদুপরি—'মিহিদানা, পুলিপিঠে, জিভেগজা মিঠেমিঠে'—সেসব তো আছেই!

এই ধরনের আহার্যের মূল কথা ঃ অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন প্রোটিন-প্রধান খাদ্য যা অনেকটাই চলতি আমেরিকান ডায়েটের মতো।

কিন্তু মুশকিল হল, এ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণে কখনোই সম্ভব নয় সুস্থ দেহে দীর্ঘদিন বাঁচা।

শতকরা ৫০ জন আমেরিকানের পরিণত বয়সের আগেই স্ট্রোক অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আরথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস এবং ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। ক্ষীণ হতে থাকে দৃষ্টিশক্তি এবং খাদ্যের স্বাদ গন্ধ তারতম্য করবার ক্ষমতা। স্পর্শানুভূতিও কমতে শুরু করে। মোট কথা তাঁদের জীবনের গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

এই খাদ্যরীতি গ্রহণ করলে বার্ধক্য ধারে-কাছে ঘেঁষবে না

—আপনার পূর্বপুরুষরা কি দীর্ঘজীবী ছিলেন? হয়তো ছিলেন। কিন্তু এই উত্তরাধিকার আপনার দীর্ঘজীবন লাভের কিছুটা সপক্ষে হলেও সুস্থ, নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের সপক্ষে নয়।

অনেকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র পরিমিত নিয়মিত ব্যায়ামও অনেক সময়েই বেশিদিন তাঁদের সুস্থ রাখতে পারে না।

যদি আপনার কোলেসটেরল, টাইগ্লিসারাইডস (রক্ত ফ্যাট), ব্লাড-প্রেসার, পাল্‌স প্রভৃতি পরীক্ষা করান তাহলে হয়তো আপনি দুঃখের সঙ্গে অবাক হবেন। এইসব পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনার জীবন যাপন পদ্ধতি আপনার শরীরের, বিশেষ করে, আপনার রক্তবাহী ধমনীগুলোর তথা হার্টের কী অবস্থা ঘটিয়েছে !

এই দুঃসহ পরিস্থিতি নিবারণে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম সহায়ক হতে পারে।

● আপনার সমবয়সীরা যখন হয় কবরে কিংবা নারসিং হোমে, তখন আপনি যদি নাতি-নাতনী এমনকি তাঁদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে সমান তালে সাঁতার দিতে চান, তাহলে প্রিটিকিন প্রোগ্রামে উৎসাহিত হতে পারেন।

● যে-বয়সে আপনার সহকর্মীরা সবাই অবসর নিয়েছেন, তখনও যদি দস্তুরমত কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে চান, তাহলে প্রিটিকিন প্রোগ্রামই আপনার ভরসা।

● আপনার বন্ধুরা যখন বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তখনও আপনি এই প্রোগ্রাম অনুসরণ করে কাজকর্ম, খেলাধূলা, আর জীবন নিয়ে আনন্দে মশগুল থাকতে পারেন।

প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণে আপনার মনে হবে বয়স অনেক কমে গেছে। আপনাকে দেখে অন্যেরও তাই মনে হবে। এই নতুন খাদ্যধারা আপনার সবগুলি ইন্দ্রিয়কে নতুন করে সজাগ করে তুলবে।

এনে দেবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আপনার ক্লান্তিবোধ চলে যাবে এবং দৈনিক ঘুমের মাত্রাও কমিয়ে দেবে। জরার কয়েকটি লক্ষণও অল্পকাল মধ্যে অপসারিত হবে।

P. McGrady জরা সম্পর্কে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করেছেন, লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। পুনর্যৌবন লাভের উপায় সম্পর্কে তাঁর শতাধিক গবেষণার ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেন ঃ

প্রিটিকিন প্রোগ্রামই পুনর্যৌবন লাভের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

প্রখ্যাত বায়োকেমিস্ট ও জরাতত্ত্ববিদ J. Bjorksten বলছেন ঃ

প্রিটিকিন প্রোগ্রামই হচ্ছে যে-কোন মানুষের আয়ুষ্কালের সঙ্গে তারুণ্য-দীপ্ত ২০-৩০ বছর যোগ করার সর্বোত্তম পন্থা।

এই প্রসঙ্গে নাথান প্রিটিকিন বলেন ঃ

'মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি সম্পর্কে এই মন্তব্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন প্রিটিকিন ডায়েট আহারীদের আয়ুষ্কাল নিয়ে কয়েক পুরুষ ধরে সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সে যাই হোক, পশুদের নিয়ে এ পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং তা থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা গেছে সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রিটিকিন ডায়েট তথা প্রিটিকিন প্রোগ্রামই মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। আজ পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ, ইনজেশন, যোগাভ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি, যা প্রিটিকিন নির্ধারিত খাদ্য এবং ব্যায়ামের মত এত সুনিশ্চিতভাবে পুনর্যৌবন এনে দিতে পারে।'

সকলের বোঝবার সুবিধার জন্যে প্রিটিকিন এই খাদ্যবিধানের নামকরণ করেছেন তাঁর নিজের নাম দিয়ে। কিন্তু এর মূলনীতিগুলি মানবজাতির মতই সুপ্রাচীন। পৃথিবীর সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী জাতিগুলি যুগ যুগ ধরে এই ধরনের খাদ্যই গ্রহণ করছেন।

প্রিটিকন ডায়েট হল এমনই এক খাদ্যরীতি যা দেশের নেহাৎ গরীবরাও অনুসরণ করতে পারে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে প্রধানত এই ধরনের খাদ্যই গ্রহণ করেছে যারা ছিল সর্বহারা, দীনহীন কৃষক। যাদের সস্, ডেশার্ট, ভাল মদ, এপিটাইজার এবং অন্যান্য নানা অভিজাত খাদ্য জোটেনি, জোটেনি সেইসব সৌখিন খাদ্য যেগুলি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, বাত, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস ডেকে আনে। বস্তুত, যে-সব মানবগোষ্ঠী বার্ধক্য-জনিত নানা দেহ-বৈকল্য থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছে, তারাও না-জেনে প্রিটিকিন ডায়েটই গ্রহণ করে চলেছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই প্রিটিকিন ডায়েটই মানুষের পক্ষে আদর্শ খাদ্যবিধির সবচেয়ে কাছাকাছি। এ খাদ্যবিধি শুধু যে অগণিত মরণাপন্ন হৃদরোগী তথা ডিজেনারেটিভ রোগীকে সুস্থতার পথে ফিরিয়ে আনছে তাই নয়, যারা রোগের মুখে এখনও পড়েনি, তাদেরও রোগ নিবারণ সুনিশ্চিত করে চলেছে।

অস্বাভাবিক মেদ কমিয়ে আদর্শ ওজন বজায় রাখার জন্যে এই ডায়েটই সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে ফলপ্রদ। লন্জিভিটি সেণ্টারে রোগীরা নিম্ন ক্যালরি-সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করেন এক-দুবার নয়, দিনে আটবার। তাই রোগীরা কম খাওয়ার দরুন কখনোই দুর্বল বোধ করেন না, খিদের জ্বালাও ভোগ করেন না। অথচ সেণ্টারে চার সপ্তাহ থেকেই তাঁদের বাড়তি ওজন কমে যায় গড়ে ১৩ পাউণ্ড বা ৬ কিলোগ্রাম। উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে যায় কোলেসটেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডস, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, ইউরিক অ্যাসিড-মাত্রা প্রভৃতি।

শুধু রোগ নিরাময় বা নিবারণ নয়, রসনার তৃপ্তির দিক থেকেও প্রিটিকিন ডায়েট অনবদ্য।

রান্নায় তেল, ঘি, চিনি প্রভৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে এই ডায়েটে প্রতিটি খাদ্যের নিজস্ব স্বাদ গন্ধ এক নতুন আবেদন এনে দেয় আহারীর মনে।

এই ডায়েটে আমরা নতুন করে খেতে শুরু করি সেই সব খাদ্যবস্তুকে যাদের আমরা অনেকেই নাক উঁচু করে অবজ্ঞা করেছি। যেমন—আটার রুটি, ঢেঁকিছাঁটা চালের সফেন ভাত, সাধারণ ফল, সর্ব-প্রকার সস্তা-দামী সবজি, আলু প্রভৃতি।

এত কথার পরেও বলতে হয় প্রিটিকিন ডায়েট কিন্তু সহজগ্রাহ্য নয়। নির্বাচিত খাদ্যগুলিকে মামুলি মনে হলেও যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ডায়েট অনুসরণের অর্থ হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যথার্থ স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে অভ্যস্ত হওয়া।

যে-সব মানুষ তথাকথিত পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে নিরাপদ বোধ করেন, তাঁরা জেনে চমকে যাবেন যে ঐ সব পুষ্টিকর খাদ্যের অনেকগুলিই শরীরের পক্ষে মারাত্মক-ভাবে ক্ষতিকর। এই সব ক্ষতিকারক অথচ এতকাল ধরে গৌরবান্বিত খাদ্যগুলি হচ্ছে ডিম, মাখনযুক্ত দুধ, পনির, সয়াবিনের নানা খাবার, বিভিন্ন জাতের তেল প্রভৃতি।

যাঁরা বাছাই করা পুষ্টিকর খাদ্য খাচ্ছেন ভেবে তৃপ্ত আছেন, তাঁরাও জেনে আশ্চর্য হবেন যে বাজারী মধু, সব রকমের গুড় এবং নানারকম অশোধিত চিনি—শোধিত সাদা চিনির চেয়ে কোন অংশেই কম ক্ষতিকারক নয়।

যাঁরা স্ন্যাকস হিসেবে নানারকম বাদাম নিশ্চিন্ত মনে সাগ্রহে মুখে ফেলছেন তাঁরা দুঃখের সঙ্গে জানবেন যে দুনিয়ার প্রায় সব রকমের বাদামই (nuts) যেমন—চিনাবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট

নারকেল প্রভৃতি ক্ষতিকর, কেননা এই সব বাদামে অতিরিক্ত ফ্যাট বিদ্যমান।

এই জন্যে প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণের আরেক অর্থ হচ্ছে নানা ধরনের শোধিত বা বিকৃত খাদ্য, ফ্যাট, সর্ববিধ শর্করা, অতিরিক্ত নুন প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রাম ঘোষণা।

পিটার সেলার্স থেকে রবিশংকর —সকলেরই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি

আজ সমগ্র পাশ্চাত্য জুড়ে ধনী, নির্ধন, সুস্থ, অসুস্থ নির্বিশেষে অগণিত নারী-পুরুষ এই প্রিটিকিন ডায়েট তথা প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করছেন। অনুসরণ করছেন তাঁরা, যাঁরা নিজেদের শিক্ষা এবং অর্থের গরিমা নিয়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে সর্বোত্তম খাদ্যের অনুসন্ধান করেন। আজ এই শেষোক্তরাও ভিড় করছেন নানা রকমের নিরামিষ খাদ্য ও ফলের দোকানে। বড় রাস্তায়, পার্কে, অলিতে-গলিতে ভোরবেলায় প্রিটিকিন-নির্ধারিত 'রোভিং' করছেন, দৌড়চ্ছেন। মোটর ছেড়ে সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে শহরের দিকে যাচ্ছেন।

সভ্যতার নানা মারণ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ ও কর্মশক্তিতে জীবনকে ভরপুর করে তোলবার জন্যে প্রিটিকিন ডায়েট তথা প্রিটিকিন প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যে যে স্বাস্থ্য-বিপ্লব শুরু হয়েছে—এ সব তারই কয়েকটি নমুনা।

এই বিপ্লব শুধু স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে নয়, এই বিপ্লব ছড়িয়ে গেছে খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ্‌দের রাজ্যেও। আজ দূরপাল্লার দৌড়বিদ্ থেকে শুরু করে ক্রীড়া-জগতের বহু বিখ্যাত খেলোয়াড়ই অনুসরণ করছেন প্রিটিকিন প্রোগ্রাম।

স্টেইক, চপ, আইসক্রিম প্রভৃতি যেসব খাদ্য বহুকাল থেকে খেলোয়াড়রা রক্ষাকবচ বলে গণ্য করতেন সেগুলি আজ তাঁদের

জগৎ থেকে উধাও হয়েছে। সে জায়গায় এসেছে প্রিটিকিন অনুমোদিত প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক খাদ্য অর্থাৎ শস্যদানা, শাক-সবজি, ফলমূল প্রভৃতি। এই জাতীয় খাদ্যই অ্যাথলেটদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উদ্যম ও শক্তি জোগাচ্ছে।

কিন্তু খাদ্যাভ্যাস বদলান মানুষের পক্ষে একটি দুরূহতম ব্যাপার। একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের আলো জীবনকে আলোকিত করার সঙ্গেই আসে প্রাণিজ প্রোটিন, ফ্যাট আর নানাবিধ শোধিত, কৃত্রিম, বিকৃত খাদ্য থেকে সরে এসে, প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের প্রতি অসীম আগ্রহ।

যেসব জ্ঞানীগুণীজন স্বল্প ফ্যাট, স্বল্প প্রোটিন সহ প্রকৃতিজাত খাদ্যের উপকারিতা জেনেছেন তাঁদের তালিকাটি অবশ্যই দীর্ঘ। এই তালিকায় আছেন অভিনেতা পিটার সেলার্স, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, ডেনিস উইভার, ডেভিড ক্যারাভিন, ক্যানডিস বার্গেন, মেরিসা বেরেনসন প্রমুখ। আছেন সুরশিল্পী জর্জ হ্যারিসন, রবিশংকর, ইহুদি মেনুহিন ; লেখক-লেখিকা শেরা হাক্সলে এবং আইজ্যাক সিংগার ; খেলোয়াড় বিল ওয়ালটন ; দূরপাল্লার দৌড়বিদ লাস্সে ভিরেন প্রভৃতি।

কবি বায়রন তাঁর তারুণ্য বজায় রেখেছিলেন প্রিটিকিন ডায়েটের মতই খাদ্যরীতি অনুসরণ করে। তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, আলু এবং নানা শাক-সব্‌জি। স্ন্যাকস্‌ বলতে ছিল বিস্কিট আর শুদ্ধ জল।

প্রিটিকিন সাফল্যের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

প্রিটিকিন সাফল্যের উজ্জ্বলতম উদাহরণ নাথান প্রিটিকিন নিজে। ৭০ বছর বয়সেও তাঁর দেহে ছিল যুবকের দীপ্তি, দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিবিহীন, শ্রবণশক্তি 1800 c. p. s, কোলেসটেরল-মাত্রা 110mg%, রক্ত-ফ্যাট মাত্রা 40 mg%। সপ্তাহে সাতটি দিন খাওয়া, দৌড়ানোর সময় বাদ দিয়ে প্রত্যহ কাজ করতেন ১২ ঘণ্টা আর দেহচর্চার জন্য প্রতিদিন দৌড়তেন ৪ থেকে ৬ মাইল।

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করে নীরোগ দীর্ঘজীবনের আশ্বাস পেয়েছে অগণিত, অসহায়, মুমূর্ষু মানুষ। এদের নিরাময় কাহিনী-গুলি আমাদের শুধু যে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয় তাই নয়, মনে আশা জাগে যে অতঃপর আমরাও এই প্রোগ্রাম অনুসরণ করে, ডিজেনারেটিভ রোগগুলির আক্রমণ প্রতিহত করে, নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারব। আর আমাদের রোগগ্রস্ত আত্মীয় বন্ধুজন রোগমুক্ত হয়ে পারবেন নবজীবন ফিরে পেতে।

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসারী প্রাক্তন রোগীদের থেকে শোনা যাক তাঁদের রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন ফিরে পাওয়ার বিচিত্র কাহিনী :

জন হর্ন (৪৫ বছর বয়সে)

১৯৭৬-এর সেই অসহ্য দিনগুলো—তীব্র যন্ত্রণা, আশঙ্কা আর অবিরাম অশ্রুপাতের দিনগুলো ভাবতে গেলে এখনও আমি শিউরে উঠি।

আমি তখন সিডনির প্রিন্স হেনরি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কারডিয়াক কেয়ারে। ডাক্তারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মধ্যেও নিজের ক্লান্ত হৃদযন্ত্রটি নিয়ে এক-পা এক-পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। এই রকম নিদারুণ হৃদরোগ নিয়ে নার্সিং হোমে আমি প্রথম ভর্তি হই ১৯৭৫ সালে। সেবারে অস্থায়ী পেস-মেকার বসিয়ে আমাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকতে হয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বাড়ি ফিরি দীর্ঘদিন পর। কিন্তু ৩-৪ দিন যেতে না যেতেই আবার অসুস্থ হই। পুনরায় ইনটেনসিভ কেয়ার। এই ভাবে নার্সিং হোম আর বাড়ি, বাড়ি আর নার্সিং হোম করতে হয় সারাবছরে পরপর চারবার!

এর পর ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে পঞ্চমবারের মত যখন ইন-টেনসিভ কেয়ারে ভর্তি হলাম তখন আমার বাঁচবার আশা অতি ক্ষীণ।

বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখলেন, আমায় বাঁচাতে হলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অথচ আমার হার্টের তখন প্রত্যেক ৩য় বা ৪র্থ স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিটি প্রধান রক্তনালীই অত্যন্ত দুর্বল। শরীরের সেই অবস্থায় অস্ত্রোপচার একেবারেই অসম্ভব। ডাক্তাররা আমার স্বামীকে বললেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন!

উনি এতে একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন। আমি নিজে তো কিছুই ভাল বুঝতে পারতাম না। শুধু যখন স্বজন পরিজনের অস্পষ্ট চেহারাগুলো চোখে ভেসে উঠত, তখন লক্ষ্য করতাম তাঁদের মুখ ব্যথিত, বিষণ্ণ। বুঝতে পারতাম আমার জীবনের দীপটি ক্রমশ নিভে আসছে।

ঠিক এই সময় ঈশ্বরের যেন করুণা হল। আমার স্বামীর হঠাৎ মনে পড়ল পারিবারিক সংগ্রহের অ্যালবামে দৈনিক 'সান' পত্রিকার একটা পেপার কাটিং-এর কথা। সেই পেপার কাটিং-এ লেখা ছিল

'দি সান' বুধবার ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৫

নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে হৃদরোগীরা ১০ মাইল হাঁটছেন

খাদ্যবিধান ও দেহচর্চার অত্যাশ্চর্য সাফল্য

এ. এ. পি, নিউইয়র্ক :

আটলাণ্টায়, আমেরিকান কংগ্রেস অব রিহ্যাবিলিটেশন অব মেডিসিনের সম্মেলনে জানান হয়, এক নতুন আহারবিধি ও স্বাভাবিক দেহচর্চা অনুসরণ করে বয়স্ক হৃদরোগীরা ১০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে সক্ষম হয়েছেন। এইসব হৃদরোগী ইতিপূর্বে মাত্র কয়েক শ' ফুট হাঁটতে পারতেন। বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেন, এই গবেষণা প্রমাণ করেছে, সঠিক আহার বিধির মাধ্যমে সর্ববিধ ধমনীগত রোগকে (atherosclerosis) সম্পূর্ণ নিরাময় করে ধমনী তথা রক্ত সংবহনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। হৃদরোগের সাথে খাদ্য ও দেহচর্চার সম্বন্ধ নিয়ে এই পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন নাথান প্রিটিকিনের নেতৃত্বে সাণ্টা মনিকার (ক্যালিফোর্নিয়া) Pritikin Longevity Center.

এই পদ্ধতি প্রয়োগের ৩০ দিনের মধ্যেই রোগীদের অবস্থার এতটা উন্নতি হয় যে কোন রোগীরই আর ওষুধের প্রয়োজন হয় না। যাঁদের শল্য চিকিৎসার কথা ভাবা হচ্ছিল এই রকম কয়েকজন হৃদরোগী সম্পূর্ণ সেরে যান। হাই ব্লাড-প্রেশার শতকরা ৭৫% কমে যায় বিনা ওষুধেই। এছাড়া, যাঁরা অ্যানজাইনা-সহ করোনারি ইনসাফিসিয়েনসি, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, গলগণ্ড প্রভৃতি ডিজেনারেটিভ রোগগ্রস্ত ছিলেন তাঁরাও দ্রুত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পান।

'সান পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরটা যেন ঈশ্বরের অভয়-আশিসের মত হাতে এল। কাল বিলম্ব না করে আমার স্বামী যোগাযোগ করলেন Pritikin Longevity Center-এর সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে ফোন ধরলেন সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক স্বয়ং নাথান প্রিটিকিন। আমার স্বামী তাঁকে ডাক্তারি রিপোর্টগুলি পড়ে শোনালেন। ধৈর্য ধরে সব শুনলেন তিনি। তারপর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, আমরা এই ধরনের হাজার হাজার রোগী ক্রমাগত সারিয়ে চলেছি'।

আমার স্বামী যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। প্রিটিকিনের থেকে তাঁর নিরাময়-পদ্ধতি জেনে হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের জানালেন। এবং কর্তৃপক্ষের কিছু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমি 'প্রিটিকিন ডায়েট' শুরু করলাম। উপকার পেলাম একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই। তিন দিনের ভিতর সবাইকে বিস্মিত করে হাসপাতালে হেঁটে বেড়াতে সক্ষম হলাম। এর কয়েকদিন পরেই শুরু করলাম প্রিটিকিন-নির্ধারিত দেহচর্চা—'রোভিং'। পনের দিন পর আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। পুনর্জন্ম হল আমার।

প্যাট্রিক. এম. ম্যাগগ্রেডি (৪৫ বছর বয়সে)

ডিনার পার্টি চলছে। এমন সময় আমার ওপাশ থেকে একটি মহিলা বললেন, যে-মানুষ যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখা নিয়ে এত লেখালেখি করেন তাঁর নিজের এমন চেহারা হয় কি করে?

আমার ভুঁড়ি আর ঝুলে-পড়া গাল নিয়ে এই মহিলাই প্রথম মন্তব্য করলেন না। কিন্তু তাঁর মন্তব্যে একদিকে আমার বৃদ্ধ বয়সেও তরুণ থাকার কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে নানা রচনা, আর অন্যদিকে নিজের দেহটি যৌবনোচিত রাখার ব্যাপারে অবহেলা—এই দু'য়ের ফাঁকটা প্রথম ধরা পড়ল।

আমি ডাক্তারি বিষয় নিয়ে লিখতাম। আমি জানতাম যে সঠিক খাদ্য আর ব্যায়াম দীর্ঘকাল বার্ধক্য রুখতে পারে, আর এ-দুটি ব্যাপারে ভুলত্রুটি অকালে বার্ধক্য ডেকে আনতে পারে। কিন্তু বার্ধক্যকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কোন্ খাদ্যবিধি বা কোন্ ব্যায়াম অব্যর্থ—এ নিয়ে এক্সপার্টরাও একমত নন। তখনও আমি খুঁজছিলাম এমন একটা খাদ্য-ব্যবস্থা—যেটা পেলে নিজের যৌবনকে দীর্ঘায়ত করতে পরি, যেটা পেলে এটা-ওটা খাওয়ার যে আনন্দে মজে আছি, তাও ছেড়ে দিতে পারি। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম নিয়ে আমার যথেষ্ট বিরাগ ছিল। ফলে মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। কাজকর্মে মন্থর ছিলাম। ৪৩ বছর বয়সে আমার ৬ ফুট ১ ইঞ্চি দেহে কমপক্ষে ৩৫ পাউণ্ড বাড়তি ওজন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যখন তখন ঘুম পেত। কোন কাজে উৎসাহ পেতাম না। কনুই, হাতের আঙ্গুল, কাঁধ, হাঁটু—এসব জায়গায় আরথ্রাইটিসের ব্যথা নিয়মিত চলছিল। মাঝে মাঝে বুকে ব্যাথা বোধ করতাম। অবশ্য ওটা অ্যানজাইনা নয়, কারণ ব্যায়াম করলে ওটা বাড়ত না। কিন্তু ভয় পেতাম।

হার্ট স্পেশালিস্টকে দেখালাম। তিনি একগাদা পিল দিলেন—ওজন কমার পিল, বুকের ব্যথা কমবার পিল, উদ্বেগ কমানোর পিল। এত পিল খেতে ভয় করল। বাদ দিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে বন্ধু পল গ্লেনের ফোন এল। বন্ধুটি বার্ধক্য ঠেকিয়ে রাখা নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করত। পল বলল, 'তুমি তো বাড়তি ওজনে ভুগছ, বোধহয় হাই ব্লাডপ্রেশারও আছে। আমি আজ পর্যন্ত যত পুষ্টিবিদের সঙ্গে কথা বলেছি তার মধ্যে নাথান প্রিটিকিন বোধহয় সবচেয়ে সেরা। উনি মনে হয় কালে কালে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের খাদ্যাভ্যাসই বদলে দেবেন। সময় করে সান্টা মনিকায় গিয়ে তাঁর চার হপ্তার একটা প্রোগ্রাম পালন করে এসো। বছর দুই ধরে আমি প্রিটিকিন

পথ্য এবং দেহচর্চা মেনে চলেছি। জীবনে এর আগে কোনদিন এরকম সুস্থ বোধ করিনি।'

চার হপ্তা! সে-তো এক যুগ! তাছাড়া হাতে যে সব কাজ সেগুলো আমার স্বাস্থ্যের চেয়ে বেশি জরুরী মনে হল। লেখালেখি, রেডিও, টি. ভি-তে বক্তৃতা, রোগীদের পরামর্শ দেওয়া—কত কাজ আমার!

কিন্তু দুটো কথা ভেবে আমি মনস্থির করলাম। একটা হচ্ছে সান্টা মনিকায় একবার ঘুরে এলে কিছু প্রবন্ধ লেখার মাল-মশলা জোগাড় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমার বন্ধু পল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সুতরাং এক নম্বর কোনো ব্যাপার না হলে সে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমরা দু'জনে 'আমেরিকান এজিং অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেছি। ধাপ্পাবাজি চিকিৎসা বা দু'চার দিন উপকার দর্শিয়ে চুপ হয়ে যায়-- এ-জাতের ওষুধের খবর আমাদের জানা আছে। দু'জনেই কোনো স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রোগ্রামের কার্যকারিতা যতক্ষণ না দস্তুরমত প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ সেটা মেনে নিই না।

নাথান প্রিটিকিনের ব্যাপারটা আমি আর এক বন্ধুর সঙ্গেও যাচাই করে নিলাম। প্রিটিকিন সেণ্টারের উপদেষ্টা মণ্ডলীর উনি একজন। বন্ধুটির নাম জোহান জর্কস্টেন। উনি বিশ্বাস করতেন পুনর্যৌবন লাভ এবং আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়ত করবার যে চিকিৎসা সেটার জন্য শেষ পর্যন্ত চাই একটা biochemical agent, যা আমাদের জরার গতির মোড় ঘুরিয়ে দেবে। অবশ্য সেটা যতদিন না আবিষ্কার হয়, ততদিন নির্বাচিত পথ্য এবং দেহচর্চার গুরুত্ব মানতেই হবে। তাছাড়া বন্ধু বললেন যে তিনি নিজেও প্রিটিকিন পদ্ধতি মেনে চলেন আর বিশ্বাস করেন যে এ পদ্ধতিতে সুস্থতা সহ আয়ুষ্কাল ২০ থেকে ৩০ বছর বাড়ানো সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত প্রিটিকিনের চার হপ্তার প্রোগ্রামে নাম লেখালাম।

৪ দিনে মধ্যেই প্রাণপ্রাচুর্য বোধ করলাম, আর ঐ বোধটি কিছুতেই হারাতে ইচ্ছে হল না, তাই প্রিটিকিনের নিয়ম মানতে লাগলাম। সিগার, কফি—যারা বছরের পর বছর আমার লেখার সঙ্গী ছিল, ছেড়ে দিলাম। চার হপ্তার ভেতরেই ২৩ পাউণ্ড ওজন কমে গেল। কি আনন্দ ! হাঁটবার সময় মনে হত পায়ের নিচে যেন স্প্রিং লাগানো আছে ! প্রিটিকিন সেণ্টার-এ আমার সঙ্গীদের মধ্যে ওজন, রক্তের চাপ কত জলদি কমানো যায়, রক্তের চেহারা কত ভাল করা যায়, হাঁটার দূরত্ব কত বাড়ানো যায়, ওষুধ ছেড়ে দেওয়া যায় এসব নিয়ে কম্‌পিটিশন শুরু হল। আর দিনভর এইসব উত্তেজনার সঙ্গে ছিল সন্ধ্যেবেলায় প্রিটিকিন পথ্য এবং ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে নাথান প্রিটিকিনের বক্তৃতা এবং রোগীদের নানা প্রশ্নের উত্তর।

দেড় বছর হয়ে গেছে। আমি আজও প্রিটিকিন প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। সকালে আধঘণ্টা জগ্‌ করি। দিনের শেষ দিকটায় আবার আধঘণ্টা হাঁটি। ব্লাড প্রেশার স্বাভাবিক আছে। ওজন আরও ১৪ পাউণ্ড কমেছে। বুকের ব্যথা কমে গেছে। আরথ্রাইটিসের ব্যথাও নেই। তবে পথ্য লঙ্ঘন করলে ব্যথাটা আবার একটু জানান দেয়।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের কার্যকারিতা সম্বন্ধে এখত আমি ষোলো আনা বিশ্বাসী হয়েছি। চেহারায়, কাজে, চিন্তায় তারুণ্য দেখা দিয়েছে। আমি এ-বয়সেও বেজায় আশাবাদী হয়ে পড়েছি। এর একটা কারণ, আমার যে-সব মেয়েদের ভালো লাগে, তারা এখন বড় বড় চোখ করে বেশ খানিকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকছে !

নর্মা গোল্ড (৪৬ বছর বয়সে)

আমাকে ১৯৮০ সালে বাঁ স্তনে মেসেকটমি করাতে হয়। এর পর যখন এক বছর ধরে কেমোথেরাপি চলে তখন আমার শুরু হয় সবসময় একটা যাচ্ছেতাই বমিবমি ভাব। মাথার চুল উঠতে থাকে, মুখে ঘা হয়। শুধু তাই নয়, ডান দিকের স্তনেও আর একটি মাংসপিণ্ড দেখা দেয়। দেহের এই নিদারুণ কষ্টের সময় আমার এক পরম বন্ধু আমাকে প্রিটিকিন ডায়েটের খবর দেন। সেই সঙ্গে প্রিটিকিন ডায়েটের রেসিপিও দেন তিনি। ডায়েট শুরু করার পর আমি ক্রমশ সুস্থ হতে থাকি। ডানদিকের স্তনে অস্ত্রোপচারের যে সিদ্ধান্ত ছিল সেটা বাতিল হয়ে যায়! কয়েক মাসের মধ্যেই দূর হয়ে যায় স্তন ক্যানসারের সমস্ত লক্ষণ।

জিন হ্যালুইন (৫২ বছর বয়সে)

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম শুরু করার আগে আমার শরীরের প্রত্যেকটি জয়েন্ট ফুলে উঠেছিল। হাঁটা-চলা, কোন কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া, ওঠা বসা—সবই সমস্যা হয়েছিল। ডাক্তাররা বললেন, রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস। ১৯৭৬-এ রোগের প্রকোপে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলাম। কমোডে বসলে আর উঠতে পারতাম না। স্নান করতেও পারতাম না। নিজের মনে কাঁদতাম। দিনে দিনে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এই সময় খবর পেয়ে প্রিটিকিন ডায়েট শুরু করলাম। শরীরের যে-সমস্ত অঙ্গ অচল হয়ে পড়েছিল তারা আবার আস্তে আস্তে সচল হল। এখন আমি রোজ তিন মাইল হাঁটতে পারি। কাজ করতে পারি পূর্ণোদ্যমে।

চার্লস ম্যাকক্যালেন (৫৪ বছর বয়সে)

আমি প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টারে ভর্তি হই ১৯৭৬ সালের ২৯ সেপটেম্বর। যদিও নিয়মিত কিছুটা জগিং করতাম, তবু তখন আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসটিও ছিল যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। বাবা মারা যান মাত্র ৪৮ বছর বয়সে হৃদরোগে, মা চলে যান ৫: -এ হৃদ-রোগেই। এমনকি দু' বোনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে, আর অন্যজন দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর মারা যায় ৬০ বছর বয়সে ক্যানসার-এ। আমার তখন ৫৪ বছর বয়স। আমার বয়স আর ঐ মৃত্যুর ইতিহাস মিলিয়ে আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমিও বুঝি মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছি!

আমার প্রধান উপসর্গ ছিল জগিং করার সময় বাঁ-পায়ে একটা অসহ্য তীব্র যন্ত্রণা! এছাড়া হাই ব্লাডপ্রেসার, অ্যাথেরোসক্লেরোসিস আর মাঝে মধ্যে ক্লডিকেশন। নিয়মিত কড়া ওষুধ খেয়ে তখন আমার ব্লাডপ্রেসার দাঁড়িয়েছিল 160/105। প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল সসেজ, ডিম, দুধ, ক্রীম, মাখন, মার্জারিন, উদ্ভিজ্জ তেল, নানা ধরনের বাদাম, কফি আর সফ্‌ট ড্রিঙ্কস।

অথচ কী আশ্চর্য, সেণ্টারে প্রোগ্রাম শুরু করার মাত্র কয়েক-দিনের মধ্যেই আমি সমস্ত ওষুধ পরিহার করতে সমর্থ হলাম। এক মাস বাদে যখন প্রোগ্রাম শেষে বাড়ি ফিরছি তখন আমার শারীরিক উন্নতি দেখে অন্যান্য রোগীর সাথে আমি নিজেও হতবাক!

তুলনামূলকভাবে আমার বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট ছিল এই রকম:

● ব্লাডপ্রেশার : ভর্তির সময় 1c0/105, প্রোগ্রাম শেষে বিনা ওষুধে 120/70 !

● মেদ/ওজন : পূর্বে 175 পাউণ্ড, প্রোগ্রাম শেষে এক মাস পর 12 পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে পাঁচ কেজি কমে, দাঁড়ায় 163 পাউণ্ড।

● কোলেসটেরল : পূর্বে 360 m. g.%, পরে 171 m. g% কমে, দাঁড়ায় 189 m. g%-এ !

● ট্রাই-গ্লিসারাইডস : পূর্বে 658 m.g%, পরে 185 m.g% !

রন ফারার (৫৫ বছর বয়সে)

অনেক বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলাম। আহার নিয়ন্ত্রণ করে আর ট্যাবলেট খেয়ে কোনমতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। গত ১৯৭৮-এ আমি বেশ কয়েকবার হৃদরোগে আক্রান্ত হলাম। দুশ্চিন্তায় ডায়াবেটিসও অত্যন্ত বেড়ে গেল। ১৯৭৯-র জুন মাসে করোনারি অ্যানজিওগ্রাফিতে 'ট্রিপল ভেসেল' রোগ ধরা পড়ল। সে-অবস্থায় শল্য চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। ডাক্তাররা বললেন, বড় জোর আমি আর বছর দুয়েক বাঁচতে পারি।

'মিরার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রিটিকিন প্রোগ্রাম সম্পর্কিত লেখাগুলি আবার একবার পড়লাম। ভাবলাম, আয়ু যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন কোনদিকে না তাকিয়ে প্রিটিকিন-প্রোগ্রাম শুরু করা যাক।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ৪' হপ্তার ভিতরেই আমার স্বাস্থ্যের নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল। এখন আমি ৭ মাইল হাঁটি। অথচ আগে সামান্য পরিশ্রমেই আমার অ্যানজাইনার ব্যথা শুরু হত।

আমার ওজন ১০ কে. জি কমে গেছে. বাতিল হয়েছে ইনসুলিন-সহ সমস্ত ওষুধ।

মেজর জিন ইন্যেস (৬৬ বছর বয়সে)

ক্লডিকেশন তথা অ্যাথেরোসক্লেরোসিস-এর ফলে আমার ডান পায়ে চলতে গেলেই ভয়ানক যন্ত্রণা হত। ডাক্তাররা by-pass leg surgery-র বিধান দিয়েছিলেন। তাছাড়া আরথ্রাইটিসের ফলে ডান হাতের প্রতিটি জয়েন্ট অসম্ভব ফুলে গিয়েছিল। তার মধ্যে কনিষ্ঠাটি এত বেশী ফুলে ছিল যে কিছু লেখার সময় সেই আঙুলে খুব নরম প্যাড বেঁধে নিতে হত। কেননা আঙুলটি কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলেই ব্যথা করত।

প্রিটিকিন সেন্টারে থাকাকালীন আমার ঐ আঙুলটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। দীর্ঘ ৫ বছর পরে আমি আবার বিনা কষ্টে তা ব্যবহার করতে সমর্থ হলাম। আরথ্রাইটিস-জনিত শরীরের অন্যান্য ব্যথাগুলোও চলে গেল।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় প্রাপ্তি সেটা হল, প্রিটিকিন প্রোগ্রামে আমি তো ক্লডিকেশনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেলামই, অপারেশনের ঝুট-ঝামেলা থেকেও বেঁচে গেলাম।

এখন আমার একটু হাঁটতে না পারলে একদম ভাল লাগে না। একদিন অন্তর আমি ৫ মাইল করে হাঁটি। শুধু এই ক্ষমতাই নয়, প্রিটিকিন প্রোগ্রামে বেড়ে গিয়েছে আমার বাঁচার আগ্রহ, মনের প্রফুল্লতা, সুস্থতার অনুভূতি।

নরম্যান রসেনবার্গ (৬৮ বছর বয়সে)

গত ২৫ বছর ধরে আমি ছিলাম ডায়াবেটিসের রোগী। প্রতিদিন আমাকে ৩৫ ইউনিট ইনস্যুলিন নিতে হত।

আমার হার্টের অবস্থাও ভালো ছিল না। প্রত্যহ Inderal খেতে হত ৩২০ মিলিগ্রাম আর সেই সাথে অ্যান্টি-ডিপ্রেশেন্ট, ট্রাঙ্কুইলাইজার, Demerol ও অন্যান্য pain-killers।

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে আমার triple coronary by-pass অপারেশন হয়। কিন্তু এর কিছু পরেই শুরু হয় অ্যানজাইনার অসহ্য ব্যথা। Nitroglycerin pill খেয়েও কোনো কাজ হয় না। শুধু Percodan আর Demerol-এ ব্যথাটা সামান্য কমে।

ডাক্তার আমাকে বোঝান যে ঐ ব্যথা সেরে ওঠারই একটা লক্ষণ। কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারতাম ওটা ডাক্তারের আশ্বাস মাত্র, কাজের কথা নয়।

দ্বিতীয়বার অ্যানজিওগ্রাম করে দেখা যায় আমার একটি by-pass রক্তনালী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। দ্বিতীয়টি পুরোপুরি রুদ্ধ। শুধু তৃতীয় নালীটি সক্রিয়।

অতঃপর আবার অপারেশন। আমার দুর্ভাগ্য অপারেশনের পরেও বুকের ব্যথাটা কমল না। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন ঐ নতুন ব্যথাটা নেহাৎ-ই অস্ত্রোপচার-জনিত। কিন্তু ব্যথাটা দিনে দিনে আরো তীব্র হয়ে উঠল। তখন তৃতীয়বার অ্যানজিওগ্রাম করে দেখা গেল হৃদযন্ত্রের পেশীতে অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন। আর সব মিলিয়ে অবস্থা যেরকম সংকটজনক তাতে আর কোনো অপারেশন সম্ভব নয়।

কিন্তু এ-অবস্থাতেও আমি হাল ছাড়লাম না। হাসপাতাল থেকে ফিরে ব্যক্তিগতভাবে আমি আবার চতুর্থবার আনজিওগ্রাম করালাম আর তার সাথে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা।

স্পষ্ট মনে আছে ডাক্তার সেবার রিপোর্ট দেখে বলেছিলেন, কিছুক্ষণ অল্প অল্প ব্যথা থাক্, ক্ষতি নেই। আপনি হাঁটবেন, যা করণীয় করবেন। আর ব্যথাটা অসহ্য হলে একটা Demerol খেয়ে নেবেন।

এই বিপন্ন অবস্থায় মানুষ যেমন থাকে, আমিও সেইরকম জীবন্মৃত হয়ে রইলাম। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করত না। স্থবির হয়ে শুধু অসহ্য যন্ত্রণার অপেক্ষায় থাকতাম।

দিনে দিনে অপেক্ষার সময় কমতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যথা অসহ্য হয়ে দাঁড়াত। আমি একটা Demerol খেতাম। কিছুক্ষণ উপশম, কিছুটা স্বস্তি। তারপর আস্তে আস্তে আবার সুতীব্র যন্ত্রণা, আবার Demerol !

আমার স্ত্রী বিয়েত্রিশকে একদিন উত্তেজিত হয়ে বললাম, এইভাবে কেউ বাঁচতে পারে ? হয় অন্য কোন উপায় দেখো, না হলে আমি আর পারবো না। সযস্ত ট্যাবলেঠগুলো একসাথে একবারে খেয়ে, মরে যাবো !

ঠিক ঐ দিনই 'নিউইয়র্ক' ম্যাগাজিনের একটা প্রবন্ধ বিয়েত্রিসের চোখে পড়ল। নাথান প্রিটিকিন সম্বন্ধে।

লোকটা কে ? কোথায় থাকে ? কি করে ?—কিছুই জানতাম না। বিয়েত্রিস সমস্ত খবর নিলেন। এর পরে, ঠিক তার পরের সপ্তাহে, বিয়েত্রিসের সাথে আমি ভর্তি হলাম সান্টা মনিকার লন্‌জিভিটি সেন্টারে।

সেন্টারে ভর্তি হওয়ার পর কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে আমার শারীরিক উন্নতি হতে লাগল তা আমি নিজেই এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। প্রাত্যহিক ৩৫ ইউনিট ইনসুলিনের বদলে ৪ সপ্তাহের পর প্রয়োজনীয়তা কমে দাঁড়াল মাত্র ৫ ইউনিট। বাড়ী ফেরার পর তারও আর দরকার হল না। সেই থেকে আজ প্রায় ৮ বছর হয়ে গেল আমায় আর ইনসুলিন নিতে হয়নি।

Demerol ওষুধটাও সেন্টারে থাকাকালীন পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছিলাম। শুধু Demerol-ই নয়, ঐ ৪ সপ্তাহের মধ্যে আমি সব রকমের ওষুধ-বিষুধের পাট তুলে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ন মাসে-ছ মাসে খুব বেশী ঘুমের অসুবিধা হলে একটা valium খাই। আর বুকের ব্যথা তো দূরের কথা, এখন দেহের কোথাও কোন ব্যাথার চিহ্নমাত্র নেই। আমি যেন যৌবন ফিরে পেয়েছি। এখন আমি সব সময় আনন্দিত। সব ব্যাপারে উৎসাহী।

এলিজাবেথ মে ডুলিন (৭৫ বছর বয়সে)

একে একে দেহের সব পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন হার্টের অবস্থা খুবই সঙ্গীন, পেস-মেকার বসাতে হবে!

আমার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন, তাই ব্যবস্থাপত্র করতে বেশ কিছু সময় লাগছিল। এই সময় টিভি দেখে আর জনপ্রিয় 'মিরার' পত্রিকাটি পড়ে আমি সময় কাটাতাম। টি.ভি-তে শুনলাম রসুন খাওয়া হার্টের পক্ষে খুব ভাল। ১টি করে রসুন কোয়া প্রতিদিন খেতে শুরু করলাম। এই সময়ে মিরারে' বেরোচ্ছিল প্রিটিকিন প্রোগ্রাম এবং প্রিটিকিন-ডায়েট রান্নার ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি।

আমি প্রিটিকিন ডায়েট শুরু করলাম।

দেখতে দেখতে ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হওয়ার তারিখ এল। আমাকে আবার পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, একটু পরিবর্তন দেখছি. কোথায় যেন কী ঘটেছে!

পরের বার যখন ডাক্তারের কাছে গেলাম তখন দেখেশুনে ডাক্তার খুব খুশি। পেস-মেকার লাগল না। ওষুধের মাত্রাও কমিয়ে দিলেন।

এখন আমি নিয়মিত বাজার যাই, সমিতিতে যাই, সমস্ত পরিবারের জন্য রান্না-বান্না করি। বেশ খানিকটা হাঁটতেও পারি। শীতকালে সর্দি-কাশিতেও আর অসুস্থ হই না।

ইউলা উইভার (৮১ বছর বয়সে)

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কারডিও-ভাসকুলার রোগে ভুগছিলাম। ৬৭ বছর বয়সে অ্যানজাইনার চিকিৎসা শুরু হল। এরপর সাংঘাতিক হৃদরোগে হাসপাতালে ভর্তি হলাম ৭৮ বছর বয়সে।

যখন প্রিটিকিন প্রোগ্রাম শুরু করি তখন আমি ক্লডিকেশন, কনজেসটিভ হার্ট-ফেলিওর, হাই ব্লাড প্রেশার এবং আরথ্রাইটিসের

রোগী। আমার তখন ৮১ বছর বয়স। সে সময় আমি বড় জোর ১০০ ফিট হাঁটতে পারতাম। তাছাড়া পায়ের ব্যথা এত তীব্র ছিল যে অনেক সময় বাইরে বেরোলে আমাকে বয়ে বাড়ি আনতে হত। হাতের রক্ত সঞ্চালন কমে গিয়েছিল দারুণভাবে। গ্রীষ্মকালেও গ্লাভ্‌স পরতে হত।

এই রকম শরীরের অবস্থা নিয়ে ঐ ৮১ বছর বয়সে আমি প্রিটিকিন প্রোগ্রাম শুরু করি।

ফলাফল ?

চার বছর পর ১৯৭৪ সালে ৮৫ বছর বয়সে আরভিনের (ক্যালিফোরনিয়া) সিনিয়র অলিম্পিকে আধ ও এক মাইলের দৌড়ে যোগ দিয়ে পেলাম ২টি সোনার মেডেল। ৮৬ বছর ৬ মাস বয়সে ঐ একই প্রতিযোগিতায় লাভ করি ৪টি সোনার মেডেল। ৯১ বছর বয়সে আমার প্রাপ্ত মেডেলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০।

এখন প্রতিদিন সকালে আমি ১ মাইল দৌড়াই আর স্টেশনারি সাইকেল চালাই ১০ থেকে ১৫ মাইল।

এফ. ও. উডওয়ার্ড (৮৪ বছর বয়সে)

একটা চরম বিপদের দিকে যেন ছুটে চলেছিলাম। দুটো ছোট-খাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তার আমার তলপেটে অপারেশনও করেছেন। অ্যানজাইনা পেক্টোরিস-এ ভুগছি এবং স্থির জানতাম যে একটা প্রাণঘাতী হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় জানতে পেলাম লন্‌জিভিটি সেন্টারে ওঁরা বিনা ওষুধে খাদ্যবিধি এবং কিছু স্বাভাবিক দেহচর্চা মাধ্যমে সব রকম বিপাকীয় রোগের নিরাময় করছেন।

স্থির করলাম ওঁদের পদ্ধতিটি পরীক্ষা করব।

আজ ৬ মাস ধরে আমি ঐ পদ্ধতি মেনে চলেছি। অভূতপূর্ব ফল পাচ্ছি। প্রতিদিন ৪ মাইল হাঁটছি। ওষুধ খাইনা, কোন ব্যথাও নেই। রক্ত-চাপ স্বাভাবিক হয়েছে। আর বিনা চেষ্টায় ১৫ পাউণ্ড ওজন কমেছে। সব কাজে উৎসাহ পাচ্ছি প্রচুর।

ওঁদের নির্ধারিত খাদ্য প্রথমটায় একটু বিস্বাদ মনে হতে পারে। আমার চিনি বা কোনরকম সিরাপ খাওয়া নিষেধ। আমি খাই শ্বেতসার জাতীয় নানা খাদ্য—চাল, গম, আলু প্রভৃতি এবং প্রায় সব রকম ফল। আমার প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৮০% পাই এইরকম প্রকৃতিজাত কার্বোহাইড্রেট থেকে। আর স্নেহ পদার্থ থেকে ১০% ক্যালরি। এর মানে হচ্ছে মাখন ক্রীম সব বাদ। প্রোটিন থেকে অবশিষ্ট ১০% ক্যালরির জন্য চিকেন, ছোট মাছ পরিমাণ মত খাই।

অনেকে অলিম্পিকে যোগ দেবার জন্য ট্রেনিং নেয়। আমি বাঁচার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছি। ৮৪ বছর বয়সেও মনে হচ্ছে যে আমার জীবনকে আমি দীর্ঘতর করবার ব্যবস্থা করেছি। আর তার সঙ্গে আছে জীবন উপভোগ।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের সমর্থনে বিশ্বের চিকিৎসক সমাজ

এ কথা সর্বদাই খুব পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার যে, প্রিটিকিন ডায়েট কোনো এক ভদ্রলোকের একটা 'ফ্যাশান ডায়েট' নয়, প্রিটিকিন প্রোগ্রাম কোনো একটা অর্থহীন হুজুগ নয় যে দু-দিন হৈ চৈ করে চলে যাবে। এই প্রোগ্রাম পৃথিবীর বিভিন্ন বিশিষ্ট খাদ্যবিশারদ তথা চিকিৎসকদেরই অকুণ্ঠ সমর্থনপুষ্ট। আজ প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্বের চিকিৎসক সমাজের একটা বড় অংশ।

● আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের 'সার্কুলেশন' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর '৭৯) Dr. Nash বলেন ঃ

সন্দেহাতীতভাবে প্রিটিকিন প্রোগ্রামই সর্বপ্রথম হৃদরোগ 'নিরাময়' করতে সমর্থ হয়েছে।

● মিয়ামি হার্ট ইনসটিটিউট-এর Dr, Lehr-এর মন্তব্য ঃ

পৃথিবীর সব দেশে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করলে পৃথিবী থেকে হৃদরোগ একেবারে অন্তর্হিত হবে।

● কেণ্টাকি মেডিক্যাল সেণ্টার ইউনিভারসিটির Dr. J. Anderson-এর অভিমত ঃ

প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ৩০-৯০ দিনের মধ্যেই ৮০% ডায়াবেটিস রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

● বর্তমানে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম বিশ্বের বৃহত্তম চিকিৎসা-শিক্ষা কেন্দ্র ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত। এমনকি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি পৃথক কেন্দ্র খোলা হয়েছে এই প্রোগ্রামটিকে জনস্বার্থে প্রয়োগ করবার জন্য।

● প্রিটিকিন প্রোগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ আমেরিকার লোমা লিণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-স্টাটিসটিকস বিভাগ প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টারের ৮৯৩ জন রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির পর্যালোচনা করে জানুয়ারি ১৯৭৬ থেকে অক্টোবর ১৯৭৭—এই দীর্ঘ সময় ধরে। এই পর্যালোচনার বিশেষ অংশগুলির বক্তব্য সংক্ষেপে যা দাঁড়ায় তা হল :

৪ সপ্তাহের প্রিটিকিন প্রোগ্রামে গড় সংখ্যানে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এই রকম :

অ্যানজাইনা

বেশির ভাগ রোগীরই অ্যানজাইনার ব্যথা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। যাঁরা এজন্য ওষুধ খেতেন তাঁদের শতকরা ৬২ জনের ক্ষেত্রে ওষুধ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

কোলেসটেরল

সমস্ত ওষুধ নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং কোলেসটেরল-মাত্রা গড়ে নেমে দাঁড়ায় 175 m.g%

ট্রাইগ্লিসারাইডস

(ক) ১৮০ জন রোগীর ক্ষেত্রে গড়মাত্রা শতকরা 225m.g-র থেকে কমে দাঁড়ায় 155 m.g তে।

(খ) ৪৮ জন রোগীর ক্ষেত্রে গড়মাত্রা শতকরা 373 m.g থেকে কমে দাঁড়ায় শতকরা 115 m.g-তে।

(গ) যাঁদের গড় সিরাম ট্রাইগ্লিসারাইডস-মাত্রা শতকরা 150 m.g ছিল, তাঁদের গড়ে 35% কমে যায়।

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন)

২১৮ জন হাইপারটেনশন রোগী যাঁরা নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৮৬ জনের রক্তচাপ শুধু যে

যথার্থ স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে তাই নয়, কোন ওষুধেরই আর প্রয়োজন হয় না। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা সম্পূর্ণ ওষুধ-নির্ভর ছিলেন, এই সুফল লাভে তাঁরাও বঞ্চিত হন না।

ব্লাড-সুগার

● সব ক্ষেত্রেই ব্লাড-সুগার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে যায়।

● নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণকারীদের শতকরা ৫০ জনের ক্ষেত্রে সুগার মাত্রা এতটা অনুরূপ অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ইনসুলিন গ্রহণ বন্ধ করতে সমর্থ হন।

● ওষুধ গ্রহণকারী ডায়াবেটিকদের শতকরা ৯০ জন ওষুধ-খাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দেন।

স্থূলতা

● স্থূলতার রোগীদের ক্ষেত্রে (স্থূলতা একটি অন্যতম অকালে জীবননাশী ডিজেনারেটিভ রোগ) ৪ সপ্তাহে মেদ কমে যায় গড়ে ১৩ পাউণ্ড বা প্রায় ৬ কে. জি।

● বাড়তি ওজন-সম্পন্ন রোগীদের গড়ে ওজন কমে যায় ১০ পাউণ্ড বা ৪.৫ কে. জি।

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, স্পনডিলাইটিস, হাঁপানী

এই ডিজেনারেটিভ রোগগুলির অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়।

ধূমপান

২৬ দিনের প্রোগ্রাম শেষে ধূমপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন শতকরা ৮৫ জন ধূমপায়ী।

বাত, আরথ্রাইটিস বা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা-জনিত অন্যান্য উপসর্গ

ইউরিক অ্যাসিড-মাত্রা একেবারে স্বাভাবিক হওয়ার ফলে রোগীদের শতকরা ৭০ জন প্রাসঙ্গিক ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেন।

ক্লডিকেশন

যাঁরা মারাত্মক রকমের ব্লকেজ ও পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন তাঁদের শতকরা ৭০ জনের অভাবিত উন্নতি হয়।

বাইপাস সার্জারি

শতকরা ৮০ জন রোগী যাঁদের বাইপাস সার্জারি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল, তাঁদের আর এই ব্যয়বহুল সার্জারি করতে হয়না।

● ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টার একটি শিক্ষামূলক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনে যোগ দেন ৬০০ জনের বেশি আগ্রহী, যাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞ। সম্মেলনে বহু বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে প্রিটিকিন প্রোগ্রামকে মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানিয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে অন্যতম :

● সেনেটর জর্জ ম্যাকগভরন; জে. বিনকেনশিপ—লোমা লিণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়; ডেনিস বারকিট—সেণ্ট টমাস হসপিটাল মেডিক্যাল স্কুল, লণ্ডন; জে. অ্যানডারসন—কেনটাকি মেডিক্যাল সেণ্টার; আর. লেভিন—সিটি অব হোপ মেডিক্যাল সেণ্টার, ডুয়ারটি, ক্যালিফোরনিয়া; বেনজামিন রোসেন—টরেন্স মেমোরিয়াল হসপিটাল; ব্রুনো বালকে—উইসকনসিন বিশ্ব-

বিদ্যালয় ; হুগ ট্রোয়েল—ভূতপূর্ব কনসালটেণ্ট ফিজিসিয়ান—উগাণ্ডা সরকার ; ডেভিড অ্যাবে—লোমা লিনডা বিশ্ববিদ্যালয়।

● ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এক সম্মেলনে শিকাগো মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ রবার্ট উইসলার তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে ঘোষণা করেন :

কোলেসটেরল-মাত্রা শতকরা 153m.g% **বা তার কম হলে ২ বছরের মধ্যে হৃদরোগ নিরাময়** (Plaque reversal) **হওয়া সম্ভব।**

এর উত্তরে অ্যাসোসিয়েশন তার খাদ্য সংক্রান্ত অনুমোদনগুলি কিছুটা পরিমার্জন করে প্রিটিকিন ডায়েটের ভিত্তিতে।

● ১৯৭৮ সালের ৬ মার্চ নাথান প্রিটিকিন তাঁর প্রোগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেন অ্যানাহেম (ক্যালিফোরনিয়া)-এর আমেরিকান কলেজ অব কারডিওলজির ৫০০ জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। এর কিছুকাল পরেই তিনি আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভায়। প্রতিটি সেমিনারেই প্রিটিকিন প্রোগ্রাম তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং প্রয়োগের অভাবিত সাফল্যের সুবাদে অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

● ১৯৭৯ সাল থেকে সমগ্র আমেরিকা, ইওরোপ ও অসট্রেলিয়া জুড়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রিটিকিন প্রোগ্রামের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করেন।

● গভর্নর এডুইন এডওয়ার্ডের ঘোষণাক্রমে ১৯৮০ সাল থেকে আমেরিকার লুইসিয়ানা প্রদেশে সরকারিভাবে প্রতিবছর **২১ জানুয়ারি—এই দিনটিতে দেশবাসীর সুস্বাস্থ্য কামনার্থে পালন করা হচ্ছে—'PRITIKIN DAY'**

ডিজেনারেটিভ রোগ ও তার মূল কারণ

সভ্যতার বিভিন্ন ব্যাধিকে বিশেষজ্ঞরা এক কথায় নাম দিয়েছেন অকালে জীবননাশী ডিজেনারেটিভ (metabolic) রোগ। এখন জেনে রাখা যাক নানা ধরনের জানা-চেনা ডিজেনারেটিভ রোগের কয়েকটি উদাহরণ :

বিভিন্ন প্রকার হৃদরোগ ও রক্তসংবহন-সংক্রান্ত রোগ, যেমন—

হাই ব্লাডপ্রেসার,
অ্যানজাইনা পেকটোরিস,
অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস,
কনজেস্‌টিভ হার্ট ফেলিওর,
করোনারী ইনসাফিসিয়েন্সি,
করোনারী আর্টারীর রোগ,
করোনারী হার্ট ফেলিওর,
ইনটারমিটেণ্ট ক্লডিকেশন,
ইস্‌কিমিয়া,
মাওকারডিয়াল ইনফারকশন প্রভৃতি ;

ডায়াবেটিস
হাইপোগ্লাইসেমিয়া
স্থূলতা (Obesity)
বাত আরথ্রাইটিস ইডেমা
ব্রংকাইটিস প্লুরিসি হাঁপানী নিউমোনিয়া এমফিসিমা
পাকস্থলীর নানা রোগ :
গ্যাসট্রিক আলসার
অ্যাপেনডিসাইটিস.
কোলাইটিস অজীর্ণ কোষ্ঠকাঠিন্য হার্ণিয়া প্রভৃতি

কিডনী-সংক্রান্ত নানা রোগ—নেফ্রাইটিস কিড্‌নী-স্টোন প্রভৃতি
লিভারের নানা রোগ—পিত্তপাথরী প্রভৃতি
গলগণ্ড
প্রসটেট ও নানা গ্রন্থিগত রোগ
ছানিপড়া
গ্লকোমা ও দৃষ্টি সংক্রান্ত রোগ
দন্তক্ষয় ও দাঁতের নানা রোগ
শ্রবণ সমস্যা
প্রস্রাব ও জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রোগ
খুস্কি, ব্রণ ও অন্যান্য সমগোত্রীয় রোগ
চুলওঠা
লাবণ্যহীনতা
অকাল বার্ধক্য
মাথাধরা
সুরাপানের বিষক্রিয়া প্রভৃতি

—এইসব রোগ নিয়ে দীর্ঘদিনের নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় জানা গেছে যে মূলতঃ রোগ একটাই এবং সেটা হল ঃ

শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট, কোলেসটেরল ও অন্যান্য পদার্থের প্রভাবে দূষিত, ধীরগতি, অক্সিজেন-হ্রাসপ্রাপ্ত রক্ত প্রবাহ (toxic, sluggish, oxygen-depleted blood stream)।

এই দূষিত রক্তের প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন উপসর্গকে আমরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। কখনো বলি হৃদরোগ, কখনো বলি ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি। তবে উপসর্গ যাই হোক না কেন, রোগ একটাই—দূষিত, ধীরগতি, অক্সিজেন-হ্রাসপ্রাপ্ত রক্তপ্রবাহ।

রক্ত প্রবাহের শুদ্ধতা ও সাবলীলতা বাধাপ্রাপ্ত হলে রক্তের ঘনত্ব (viscosity) বেড়ে যায়। ফলে, রক্তের গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

সিড্‌নি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত রক্ততত্ত্ববিদ Dr. Leopold Dintenfas* গত ২০ বছর ধরে রক্ত-ঘনত্ব (blood viscosity) নিয়ে একটানা নিবিড় গবেষণা করে আজ চিকিৎসক সমাজকে নিঃসন্দেহ করেছেন যে :

রক্তদূষণ তথা রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি প্রায় সমস্ত ডিজেনারেটিভ রোগের প্রধানতম কারণ।

কিন্তু দূষিত রক্তস্রোত তো কোন বিশেষ অঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। আর শরীরের প্রতিটি অঙ্গই পরস্পর নির্ভরশীল। তাই অস্বাভাবিক রক্ত প্রবাহের ফলে কোন একটি অঙ্গে—যেমন, হৃদযন্ত্রে হৃদরোগ দেখা দিলেই মনে করতে হবে কিডনি, লিভার, গল ব্লাডার, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতি অঙ্গগুলিতেও দূষিত রক্তপ্রবাহ-ঘটিত নানা উপসর্গ দেখা দেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এ জন্যেই দেখা যায় হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিসের প্রাদুর্ভাব রোগীর দেহে অনেকক্ষেত্রে একসঙ্গেই শুরু হয়েছে। এবং তা যদি নাও হয়, এর একটি উপসর্গ দেখা দিলেই

---

*রোগ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত অসংখ্য গবেষণা-পত্র ছাড়াও তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

Blood Micro-rheology Viscosity Factors in Blood Flow, Ischemia and Thrombosis (1971, Butterworth Press) ; Rheology of Blood in Diagnostic and Preventive Medicine (1976, Butter worth Press), Hyperactivity and Hypertension. (1981, Pergamon Press) ; Blood Viscosity in Heart Disease and Cancer (1981, Pergam Press) প্রভৃতি।

বুঝে নিতে হবে যে অন্যান্য উপসর্গগুলিও শরীরে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

এই পরিস্থিতি রোগীদের পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক একটি অসুখ নিয়ে রোগী যাচ্ছেন এক একজন স্পেশালিষ্ট-এর কাছে। বিভিন্ন উপসর্গের এই ধরনের খণ্ড খণ্ড চিকিৎসায় সামগ্রিকভাবে রোগের বিচার হচ্ছে না। ফলে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। এজন্যে অগণিত সভ্যতার ব্যাধি থেকে সত্যিকারের মুক্তি পেতে হলে রোগের মূলেই আঘাত করতে হবে। দূষিত, ধীরগতি, অক্সিজেন হ্রাসপ্রাপ্ত রক্তপ্রবাহকে করে তুলতে হবে শোধিত, স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেনে পূর্ণ।

রক্তপ্রবাহকে ইংরেজিতে বলা হয়—The river of life। এই প্রবাহ যত আবিলতা-মুক্ত হবে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও তত ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলছে, ব্যক্তির রক্তের স্বাস্থ্য যেমন, ব্যক্তির স্বাস্থ্যও হবে তেমনি। রক্তে আবিলতা এসে গেলে ব্যক্তির সুস্থতায় বিপর্যয় আসে। এবং এ-বিপর্যয় সামান্য অসুস্থতা থেকে শুরু করে হৃদ্‌রোগ, এমন কি ক্যানসার পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে পারে। ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায় যখন জানতে পারি রক্ত সংবহনতন্ত্রের নির্বিঘ্নে কাজের গুরুত্বটা।

●

হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী (ধমনী ও শিরা) এবং তাদের মধ্যে দিয়ে সংবাহিত রক্ত—এই তিন নিয়ে গঠিত হয়েছে রক্ত-সংবহনতন্ত্র।

রক্ত তথা সংবহনতন্ত্রের অনেক কাজ :

(১) দেহের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যরস (nutrients) অক্সিজেন, হরমোন প্রভৃতি প্রাণরক্ষক পদার্থ পৌঁছে দেওয়া।

(২) কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত (toxic) পদার্থ বের করে দিয়ে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৩) রোগ জীবাণুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা, ক্ষত সারানো রক্তক্ষরণ বন্ধ করা, এমন কি, ঘামের জলটুকু সরবরাহ করা পর্যন্ত।

সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালনেব মূলে আছে হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ডকে অনেক সময় 'পাম্প' বলা হয়। বস্তুত হৃৎপিণ্ডে পাশাপাশি দুটো পাম্প আছে। চারপাশের মাংসপেশী এদের ছন্দের মতো নিয়মিত তালে চাপ দিচ্ছে। এর ফলেই চলছে সমগ্র শরীরে রক্ত সঞ্চালন।

আর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে দেহে রক্ত সঞ্চালনের কাজে বিশেষভাবে যোগ দিয়েছে ধমনীতন্ত্র। এই ধমনীতন্ত্র সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে ধমনী, শাখা ধমনী (arterioles) এবং অসংখ্য জালক (capillaries) নিয়ে। এইসব জালকের ভেতর দিয়ে চলাচলকাকে রক্ত যেমন একদিকে দেহের কোষগুলিকে অক্সিজেন এবং খাদ্যরস সরবরাহ করে, অন্যদিকে শরীর থেকে বের করে দেবার জন্য সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি বর্জনীয় পদার্থ (waste products) শরীর কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেয় ফুসফুস দিয়ে, আর ইউরিয়া প্রভৃতি বের করে দেয় লিভার, কিডনি এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে।

রক্তপ্রবাহ দূষিত, ধীরগতি হয় কি করে

আগেই বলা হয়েছে রক্তের প্রবাহ সাবলীল, অক্সিজেন-সম্পন্ন রাখতে হলে রক্ত আবিলতা-মুক্ত হওয়া চাই। রক্তে যখন বিষধর্মী বা দূষিত (toxic) পদার্থ থাকে, তখন রক্তের সেই অবস্থাকে বলে Toxemia। আর toxemia-র সঙ্গে যখন আবার অতিরিক্ত কোলেসটেরল এবং স্নেহপদার্থ (লিপিড) থাকে, তখন তাকে বলা হয় Lipo-toxemia.

রক্তদূষণের প্রধান কারণগুলি হল :

(১) স্বাস্থ্যবিরোধী আহার (wrong diet)

এ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত কোলেসটেরল, ফ্যাট এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে ধমনীর গায়ে জমা হয়।

আবার রক্তস্রোতে উপস্থিত অতিরিক্ত ফ্যাটে রক্ত কণিকা (red cells) ও ক্ষুদ্রতর অণুচক্রিকাগুলি (plate-lets) জমাট বেঁধে যায়। এর ফলে রক্তের ঘনত্ব (blood viscosity) বেড়ে যায়, হ্রাস পায় তার অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা, সর্বোপরি রক্তপ্রবাহ মন্থর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে-সব ধমনী দূষিত পদার্থ জমে সংকুচিত হয়ে গেছে, সেখানে রক্তের স্বাভাবিক গতি বাধা পায় মারাত্মকভাবে।

(২) মদ্যপান

মদ খাওয়ার ফলেও রক্তকণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায়, রক্ত-ফ্যাট-মাত্রা বেড়ে যায়, নষ্ট হয় বহু প্রয়োজনীয় nutrients। সর্বোপরি কয়েকটি উৎসেচক (enzymes) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ফলে ব্যাহত হয় অক্সিজেন সরবরাহ।

(৩) ধূমপান

ধূমপানের ফলে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস রক্তে মিশে রক্তের অক্সিজেন অপসারিত করে। তাছাড়া ধূমপানে নষ্ট হয় ভিটামিন-সি—রক্ত চলাচলে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

এছাড়া আছে নিকোটিন যা স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রান্ত করে, ধমনী-গুলোকে সংকুচিত করে।

(৪) থাইরয়েডের ক্রটি

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কর্মক্ষমতা নিম্নমানের হলে স্নেহ পদার্থের বিপাক ঠিকমত হয় না। ফলে রক্তে কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটের মাত্রা বেড়ে যায়।

থাইরয়েডের কর্মক্ষমতা নিম্নমানের হয় খাদ্যগত আয়োডিন অথবা বি-১ ভিটামিনের অভাবে। অতিরিক্ত শর্করা খেলেও বি-১-এর অভাব ঘটতে পারে।

রক্ত, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালীগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই রক্ত দূষিত হতে থাকলে ধমনীগুলিও ধীরে ধীরে অপরিচ্ছন্ন ও দৃঢ় (hardened) হতে থাকে। আর এই অসুস্থ ধমনীতন্ত্রের উপদ্রব গিয়ে পড়ে হৃৎপিণ্ডের উপর।

এইভাবে কিছুকাল ধরে দেহে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত চলাচলের ক্রটি ঘটতে থাকলে সাধারণভাবে যে সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় সেগুলি হল ঃ

অকালে বুড়িয়ে যাওয়া

চামড়ার উপর বড় বড় ফ্যাকাসে নানা আকৃতির দাগ

চোখের কনীনিকার চারপাশে হালকা রঙের দাগ, রক্তিম মুখ, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্রমক্ষীণতা, প্রাণশক্তির অভাব

ঠাণ্ডালাগা বা যে-কোনো সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা-হ্রাস

আহারের পর তন্দ্রালু ভাব, পরিশ্রমের পর মাথা ঝিমঝিম করা, সামান্য শ্রমে হাঁপধরা, পায়ে ব্যথা

অ্যানজাইনা (খাওয়া দাওয়ার পর, কিছু পরিশ্রমের পর কখনও বা বিশ্রামরত অবস্থায় হঠাৎ বুকে ব্যথা বোধ),

বিনা কারণেই ঘেমে-যাওয়া, বিশ্রামরত অবস্থাতেও দ্রুত হৃৎস্পন্দন,

ক্ষুধাতৃষ্ণার বৃদ্ধি, দেহের জলীয়াংশের দ্রুত ক্ষয় (বহুমূত্র রোগের লক্ষণ)

এই লক্ষণগুলোকে খুব হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। যদিও এ অবস্থাতেও সাধারণ ডাক্তারী পরীক্ষা বলবে—

ব্যক্তির দেহে ডিজেনারেটিভ, বিশেষ করে, হৃদরোগের কোন লক্ষণ নেই, রক্তসংবহন ভালোই আছে !

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করি বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক Dr. Kenneth Cooper-এর সাবধান বাণী :

মনে রাখবেন, চাপা হৃদরোগের প্রায় সব সময় প্রথম প্রকট লক্ষণ হচ্ছে—হঠাৎ মৃত্যু। এবং হাজার হাজার লোকের ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র লক্ষণ।

নিরাময়ের সন্ধানে

ইদানিংকালে ডিজেনারেটিভ রোগ নিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছি তাতে প্রকৃতির পথ থেকে অনেক সরে এসেছি, আর হৃদরোগ-সহ সবরকম ডিজেনারেটিভ রোগে ভুগে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি আমাদের বিপথে চলার।

এইভাবে চিন্তা করে প্রকৃতির পথে ফেরার জন্য প্রথম যে পন্থা পাওয়া গেল তা হল : অ্যারোবিক ব্যায়াম

—অর্থাৎ স্বাভাবিক দেহচর্চা যেমন দ্রুত হাঁটা, জগিং, দৌড়ানো, প্রভৃতি। এ-ব্যায়ামে, বিশেষ করে যাঁরা বসে বসে কাজ করেন (যেমন নানা অফিসের অফিসার ও কেরানীবাবুরা, লেখক, গবেষক, এমন কি শিক্ষক-অধ্যাপক প্রভৃতি) তাঁদের ক্ষেত্রে এত উপকার পাওয়া গেল যে অনেকেই আবেগের আতিশয্যে ভাবলেন হৃদরোগ তথা সর্বপ্রকার ডিজেনারেটিভ রোগ নিরাময়ের এটাই একমাত্র ওষুধ।

Dr. Kenneth Cooper তাঁর Aerobics (1968) গ্রন্থে বহু হৃদরোগ এবং অন্যান্য ডিজেনারেটিভ রোগে আক্রান্ত রোগীর নিরাময়ের খবর দিলেন। দেখালেন, ব্যক্তির খাদ্য যাই হোক না কেন aerobic দেহচর্চা দ্বারা শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ার (metabolism) প্রভূত উন্নতি ঘটে। দেখালেন, aerobic ব্যায়ামের ফলে স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র এবং অন্যান্য সব vital organs প্রচুর কর্মক্ষমতা লাভ করে। ফলে, যে কোন ডিজেনারেটিভ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আবার সুস্বাস্থ্য ফিরে পায়।

কিন্তু এখানেই কি আমরা থেমে থাকব?

নিশ্চয়ই না।

কারণ, প্রিটিকিন হৃদরোগ সহ প্রায় সমস্ত ডিজেনারেটিভ রোগের নিবারণ এবং নিরাময়ের যে-পথ বের করলেন, সুস্থতা ও দীর্ঘজীবন সম্পর্কে যে সত্য খুঁজে পেলেন, তা আরও আশ্চর্যজনক, আরও অব্যর্থ।

প্রিটিকিন তাঁর আবিষ্কারের সূত্র পেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে। সে সময় যে-সব দেশে খাদ্য 'রেশন' করণে হয়েছিল সেইসব দেশে ডিজেনারেটিভ রোগে মৃত্যুর হার যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। যে-সব দেশে পশুপালন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তারা যখন শস্য উৎপাদনে মনোবিবেশ করল, তখন সেইসব দেশে খাদ্যধারা পরিবর্তনের ফলে ডিজেনারেটিভ রোগে মৃত্যুর হার অদ্ভুতভাবে বমে গেল। আর কমে গেল জার্মানীতে, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনের তগিদে সম্ভবপর সব খাদ্যবস্তু থেকে স্নেহপদার্থ হয়েছিল নিষ্কাশিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উপরোক্ত তথ্যেরই মোটামুটি পুনরাবৃত্তি ঘটল। কিন্তু এবার রোগ নিরাময়ে খাদ্যের ভূমিকা আরও স্পষ্ট বোঝা গেল।

এ-সব তথ্যের সঙ্গে সংগৃহীত হল কতগুলি আদিম উপজাতির খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নীরোগ দীর্ঘজীবনের খবর। যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে Sir Robert McCarrison দুনিয়া ভরে প্রচার করলেন প্রকৃতি-জাত খাদ্য গ্রহণকারী হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতি হুন্‌জাদের অপূর্ব স্বাস্থ্য, অবিশ্বাস্য রকমের নীরোগ তথা দীর্ঘজীবনের সংবাদ।

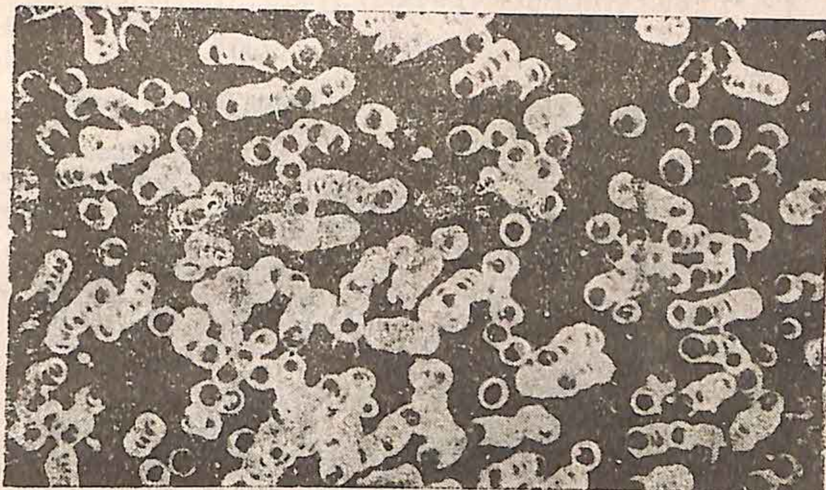
এইভাবে অ্যারোবিক দেহচর্চার সঙ্গে যুক্ত হল মানুষের সঠিক খাদ্য সম্পর্কে ষোল আনা নির্ভরযোগ্য তথ্য—প্রিটিকিন ডায়েট এবং এই দুই-এর সমন্বয়ে তৈরি হল নীরোগ দীর্ঘজীবনের সর্বোত্তম পন্থা—প্রিটিকিন প্রোগ্রাম।

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম কাজ করে কী ভাবে ?

মারাত্মক করোনারী ইনসাফিসিয়েন্সি বা হার্ট অ্যাটাকে বিপন্ন রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়, তখন তাকে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয় অতিরিক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্সিজেন। এই বাড়তি অক্সিজেনটুকু পাওয়া না-পাওয়ার উপর প্রায়ই নির্ভর করে রোগীর বাঁচা-মরা। কিন্তু সেই অক্সিজেনকে গ্রহণ করতে তখনও প্রয়োজন হয় সুবিন্যস্ত রক্তকনিকা এবং রক্তসংবহন তন্ত্রের।

এইজন্য বাইরে থেকে অতিরিক্ত অক্সিজেন পাওয়ার ব্যবস্থা করে রোগীকে যদি প্রিটিকিন ডায়েট দেওয়া হয়, তাহলে কাজ হয় আশাতীতভাবে। দেখা যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগী সুস্থবোধ করতে শুরু করে এবং ৩।৪ দিনের মধ্যেই অবস্থার এতটা উন্নতি হয় যে রোগী চায় একটু হেঁটে চলে বেড়াতে।

কী ব্যাপার ? হঠাৎ রোগীর এত প্রাণশক্তি এল কি করে ? এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এই ছবিটি লক্ষ্য করুন—

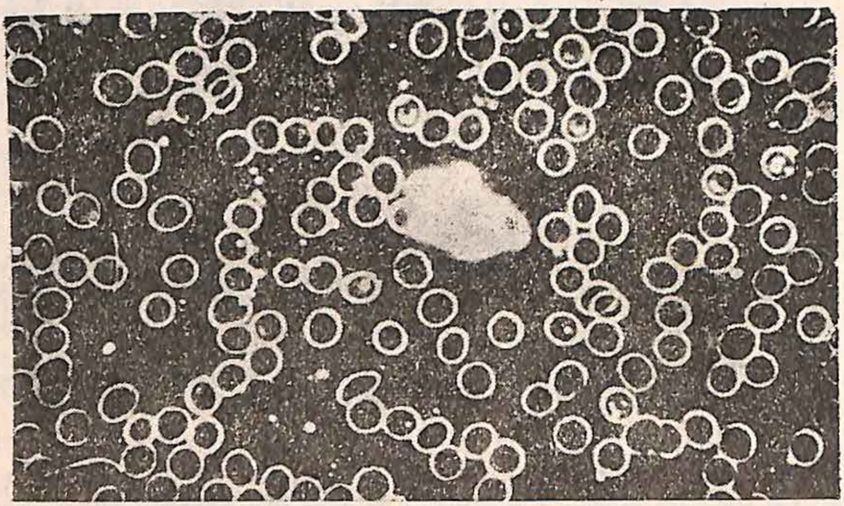


মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে তোলা চিত্রটি রক্ত কণিকার (R. B. C.)। চিত্রে দেখানো হয়েছে হৃদ্‌যন্ত্রের সংকট কালে কিম্বা অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন আহারের পর রক্তকণিকার অবস্থা কি দাঁড়ায়। বোঝা যাচ্ছে অবস্থা সঙ্গীন। রক্ত কণিকাগুলি এমন পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে যে তাদের পক্ষে খুব বেশি অক্সিজেন বহন করা আর সম্ভবপর নয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু হৃদযন্ত্রের সংকটকালে নয়, অতিরিক্ত ফ্যাট-গ্রহণকারী অনেকের রক্তের অবস্থা সব সময় নাকি এই রকম ! এর উপর আবার যখন সিগারেট, কফি, অ্যালকোহল প্রভৃতি পানের এবং মানসিক চাপের দূষিত প্রভাব সেই রক্তের উপর পড়ে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ?

সেইসব নিষ্প্রভ ম্রিয়মান ব্যক্তিদের কথা কল্পনা করতে পারছেন ?

এবার চলুন রোগীকে নিয়ে যাওয়া যাক্ সরাসরি প্রিটিকিন ডায়েটে। অল্পকাল মধ্যেই রক্ত কণিকার অবস্থার কি উন্নতি ঘটে তাই দেখানো হয়েছে নিচের চিত্রটিতে—



এবার নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কি ঘটল। হ্যাঁ, পুঞ্জীভূত রক্তকণিকাগুলো পৃথক এবং সুবিন্যস্ত হয়ে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেনের স্বাভাবিক সংবহন আবার শুরু হয়ে গেছে। এই রক্ত চলাচলের উন্নতির ফলেই কোন ডিজেনারেটিভ রোগী এমন কি মুমূর্ষু হৃদরোগীও প্রিটিকিন ডায়েটে সাড়া দেয়। দূষণমুক্ত হয়ে এ-যাবৎ রুদ্ধ রক্তনালী দিয়ে রক্ত আবার অবাধে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ফলে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পৌঁছে যায় দেহের সর্বত্র।

এর থেকেই বোঝা যায়, কেন এত লোক যারা এত দিন ধরে সভ্যতার নানা রোগে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিল তারা মাত্র কয়েক সপ্তাহ প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ক'দিনের ভিতরেই অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

আর রোগীর যে উন্নতি হয়েছে তা বোঝা যায় তার রক্তচাপ, কোলেসটেরল, রক্ত-ফ্যাট, গ্লুকোজ-মাত্রা প্রভৃতি পরীক্ষা করে।

প্রাথমিক সুস্থতার পর প্রিটিকিন-নির্ধারিত স্বাভাবিক দেহচর্চায় কয়েক সপ্তাহে শরীরের বিপাকক্ষমতা (metabolism) বিশেষ করে স্নেহ পদার্থ বিপাকের ক্ষমতা এবং রক্ত সঞ্চালনের প্রভূত উন্নতি হয়। এবং এই সুফললাভের সঙ্গে সর্বপ্রকারের ডিজেনারেটিভ রোগ-লক্ষণ অতি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। অল্পকাল মধ্যেই প্রোগ্রাম-অনুসারী ফিরে পান শরীরের সঠিক ওজন (optimum body weight)।

এইভাবে দুটি বছর প্রিটিকিন প্রোগ্রাম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারলে ধমনীগুলো পরিপূর্ণভাবে অপরিচ্ছন্নতা ও দৃঢ়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরও কথা আছে। দেহচর্চা এবং নতুন খাদ্যবিধান অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের সুস্থতা বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হয়। এজন্য সবরকম মানসিক চাপের কারণ এড়িয়ে চলতে হবে। আর চাপ এসে পড়লে যথাসম্ভব নির্বিকার থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে জীবনের প্রতি একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এটা সহজে সম্ভব নয়।

এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটা কি?

এটা অর্জন করার জন্য কিন্তু নানা দেশের মহামানবদের অব্যর্থ সব নির্দেশ রয়েছে। আমাদের গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

আমি সবই করে যাচ্ছি, তুমি শুধুমাত্র নিমিত্ত হও, উপলক্ষ হও।

অর্থাৎ জীবনে সুখ-দুঃখ যা ঘটছে তার বিধান করছেন বিশ্ববিধাতা। আমরা উপলক্ষ মাত্র।

এই মনের ভার লাঘব করার ব্যাপারে বাইবেল বলছেন—

Cast thy burden upon the Lord, He will sustain thee.

অর্থাৎ তোমার বোঝা ঈশ্বরের উপর দিয়ে দাও, তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।

আমাদের গীতায় আরও একটা চরম কথা আছে—'মা ফলেষু কদাচন'। জীবনে চলতে চলতে মানুষকে নানাভাবে নানা কাজে লিপ্ত হতে হয়। তবু মনে রাখতে হবে, সর্বোত্তম চেষ্টার পর ফল লাভের ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হয়।

এই ধরনের একটা মনোভাবের চর্চা উপরোক্ত দেহ ও খাদ্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে পারলে রোগ নিরাময় দস্তুর মতো ত্বরান্বিত হতে পারে।

এছাড়াও নিজের মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য আমরা শখের চর্চায় লিপ্ত হতে পারি। সে শখ বাগান করা, পশু পাখি পোষা, বই পড়া, গান করা—যা ইচ্ছে হতে পারে। আর চাই নানাভাবে মানুষের সঙ্গ। এ সঙ্গ লাভের সুযোগ আসে খেলাধূলা, মেলামেশা আর নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদের মাধ্যমে।

একনজরে

প্রতিদিনের প্রিটিকিন প্রোগ্রাম

আহার	প্রাত্যহিক সর্বাধিক পরিমাণ
কম ছাঁটা চালের সফেন ভাত +তুষ-যুক্ত আটার রুটি	ইচ্ছে মতো
ডাল (রান্না করা অবস্থায়)	১০০ গ্রাম
শাক ও সবজি (কাঁচা+রান্না করা)	ইচ্ছে মতো
লবণ	৪ গ্রাম
ছোট মাছ/চিকেন/মাটন/বিফ/টার্টল	৩০—৯৮ গ্রাম
দুধ (স্কিমড/মাখন-তোলা)	২২৫ গ্রাম
সব রকমের তাজা ফল	৯৩ গ্রাম
স্কিমড মিল্ক-সহ, চিনি-ছাড়া পাতলা লিকারের চা/লেমন-টি	২ কাপ
স্বাভাবিক দেহচর্চা (রোজই)	
হাঁটা	৩০ মিনিট করে দিনে ২ বার

যদি বাঁচতে চান তবে যা-ইচ্ছে খাওয়ার লোভ সামলান

Tell me what you eat and I will tell you what you are. The destiny of a people depends on its diet.
ফরাসী চিন্তানায়ক এ. ব্রিলা সাঁভেরা

সংস্কৃতের 'হৃ'-ধাতু অবলম্বন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা 'আহার' এবং 'বিহার' এ-দুটি কথা তৈরি করেছিলেন। দুটিতেই প্রাণ ভরে যায়! কিন্তু মুশকিল হল 'প্রহার' এবং 'সংহার' করতে গিয়েও ওঁরা 'হৃ'-ধাতু ছাড়েন কি।

ছাড়েননি তার কারণ আছে।

ওঁরা বোধহয় বুঝেছিলেন যে ঐ আহার এবং বিহারের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ব্যক্তির জীবনে রোগের প্রহার এবং শেষ পর্যন্ত সংহার। সোজা কথায় ব্যক্তির ভুল আহার-বিহার—ইংরেজীতে যাকে বলে **wrong diet and life style**-থেকেই ব্যক্তির প্রাপ্য হয়ে ওঠে নানা ব্যাধির হাতে তার প্রহার এবং যার পরিণতি সংহার বা অকালমৃত্যু।

স্বাস্থ্য, সুস্থতা, জরামুক্ত দীর্ঘজীবনের সন্ধানে বেরিয়ে তাই প্রথমেই হাত দিতে হবে আমাদের আহার ও আহার্যে।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ইতিপূর্বে বহু হুজুগ তথা ধারণার সাথেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। প্রতিটি ধারণারই কিছু মূল্যবান দিক আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অসম্পূর্ণ।

আদিম মানুষকে অনেকে বলেছেন শিকারী স্তন্যপায়ী (**hunting primate**)। কিন্তু ওরা ছিল মুখ্যতঃ উদ্ভিদ্‌ভোজী। তবে সেই সঙ্গে কিছুটা মাংসাশীও বটে।

আদিতে ওদের খাদ্য ছিল নানজাতের অরণ্যজাত ফল, কন্দ, মূল। আর তারই পাশাপাশি ছিল ছোট ছোট পাখী, সাপ, ব্যাঙ, শামুক আর হাতে-ধরা-যায় এরকম মাছ। কখনো কখনো জুটত বড়ো পাখী বা মাঝারি পশু যাদের পাথর ছুঁড়ে, লাঠি ছুঁড়ে অথবা সাধারণ ফাঁদ পেতে ধরা যেত।

এই অবস্থার বহুযুগ পর পৃথিবীতে একদিন এমন অবস্থা এল যে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের পক্ষে মাংসাহার অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। তখন মানুষ মাংসাশী হয়ে উঠল। এ-সময় মানুষ সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে শিখেছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দস্তুর মতো দৌড়ানোর উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পশু শিকারের উপযুক্ত হয়েছে।

এইভাবে শুরু থেকে খাদ্যের ব্যাপারে নিরামিষ ও আমিষের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে বলেই আজকের মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে পুরোপুরি আমিষ বা পুরোপুরি নিরামিষ বা আমিষ-নিরামিষ মিশিয়ে খেয়ে জীবনধারণ করা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে আদি উদ্ভিদ্‌ভোজীর দাঁত, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি আজও মানুষের দেহে রয়েছে। এবং এরাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতির অভিপ্রায় মানুষ নিরামিষাশী হোক্।

এ-প্রসঙ্গে 'আরোগ্য দিগদর্শন' গ্রন্থে গান্ধীজী বলছেন, 'মানুষের দেহ ও অন্ত্রাদি পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মাংস মানুষের খাদ্য নহে। ডাক্তার হেগ ও কিংসফোর্ড ইহার অনিষ্টকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।...প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানবের খাদ্য আমিষ-বর্জিত হওয়া উচিত। ফলমূলাহারী জন্তুগণের সহিত মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বানরের ও নরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ক্রিয়া প্রায় একপ্রকার। বানর ফলমূলাহারী। বানরের দন্ত ও পাকস্থলী, নরের দন্ত ও পাকস্থলীর অনুরূপ। অপরপক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাহারী পশুগণের দন্ত ও পাকস্থলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন

প্রকারের ।...ইহা হইতেই বহুদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, মাংসাহার মানুষের জন্য নির্দিষ্ট হয় নাই।...প্রধানতঃ ফল ও মূলই মানুষের প্রকৃত খাদ্য !'

মানুষের খাদ্য সম্পর্কে এই মূল কথার পরেও আরও কথা আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি-বিজয় যত এগিয়ে গেছে তার হাতে প্রকৃতিজাত খাদ্য ততই হয়ে পড়েছে অপ্রাকৃতিক। শস্যদানা, শাক-সব্জি, ফলমূলকে রসনার তৃপ্তির জন্য সভ্য মানুষ করে তুলেছে নানাভাবে অস্বাভাবিক। তার খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাঁউরুটি, ময়দা, কেক, বিস্কিট, কর্ন ফ্লেকস্, সাদা চাল, উদ্ভিজ্জ তেল. বনস্পতি, ঘি, মাখন, চিনি, গুড়, জ্যাম, জেলি, সস্, নানারকমের মদ এবং আরও কত কি! প্রকৃতির বিপুল খাদ্য-সম্ভারকে বিকৃত করে সে তৈরি করেছে স্বাস্থ্য-হানিকর নানা অ-খাদ্য !

সভ্য মানুষের রসনা-তৃপ্তির জন্য যখন একদিকে খাদ্যের এই বিকৃতি ঘটে চলেছে, তখন অন্যদিকে ক্রমশই কমে চলেছে তার কায়িক শ্রম এবং দেহ-চালনার সময় ও সুযোগ।

এই দু'য়ের ফলেই দেখা দিয়েছে সভ্যতার যত ব্যাধি—নানা রকমের ডিজেনারেটিভ রোগ।

বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে ডিজেনারেটিভ রোগগুলির মূল কারণ হচ্ছে রক্ত-দূষণকারী, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিরোধী আমাদের আধুনিক আহার ও আহার্য।

তবু জেনে শুনে এই স্বাস্থ্য-বিরোধী আহার আমরা ছাড়তে পারছি না কেন ?

পারছিনা প্রধানত দুটি কারণে :

প্রথমত, আমরা যারা জানি, তারা অনেকেই জেনে শুনে বিষপান করতেও তেমন কুণ্ঠিত নই। ভাবটা এমন যেন ঝালে, ঝোলে, অম্বলে যা করে করুক, তবু 'না খেলে নাই কোনো সুখ'। আমাদের এই জ্ঞানপাপীর মনোভাব কিন্তু আজকের নয়, অতি পুরনো।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও এ-নিয়ে কবি ড্রাইডেন দুঃখ করে গেছেন। বলে গেছেন:

Look around the habitable world, how few
Know their own good or knowing it, pursue.

স্বাস্থ্য-বিরোধী আহার গ্রহণের পিছনে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে খাদ্য সম্পর্কে আমাদের নানা প্রচলিত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা। কোন্ খাদ্য খাওয়া উচিত বা অনুচিত সে সব বিবেচনা ছেড়ে আমরা কেবল মনে রেখেছি 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'। খাদ্য গ্রহণে বা রন্ধনে আমাদের মূল লক্ষ্যটি স্বাদ-গন্ধের দিকে, স্বাস্থ্যের দিকে নয়। কিন্তু সভ্যতার মারণব্যাধি নিয়ে দেহে-মনে সমাগত বা অনাগত মর্মান্তিক দুরবস্থার মূল প্রযোজক যখন আমাদের ত্রুটিপূর্ণ আহার, তখন দুর্ভোগ কিংবা উপভোগ দুটোই তো আহারীর হাতে!

আমাদের তাই বুঝতে হবে যে এ-যুগেও সেই অতীত দিনের সুস্থ দীর্ঘজীবন ফিরে পাওয়ার উপায় একটাই—সেটা হল খাদ্য নিয়ে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাগুলো বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোয় দূর করে আহার্যটি ত্রুটিমুক্ত করা। এবং এইভাবে 'যথার্থ খাদ্যে' ফিরে আসা।

এই যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যেরই শ্রেষ্ঠ সন্ধান দিয়েছেন প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাতা নাথান প্রিটিকিন তাঁর প্রিটিকিন ডায়েটের মাধ্যমে।

প্রিটিকিন ডায়েটে খাদ্য সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দূর করে এই ডায়েটকে করা হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন। আর সেই সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে খাদ্য-গ্রহণ সম্পর্কে প্রিটিকিনের বিধিনিষেধ।

কিন্তু অনুসরণের আগে প্রিটিকিন ডায়েটে কোন্ ধরনের খাদ্য সমাদৃত বা বর্জিত হল এবং কেন হল অর্থাৎ খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে

প্রিটিকিন পথ্যের মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের একটা পরিচ্ছন্ন প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলা দরকার। এজন্যে প্রথমেই জেনে নিতে হবে কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে আমাদের খাদ্যসম্ভার। তারপর একটি একটি করে বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোয় নিরসন করে নিতে হবে খাদ্য নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি।

আমাদের খাদ্যের উপাদান

পুষ্টিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্যদ্রব্যকে তার জলীয় অংশ ছাড়া উপাদান অনুযায়ী যে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলো হল:

১। প্রোটিন ২। ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ ৩। কারবোহাইড্রেট ৪। ভিটামিন ৫। খনিজ লবণ।

খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। সেই বিভাগগুলি এইরকম:

প্রোটিন

● প্রাণিজ প্রোটিন (কোলেসটেরল-সম্পন্ন)—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি।

● উদ্ভিজ্জ প্রোটিন—নানা রকমের ডাল, বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি।

ফ্যাট (স্নেহপদার্থ)

● প্রাণিজ ফ্যাট—ঘি, মাখন, চর্বি, কড্ লিভার ও শার্ক লিভার তেল প্রভৃতি।

● উদ্ভিজ্জ ফ্যাট—সরষে, বাদাম, রেপসিড, কটনসিড, অলিভ, পাম, নারকেল প্রভৃতির তেল ; বনস্পতি এবং corn, safflower, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিল প্রভৃতির তেল।

এই দুটি প্রধান বিভাগ ছাড়াও কি ধরণের ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি পরিমাণে আছে তার ভিত্তিতে ফ্যাট আবার দু'রকমের :

● স্যাচুরেটেড ফ্যাট—ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যা সাধারণত কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন—ঘি, মাখন, চর্বি, নারকেল তেল, বনস্পতি প্রভৃতি।

● আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট—ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যা সাধারণত তরল অবস্থায় থাকে। যেমন—সরষে, বাদাম, রেপসিড, কটনসিড, অলিভ প্রভৃতির তেল।

পারমাণবিক গঠন অনুযায়ী এক ধরনের আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাটকে বলা হয়—

● পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট। যেমন—Corn, Saffower, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিল প্রভৃতির তেল।

বিভিন্ন স্নেহে ফ্যাটি অ্যাসিডের শতকরা হার

স্নেহ পদার্থ	স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড	আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড
ভয়সা ঘি	৬৩·৬	৩৬·৪
গাওয়া ঘি	৫৯·৫	৪০·৫
নারকেল তেল	৯১·৫	৮·৫
বনস্পতি	৯৪·০	৬·০
সরষের তেল	৪·০	৯৬·৩
বাদাম তেল	১৯·৪	৮১·০
তিল তেল	১৩·৫	৮৪·৫
সূর্যমুখীর তেল	৬·০	৯৪·০

কারবোহাইড্রেট

সমস্ত কারবোহাইড্রেট খাদ্যকে শর্করা (sugar), শ্বেতসার (starch) ও সেলুলোজ (cellulose)—এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

● শর্করা : প্রধানতঃ এই ক'টি শ্রেণীর, যথা—

গ্লুকোজ : পাওয়া যায় আঙুরে, দানা শস্যে এবং কিছু মূলে। রক্তে শর্করা থাকে গ্লুকোজ রূপে।

ফ্রুকটোজ : পাওয়া যায় চাক-ভাঙা মধু, পাকা মিষ্টি স্বাদের ফল এবং কিছু কিছু সব্জিতে।

মলটোজ : পাওয়া যায় চালের শ্বেতসারের মধ্যে।

ল্যাকটোজ : দুধের চিনি।

গ্যালাকটোজ : প্রকৃতির মধ্যে স্বরূপে এর অস্তিত্ব নেই। দুধের শর্করা ল্যাকটোজ ভেঙে গ্যালাকটোজে পরিণত হয়।

সুক্রোজ : সাধারণ চিনি (বিকৃত কারবোহাইড্রেট)।

● শ্বেতসার : উদ্ভিদে কারবোহাইড্রেট থাকে starch বা শ্বেতসার রূপে। চাল, দানা শস্য, বীজ, মূল, সব্জি ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই শ্বেতসার পাওয়া যায়।

● সেলুলোজ (রাফেজ বা খাদ্য-ফাইবার) : খাদ্যশস্য, শাক, সবজি এবং ফলের অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশটিকে সেলুলোজ বা রাফেজ (roughage) বলে। চাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্যের বাইরের অংশ —আমার যাকে তুষ বা ভূষি বলি এবং শাক-সব্জি ও বিভিন্ন ফলের ছিবড়ে—এই সমস্তই প্রধানত সেলুলোজ বা খাদ্য-ফাইবার। এই সেলুলোজ আমরা হজম করতে পারি না কিন্তু নানা দিক থেকে এর উপকার অপরিসীম।

শর্করা, শ্বেতসার ও সেলুলোজ—কারবোহাইড্রেটের এই সাধারণ তিনটি শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও সম্প্রতি সমস্ত কারবোহাইড্রেটকে ভাগ করা হয়েছে দুটি প্রধান বিভাগে—

- প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট (natural, unrefined, complex carbohydrate) যেমন—খাদ্যশস্য, শাক, সব্‌জি এবং ফলমূল।
- বিকৃত কারবোহাইড্রেট (refined, simple carbohydrate) যেমন—চিনি, মিছরি, সর্বপ্রকার মিষ্টি, শোধিত বাজারী মধু, কনফেকশনারি, গুড়, ময়দা, পাঁউরুটি, বিয়ার, অ্যালকোহল, সফ্‌ট ড্রিঙ্কস প্রভৃতি।

ভিটামিন

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, খাদ্যে প্রোটিন, ফ্যাট কারবোহাইড্রেট ও খনিজ লবণ ছাড়া আরও এমন এক ধরনের উপাদানের প্রয়োজন যার অভাবে সহজেই বেরি বেরি, স্কারভি, রিকেট, পেলেগ্রা প্রভৃতি নানা রোগে দেহ আক্রান্ত হয়, অথবা দেহে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রবণতা বেড়ে যায়। ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ বলতে আমরা খাদ্যের এই সূক্ষ্ম উপাদানটিকেই বুঝি।

তুলনামূলকভাবে যদিও ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা খুবই অল্প কিন্তু এর অভাবেই দেহের বৃদ্ধি, তাপশক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ইত্যাদি কাজগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না। এই সব প্রধান ভিটামিনগুলি হল :

- ভিটামিন 'এ' (উৎস : প্রাণীর যকৃৎ, শাক, সব্‌জি প্রভৃতি)।
- ভিটামিন 'সি' বা অ্যাসকর্‌বিক অ্যাসিড (উৎস : আমলকি, পেয়ারা ও বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফল)।
- ভিটামিন 'ই' বা টোকোফেরল (উৎস : শস্যদানা প্রভৃতি)।

● ভিটামিন 'কে' (উৎস : বিভিন্ন শাক, সব্‌জি প্রভৃতি)।

● ভিটামিন বি-কমপ্লেকস (একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভিটামিনের সম্মিলিত রূপ)।

বি-কমপ্লেক্স গোষ্ঠীভুক্ত ভিটামিনগুলির মধ্যে পুষ্টির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল :

* বি-১ বা থিয়ামিন (উৎস : শস্যজাতীয় খাদ্য, যেমন—ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, গম, ছোলা, মটর, বিন, বিট প্রভৃতি)।

* বি—২ ($_১$) বা রিবোফ্লাবিন (উৎসঃ সবুজ শাকসবজি, আলু প্রভৃতি)।

* বি—২ ($_২$) বা নিয়াসিন (উৎস : দানা শস্য, নটে শাক, আলু, বেগুন প্রভৃতি)।

* বি—৬ বা পাইরিডক্সিন (উৎস : শস্য জাতীয় খাদ্য, অঙ্কুরিত শস্য, সব্‌জি প্রভৃতি)।

* বি—'সি' বা ফোলিক অ্যাসিড (উৎস : হিঞ্চে শাক, পালং শাক প্রভৃতি)।

* বি—১২ (উৎস : যকৃৎ, ডিম, দুধ প্রভৃতি)।

খনিজ লবণ

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই খনিজ বা ধাতব লবণের (mineral salts) স্থান। প্রধান প্রধান কাজের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায় :

● অস্থি, পেশী, রক্ত ইত্যাদি গঠনে যারা সক্রিয় অংশ নেয়, যেমন—ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, সালফার, ম্যাঙ্গানীজ ও তামা।

● দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় যারা অংশ নেয়, যেমন—সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ক্লোরিন ইত্যাদি।

● খাদ্য থেকে শক্তি মুক্ত করতে এবং অন্যান্য কাজে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য করে, যেমন—সালফার, ফসফরাস, আয়োডিন ইত্যাদি।

□

ফ্যাট, প্রোটিন, কারবোহাইড্রেট—এদের প্রত্যেকটি নিয়েই আমাদের নানা ভ্রান্ত ধারণা।

এইসব খাদ্য-উপাদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই পারে আদর্শ আহার্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে।

তবে ধারণাগুলি বদ্ধমূল এবং বহুকাল ধরে প্রচলিত, তাই বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্যের কাছে উপস্থিত হতে হবে আমাদের সেই মুক্ত মনটি নিয়ে যা শিশুর মতো সরল এবং আগ্রহী—
টমাস হাক্সলের ভাষায়ঃ

Sit down before fact as a child.
Be prepared to give up
every pre-conceived notion.
Follow humbly where Nature leads, or
you will learn nothing.

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ফ্যাট, প্রোটিন, কারবোহাইড্রেট চা, কফি, নুন ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্য-উপাদানের প্রকৃত গুণাগুণ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হল।

'স্নেহ' অতি বিষম বস্তু !

স্নেহ পদার্থের প্রতি আমরা চিরদিনই স্নেহশীল। তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি যোগে রান্নাটি হয় সুস্বাদু। যে রাঁধে তার খাইয়ে তৃপ্তি, আর যার জন্যে রাঁধা, তার তৃপ্তি খেয়ে।

শুধু কি তাই ? তেল, ঘি আর মাখন খেলে শরীরটি হয় হৃষ্টপুষ্ট, আসে লাবণ্য, কান্তি! প্রায়শই তাই 'স্নেহের' জন্য স্নেহময়ী অসীম স্নেহশীলা।

ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থের প্রধানতম কাজ তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে দেহটিকে কর্মক্ষম রাখা। সেই সঙ্গে দেহে সঞ্চিত হয়ে এক ধরনের প্যাডিং বা ইনসুলেশনের কাজ করা।

ফ্যাট গ্রহণের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ-নিয়ে প্রধান ভ্রান্ত ধারণাটি হল, দেহকে যথার্থ সুস্থ রাখতে দরকার দস্তুর মত তেল, ঘি মাখন প্রভৃতি ফ্যাট খাওয়া।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি সত্য খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের জানা প্রয়োজন ঃ

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কী উদ্ভিজ্জ, কী প্রাণিজ—এমন কোনো খাদ্যবস্তু মানুষের নেই যা সম্পূর্ণ ফ্যাট-বর্জিত।

যদি আহার্য হিসেবে বেছে নেন শুধু খাদ্যশস্য, শাক সব্‌জি আর ফলমূল তাহলেও ঐসব খাদ্যের অন্তর্গত ফ্যাট থেকে আপনি পাচ্ছেন মোট ক্যালরির ৫-১০ শতাংশ !

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির জন্য যতটুকু ফ্যাট আপনার দরকার, উপরোক্ত খাদ্য থেকে দেহ নিজেই সেই পরিমাণ ফ্যাট তৈরি করে নিতে পারে। পারে না শুধু লিনোলেইক আর দু'ধরনের অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড (essential fatty acids) তৈরি করতে। এর মধ্যে লিনোলেইক অ্যাসিড থেকেই বাকি

দু'টি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। তাই ফ্যাট বর্জনে প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় শুধুমাত্র লিনোলেইক অ্যাসিড সরবরাহ নিয়ে। কিন্তু দেহের পক্ষে এই ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন এতই অল্প যে যথেষ্ট ক্যালরি-সম্পন্ন যে কোন আহার্য থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে।

কী পরিমাণ লিনোলেইক অ্যাসিড প্রয়োজন ?

এ-প্রশ্নের উত্তরে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য।

M. Wintz (1970) পরীক্ষার্থে এক ধরণের বিশেষ ডায়েট তৈরি করেন যাতে ফ্যাট হিসেবে লিনোলেইক অ্যাসিডের পরিমাণ ছিল আশ্চর্যরকম স্বল্প—মাত্র ০·৭%। এছাড়া ছিল কারবোহাইড্রেট ৯১%, প্রোটিন ৮·৩%, তদুপরি ভিটামিন ও খনিজ লবণ।

প্রধানতম আহার্য হিসেবে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে এই ডায়েট পরিবেশন করা হয় বেশ কয়েকজন গবেষণা-সহকারীকে। গবেষণা শেষে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায়, সহকারীদের মধ্যে কোনরকম বিরূপ শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া দূরে থাক্, তাদের রক্তচাপ এবং কোলেসটেরল-মাত্রাও কমে গেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে।[১]

পুষ্টি বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গেছে যে লিনোলেইক অ্যাসিডের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা জনপ্রতি প্রত্যহ মাত্র ২·৮ গ্রাম। এবং এ-প্রয়োজন পূরণের জন্যে তেল, ঘি প্রভৃতি ফ্যাট-সর্বস্ব খাদ্যগ্রহণ শুধু অর্থহীন নয়, যথেষ্ট 'ক্ষতিকারক'।*

*'ক্ষতি'-র প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি কিছুকাল ধরে শরীরে ক্যানসার ঘটানোর ব্যাপারে লিনোলেইক অ্যাসিডের ভূমিকা নিয়ে অনেক গবেষকই খুব সোচ্চার হয়েছেন। কেননা তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মেদবহুল শরীরে ঘি, মাখন প্রভৃতি প্রাণিজ ফ্যাটের মাধ্যমে তো বটেই, বাদাম, সরষে, প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেলের মাধ্যমেও অতিরিক্ত লিনোলেইক অ্যাসিড খাওয়া হলে ক্যানসারের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে বাড়ে।

তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি খাওয়ার বিপদ

প্রাণিজ হোক, উদ্ভিজ্জ হোক—যে-কোনোরকম ফ্যাট-বহুল খাদ্য গ্রহণই যে-কয়েক ধরনের শারীরগত ক্ষতিসাধন করে সেগুলি হল :

- অক্সিজেন সংকট ও তৎজনিত বিবিধ ব্যাধির আক্রমণ
- কোলেসটেরলের মাত্রা বৃদ্ধি
- ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি
- ডায়াবেটিসের আক্রমণ

অক্সিজেন সংকট

সব রকমের ফ্যাট-সর্বস্ব খাদ্য রক্তের লোহিত কণিকা এবং ক্ষুদ্রতর অণুচক্রিকার (platelets) চারপাশে একটা ফ্যাটি ফিল্ম-এর সৃষ্টি করে। এর ফলে কণিকাগুলি জমাট বেঁধে যায়। আর এই জমাটবাঁধা অবস্থায় এরা নিজের নিজের কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। উপরন্তু জমাট বাঁধার ফলে ধীরে ধীরে রক্তবাহী ক্যাপিলারিগুলি প্রায় রুদ্ধ হয়ে অবশেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়! এবং এই ক্যাপিলারি ব্লকেজ-এর অর্থ ৫-২০% রক্তপ্রবাহ অচল হয়ে পড়া!

এইভাবে অতিরিক্ত ফ্যাট খাওয়ার উপর ব্যক্তি যখন ধূমপান করে, তখন অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। একে তো অতিরিক্ত ফ্যাট, তদুপরি ধূমপানের মাধ্যমে বিষাক্ত কার্বন-মনোক্সাইড—এ-হ'য়ে মিলে রক্তে অক্সিজেন যাতায়াতের পথ একরকম বন্ধ করে দেয়। রক্ত দূষণের এই অত্যাচার তখন মস্তিষ্কের পক্ষে প্রায় অসহনীয় হয়ে ওঠে।

রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ এইভাবে কমে যাওয়ার ফলে দেহের টিস্যুগুলি তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন প্রাপ্তি থেকে

বঞ্চিত হয়। অক্সিজেন সংকটে টিস্যুর এই দুরবস্থাকেই বলে Tissue anoxia.

এই tissue anoxia যে-সমস্ত মারাত্মক ডিজেনারেটিভ রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত সেগুলি হল :

ধমনী-সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ—অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্রভৃতি ;[২]

অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ইস্কিমিয়া, থ্রমবোসিস প্রভৃতি বিবিধ হৃদরোগ ;[৩]

উচ্চরক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশার ;

রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস ;[৪]

পিত্তপাথরী ;

দৃষ্টিসমস্যা (visual field loss) ;[৫]

শ্রবণ সমস্যা ;[৬]

অকাল বার্ধক্য তথা স্মৃতিভ্রংশ ;[৭]

ম্যালিগনেনসি (ক্যানসার) ;[৮]

কোলেসটেরলের মাত্রা বৃদ্ধি

কোলেসটেরল-মাত্রা বৃদ্ধির অনিবার্য ফল হল সর্ববিধ প্রাণনাশক হৃদরোগ ও ধমনী-সংক্রান্ত রোগ আর সেই সঙ্গে পিত্তপাথরী।

এ-পর্যন্ত যতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাণিজ ফ্যাট-ই কোলেসটেরল মাত্রাবৃদ্ধির অনিবার্য কারণ।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি

অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সাম্প্রতিক বহু গবেষণাই তা প্রমাণ করেছে।[৯] আর এই ইউরিক অ্যাসিড-মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল

মিলিয়ে যে দেহে বাতব্যাধি ও আরথ্রাইটিসের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় দীর্ঘকালীন গবেষণার ভিত্তিতে সেটা প্রমাণ করেছেন A. P. Hall (1967) তাঁর 'পপুলেশন স্টাডি'-র মাধ্যমে।[১০]

তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সহজ করে বললে এইরকম দাঁড়ায়:

ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা	বাতব্যাধি / আরথ্রাইটিস প্রাদুর্ভাবের অনুপাত
৬—৭ m. g %	২%
৭—৮ m. g %	১২%
৮m. g% এবং তদূর্ধ্ব	৩৬%

ডায়াবেটিসের আক্রমণ

পুষ্টিতাত্ত্বিকরা বলছেন, ডায়াবেটিস রোগীর প্রস্রাবে প্রচুর সুগার থাকছে—তার মানে এই নয় যে রোগীর দেহে 'সুগার' আর সহ্য হচ্ছে না। প্রস্রাবে সুগার থাকার কারণ দেহ আর ঐ সুগারকে যথা-প্রয়োজন কাজে লাগাতে পারছে না। কেন না রক্তে উপস্থিত অতিরিক্ত ফ্যাট, দেহকে সুগার থেকে তাপশক্তি নেওয়ার কাজে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে।

অতিরিক্ত ফ্যাটগ্রহণে ডায়াবেটিস দেখা যেতে পারে মাত্র কয়েক ঘণ্টায়

ফ্যাট-সর্বস্ব খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণে দেহের স্বাভাবিক বিপাকীয় (metabolic) কার্যাবলী নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলেই দেহে 'রাসায়নিক ডায়াবেটিক দশা' বা Chemical Diabetic

State'—এর সৃষ্টি হয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি কয়েকটি অনুসন্ধান যেখানে অতিরিক্ত ফ্যাট-সর্বস্ব আহার্য গ্রহণের পর গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট-এ ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল খুব অল্প সময়েঃ

J. P. Felber এবং A. Vannotti (1964)[১১] তাঁদের পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে অতিরিক্ত ফ্যাট সন্দোহাতীত ভাবেই 'diabetic state' সৃষ্টি করতে পারে।

এই পরীক্ষায় প্রথমে ৫ জন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবকের দেহের গ্লুকোজ ও ইনসুলিন-মাত্রা পরিমাপ করা হয়। দেখা যায় দু'টিমাত্রাই যথেষ্ট নর্ম্যাল। অতঃপর আহার্য হিসেবে পরিবেশিত হয় অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্যাট (lipid infusion)। আশ্চর্যভাবে এর মাত্র দু'ঘণ্টা পর পরীক্ষা করে দেখা যায় যে রক্তে মুক্ত ফ্যাটি-অ্যাসিড-মাত্রা স্বাভাবিক ৫০০ ইউনিট থেকে বেড়ে ৭০০ ইউনিটে দাঁড়িয়েছে, ধরা পড়েছে ডায়াবেটিস আর ইনসুলিন-মাত্রাও বেড়ে গেছে ৫০ শতাংশ !

J. S. Sweeney[১২] যুবক ডাক্তারদের ৪টি দলের উপর বিভিন্ন ধরনের আহার্যের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। ঠিক দু'দিন পরেই পরীক্ষা করে যে ফল পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে এইরকমঃ

আহার্যের ধরন	ফলাফল
অতিরিক্ত ফ্যাট-প্রধান	যথেষ্ট-ডায়াবেটিক
অতিরিক্ত প্রোটিন-প্রধান	প্রায়-ডায়াবেটিক
অতিরিক্ত কারবোহাইড্রেট-প্রধান	স্বাভাবিক

স্বল্প ফ্যাট গ্রহণে ডায়াবেটিস নিরাময়

বিভিন্ন সময়ে গবেষকরা রোগীদের স্বল্পফ্যাট-যুক্ত ডায়েটের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিরাময়ে সফল হয়েছেন। জিজ্ঞাসু পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে কটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণের চিত্র তুলে ধরছি :

ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা	আহার্যে ফ্যাট-এর পরিমাণ	পরীক্ষা-কাল	ফল
I. M. ROBINOWITCH (1935)[১৩]			
৫০ জন (ইনস্যুলিন-নির্ভর)	৫৬%	৫ বছর	৮% সম্পূর্ণ ইনস্যুলিন-মুক্ত।
	২১%	৫ বছর	২৮% সম্পূর্ণ ইনস্যুলিন-মুক্ত। অবশিষ্ট রোগীদের ইনস্যুলিন-চাহিদা কমে যায় গড়ে ৫৮%
I. SINGH (1955)[১৪]			
৮০ জন (ইনস্যুলিন-নির্ভর)	১২%	৬ সপ্তাহ	৬২% রোগী সম্পূর্ণ ইনস্যুলিন-মুক্ত।
		১৮ সপ্তাহ	৭২% রোগী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অবশিষ্টদের ইনস্যুলিন-চাহিদা অত্যন্ত কম।

Robinowitch এবং Singh-এর গবেষণা দুটির পর এবার বলি ডায়াবেটিস নিরাময়ে প্রিটিকিন প্রোগ্রামের কথা। লন্‌জিভিটি সেণ্টারে ১৯৭৭ সালে ডায়াবেটিস-এর ক্ষেত্রে প্রিটিকিন

প্রোগ্রামের কার্যকারিতা পরীক্ষার্থে রোগজীর্ণ ডায়াবেটিক রোগীদের যে-খাদ্য পরিবেশিত হয় তাতে ছিল ৮০% প্রকৃতিজাত কার্বোহাইড্রেট (প্রধানত অশোধিত খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাক ও সব্জি); ১৩% প্রোটিন এবং ৭% ফ্যাট।

২৬ দিন পরে ঐ ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে যে সুফল দেখা যায় তার চিত্রটি এইরকম :

ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা	আহার্যে ফ্যাট-এর পরিমাণ	পরীক্ষা কাল	ফল
PRITIKIN LONGEVITY CENTER (1977)			
২২ জন (ইনসুলিন-নির্ভর)	৭%	২৬দিন বা প্রায় ৪ সপ্তাহ	৫০% এরও বেশি রোগী সম্পূর্ণ ইনসুলিন-মুক্ত। অবশিষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন-চাহিদা কমে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে।
৩২জন (ওষুধ-নির্ভর)	৭%	প্রায় ৪ সপ্তাহ	৮১% রোগী সম্পূর্ণ ওষুধ-মুক্ত।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ডায়াবেটিস নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্যেই প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ কেন্টাকি মেডিক্যাল সেন্টারের Dr. J. Anderson মন্তব্য করেন :

'প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ৩০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যেই ৮০% ডায়াবেটিক রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।'[১৫]

স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত খাদ্যের সুফল —দু'টি জনগোষ্ঠীর খবর

A. R. P. Walker (1970) তাঁর গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু প্রদেশের অধিবাসীরা যারা খাদ্যের মাধ্যমে মোট ক্যালরির ১০% ফ্যাট গ্রহণ করে তারা অক্সিজেন সংকট-জনিত সব কটি রোগের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।[১৬]

P. F. Sinnett (1969) নিউগিনির প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর খাদ্যগ্রণের উপর গবেষণা করে দেখেন যে এদের খাদ্যে থাকে ৩% ফ্যাট, ৩% প্রোটিন আর বাকি ৯৪% প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট (মূলত মিষ্টি আলু)। এরা কখনোই অপুষ্টিতে ভোগেনা, পরিশ্রমও করে যথেষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যে এদের মধ্যে একজনেরও ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেশার বা কোন হৃদরোগের বালাই নেই।[১৭]

অতিরিক্ত ফ্যাটগ্রহণ ও ক্যানসার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ফ্যাটগ্রহণের সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে মলাশয়ের ক্যানসার (colon cancer) -এর সম্পর্ক আছে।

অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন আহার্য গ্রহণে উৎপন্ন হয় স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ অ্যাসিড-ধর্মী পিত্তরস (bile acid), সৃষ্টি হয় অসংখ্য অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, অ্যাসিড-ধর্মী পিত্তরসকে, ক্যানসার-ঘটক কারসিনোজেন-এ পরিণত করে। পরিসংখ্যানে আরো জানা যায় যে শুধু মলাশয়ে ক্যানসারই নয়, মেয়েদের বক্ষ-ক্যানসারের সঙ্গেও অতিরিক্ত ফ্যাট খাওয়ার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।[১৮]

হায় প্রোটিন !

'Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a of a tree yeilding seed: to you it shall be for meat.'

GENESIS 1. 29

আমাদের খাদ্যে প্রোটিন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু যতটা প্রোটিন সমাজের বিত্তবানরা প্রতিদিন উদরসাৎ করেন, প্রোটিনের প্রয়োজন তার চেয়ে ঢের কম। আসলে শরীরের দরকার প্রোটিনের মূল উপাদান – অ্যামাইনো অ্যাসিড। পরিপাকের সময় প্রোটিন ভেঙে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়।

মোট ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে ১৪টি শরীর নিজেই তৈরি করতে পারে। বাকি ৮টি পারে না। ঐ ৮টি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড তাই আমাদের প্রোটিন খাদ্যের থেকে পাওয়া দরকার।

প্রোটিন দরকার দেহের পুষ্টির জন্য, বৃদ্ধির জন্য। নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু কোন্ ধরনের প্রোটিন? শস্যদানা, ডাল, শাক-সবজি, ফল প্রভৃতির উদ্ভিজ্জ প্রোটিন না মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতির প্রাণিজ প্রোটিন? যে ধরনের প্রোটিন-ই হোক্ না কেন ঐ মাছ, মাংস, ডিম, দুধের দিকেই আমাদের সার্বজনীন প্রবণতা, দুর্বলতা।

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ—এগুলোর একটিও যদি খাওয়ার সময় না থাকে তাহলে আমাদের অনেকেরই মনে হয় যেন খাওয়া হল না, উপোস করা হল।

মনেও ভাবি, মুখেও বলি, কতকগুলো তরি-তরকারি আর ফল খেয়ে থাকা—সর্বনাশ! একটু মাছ-মাস না খেলে শরীর থাকে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়া নিয়ে আমাদের বদ্ধমূল এই ধারনাটা শুধু যে ভ্রান্ত তা-ই নয়, ক্ষতিকারক।

কিন্তু দেহ কোনো ধারনার বা রসনার বশবর্তী নয়। প্রাণিজ-ই হোক আর উদ্ভিজ্জ-ই হোক ঠিক যতটুকু প্রোটিন কর্মশক্তির জন্য তার দরকার, ততটুকুই সে ব্যবহার করে, বাকিটুকু ফেলে রাখে ফ্যাট বা মেদ হিসাবে। কিন্তু এ-কাজে দেহে তৈরি হয় টক্সিন বা অধিবিষ—যেমন, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি। শরীরকে এই টক্সিন যেমন করেই হোক বর্জন করার চেষ্টা করতে হয়।

মাছ, মাংস, ডিম, দুধে প্রোটিন প্রচুর। তাই অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ সব খাদ্য খেলে দেহে টক্সিন তৈরি হয় এত বেশি মাত্রায় যে শরীর তখন আর বাড়তি টক্সিন বের করে দিতে পারে না। টক্সিন রক্তস্রোতে থেকে যায়। আর এ-থেকেই সৃষ্টি হয় বাত, আরথ্রাইটিস, কিডনি ও লিভারের নানা রোগ।

প্রাণিজ প্রোটিনের আর এক বিপদ কোলেসটেরল। কোলেসটেরল থাকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতির মধ্যে। এরই মাত্রাধিক্যে প্রশ্রয় পায় হৃদরোগ, পিত্তপাথরী, দৃষ্টি-সমস্যা, শ্রবণ-সমস্যা প্রভৃতি।

অতিরিক্ত প্রাণিজ প্রোটিন খেলে ইনসুলিন-মাত্রা চরমে উঠে গিয়ে হাইপার-ইনসুলিনেমিয়া এমন কি নিদারুণ হাইপোগ্লাই-সেমিয়া রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এবং উপসর্গ হিসাবে দেখা দিতে পারে রোগীর স্নায়বিক ও মানসিক দুর্লক্ষণ, যেমন—কোমা, মানসিক বিভ্রান্তি প্রভৃতি।

মাত্রাধিক প্রাণিজ প্রোটিনে শরীরে সৃষ্টি হয় উচ্চ অম্লতা (high acidity)। তখন ঐ অম্ল প্রশমনের জন্য দেহে ক্যালসিয়ামের

ঘাটতি ঘটে এবং শরীর তার খনিজ সমতা (mineral balance) হারায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে ১৪০ গ্রাম প্রোটিন খেলে প্রতিদিন ক্যালসিয়াম ক্ষয়ে যায় ৬০ মি. গ্রা.।

গবেষকেরা লক্ষ করছেন যে শরীর চালনার যদি অভাব থাকে আর তার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর উঁচু মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়া হয়, তাহলে দেখা দিতে পারে osteoporosis, যে রোগে হাড়গুলো দুর্বল এবং ছিদ্রবহুল হয়ে যায় !

যুক্তরাজ্যে এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ৭০ বছর বয়স্ক নিরামিষাশীদের হাড়, ৫০ বছর বয়স্ক আমিষভোজীদের মতো তো বটেই, বরং তাদের চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত !

প্রোটিন নিয়ে আরও খবর আছে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বিভাগের অধ্যাপক Nathan Smith বলেন :

'কারবোহাইড্রেটের চেয়ে প্রোটিন হজম করতে দেহের ৭ গুণ বেশি জল দরকার হয়। কারণ প্রোটিন খেলে শরীরে যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, প্রস্রাবের মাধ্যমে সেটা বের করে দিতে হয়।

পাশ্চাত্যে হাইস্কুলে যে-সব অ্যাথ্‌লেট ফুটবল প্র্যাকটিস করে, তারা শরীর গঠনের জন্য অতিরিক্ত প্রোটিন খায়। কিন্তু ঐ প্রোটিন হজম করতে তাদের দেহের বেশির ভাগ জল খরচ হয়ে যায়, তাই শরীরের উত্তাপ তারা আর প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দিতে পারে না। ফলে অনেক সময়ই heat-stroke-এর শিকার হয়ে অকালে প্রাণ দেয়।'

গোরুর দুধে মাতৃদুগ্ধের ৩ গুণ প্রাণিজ প্রোটিন থাকে। সেজন্য শিশুর যখন মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স, সে সময় তাকে জল না মিশিয়ে গোরুর দুধ খাওয়ালে তার হাইপার-নেট্রেমিক জল-সংকট দেখা দিতে পারে। এ-জাতীয় জল সংকট অত্যন্ত মারাত্মক।

বিখ্যাত চিকিৎসক **W. H. Hay** তাঁর নিজের সেনাটোরিয়ামে গত ৩০ বছর ধরে লক্ষ করেছেন যে কিডনির গোলমাল, হৃৎপিণ্ডের ডায়লেশন, ধমনীর দৃঢ়তা এবং রক্তচাপের এমন একটিও রোগী তিনি পান নি যার ক্ষেত্রে প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়ার আধিক্য ঘটেনি।

এস্কিমোরা প্রায় পুরোপুরি প্রাণিজ প্রোটিন খেয়ে জীবনধারণ করে। তবু তারা ডিজেনারেটিভ রোগের থেকে রক্ষা পায়। কারণ চিনি, ময়দা প্রভৃতি বিকৃত কারবোহাইড্রেট তারা খায় না, নুন এর ব্যবহার জানে না, আর সারাদিন নানা কাজে পরিশ্রম করে প্রচুর।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও ৫০ বছর বয়সেই তারা বুড়ো হতে শুরু করে, ৬০-এর পরে অথর্ব হয়ে পড়ে। অবশ্য খুব কম সংখ্যক এস্কিমোই ৬০-এর বেশি বাঁচে। আর বাঁচলে, ৬০ বছরে দস্তুর মতো বুড়ো হয়ে যায়। তাছাড়া ওদের মধ্যে রক্তক্ষরণের প্রবণতা খুব বেশি। ছেলে, বুড়ো—সকলের প্রায়ই নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। কখনো কখনো এই রক্ত পড়া ওদিন ধরে চলে এবং রোগী মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত পুষ্টিতত্ত্ববিদ **Alfred Herper** বলছেন, 'দেহের জন্য মাছ, মাস, ডিম. দুধ প্রভৃতি 'সম্পূর্ণ প্রোটিনের' প্রয়োজন আছে বলে ধারণাটা একেবারে ভ্রান্ত।

বস্তুত, 'সম্পূর্ণ প্রোটিন' (complete protein) কথাটা চলে আসছে ১৯১৬ সাল থেকে। ঐ সময় দুই গবেষক **Osborne** এবং **Mendel** ইঁদুরের দেহে প্রোটিন খাদ্যের ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। ওঁরা সেই সব খাদ্যকে 'সম্পূর্ণ প্রোটিন খাদ্য' বলেছেন যেগুলি ইঁদুরের স্বাস্থ্য এবং দৈহিক বৃদ্ধিকে সাহায্য করেছে। আর যে-সব খাদ্যে তা হয়নি সে-সব খাদ্যকে বলেছেন 'অসম্পূর্ণ প্রোটিন খাদ্য' (incomplete protein)।

কিন্তু আমাদের দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং ইঁদুরের দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এক নয়। যদি এক হত তাহলে তো আমাদের শিশুদের মাতৃস্তন্য পান করানো চলত না। কারণ মাতৃস্তন্যে আছে মাত্র ১.১%

প্রোটিন, আর ইঁদুরের দুধে আছে ৯·৫% প্রোটিন। একজন্যে প্রোটিন সম্পর্কে 'সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ'—এসব বিশেষণের ব্যবহার করা একেবারেই অর্থহীন।'

অনেকে বলেন প্রাণিজ প্রোটিন, উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। এটাও বাজে কথা। প্রকৃতির দেওয়া সব খাদ্যেই মনুষ্য দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় (এবং অপ্রয়োজনীয়) অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। তাই প্রাণিজ প্রোটিনকে শ্রেষ্ঠ আর উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে নিকৃষ্ট বলার কোনো মানে হয় না।

পরীক্ষার দ্বারা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাপ্তবয়স্করাও কেবলমাত্র গম-জাত খাদ্য (রুটি, সুজি প্রভৃতি) খেয়েই শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

আর পারবে নাই বা কেন? যে-ক্যালরি উৎপাদনের উপর খাদ্যের গুণাগুণ নির্ভর করে তার হিসেবটাই করা যাক্। নিচে লেখা খাদ্যের প্রতি ১০০ গ্রামে ক্যালরি (তাপশক্তি) পাওয়া যায়—

মুরগির মাংসে—১০৯ →	ঢেঁকি-ছাঁটা চালে—৩৪৯
ভেড়ার মাংসে—১৯৪	কলে ছাঁটা চালে—৩৪৫
হাঁসের ডিমে—১৮১	আটাতে—৩৪১
মুরগির ডিমে—১৭৩	সুজিতে—৩৪৮
পাঁঠার মাংসে—১১৮	ছোলার ডালে—৩৮৫
রুইমাছে—৯৭	মসুর ডালে—৩১৬
গরুর দুধে—৬	মুগডালে—৩৫৮

—এইজন্যই বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, যে-সব নিরামিষাশী দুধ পর্যন্ত খান না, তাঁরাও যথা-প্রয়োজন প্রোটিন পান চাল, গম, প্রভৃতি খাদ্যশস্য, ডাল, সব্জি এবং ফল থেকে। এই সব নিরামিষ

খাদ্যের প্রত্যেকটিতেই সবরকম অ্যামাইনো অ্যাসিড নেই, কিন্তু এরা মিলেমিশে শরীরকে প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড যোগান দিতে পারে।

খেলোয়াড় এবং অ্যাথ্‌লেটদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিন আর ফ্যাটের মাত্র বাড়িয়ে কোনো নির্দিষ্ট দৈহিক শ্রম করতে পেরেছে একটানা ৬০ মিনিট আর প্রোটিন, কারবোহাইড্রেট প্রভৃতি মিশিয়ে খেয়ে ঐ শ্রম করেছে একটানা ১২০ মিনিট। কিন্তু শুধু খাদ্যশস্য, শাক-সব্‌জি, ফলমূল খেয়ে ঐ শ্রম করেছে একটানা ১৮০ মিনিট! এই পর্যবেক্ষণ, সন্দেহতীতভাবে প্রমাণ করে যে শ্রমিক, খেলোয়াড় প্রভৃতি যাদের দৈহিক শ্রম বেশি করতে হয়, তাদের প্রাণিজ প্রোটিন বেশি খেতে হবে এটাও নেহাত ভ্রান্ত ধারণা।

আসল কথা, পুরোপুরি নিরামিষ খাদ্য থেকেই আমরা প্রয়োজনের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি প্রোটিন পেতে পারি।

তবুও যদি আপনার মনে হয় যে কম প্রোটিন খেলে আপনি কমজোরি হয়ে যাবেন, আপনার শক্তি-সামর্থ্য কমে যাবে, তাহলে একবার মেক্সিকোর টারাহুমারা ইণ্ডিয়ানদের কথা ভাবুন। ওরা ওদের প্রয়োজনীয় মোট ক্যালরির ১০% পায় প্রোটিন থেকে, ১০% পায় ফ্যাট থেকে আর বাকি ৮০% পায় খাদ্যশস্য, শাক-সব্‌জি আর ফলমূল থেকে। এই খাদ্য খেয়েই ওরা—

- পাঁচ দিনে কম-বেশি ৫০০ মাইল ছোটাছুটি করতে পারে
- ১০০ পাউণ্ডের একটা বোঝা ৭০ ঘণ্টায় ১১০ মাইল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

—ওদের শক্তি-সামর্থ্যের এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে।

ওরা মাসে প্রাণিজ প্রোটিন খায় গড়ে মাত্র ১ বার। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ওদের কোনরকম হৃদরোগ নেই, ব্লাড প্রেশার নেই, ডায়াবেটিস নেই আর নেই স্থূলতা!

মাংসে রোগের বংশ বাড়ে

অষ্ট্রিয়ার Arnold Lorand তাঁর Old Age Deferred-গ্রন্থে পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে অতিরিক্ত মাংসহারের বিপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতিরিক্ত মাংসাহার সম্পর্কে তিনি যে-সব মন্তব্য করেছেন এবং অন্যান্য গবেষকদের যে সব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো এক জায়গায় করলে জানা যায় :

● মাত্রাধিক মাংসাহারে শরীরে টক্সিন বা অধিবিষের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বিশেষ করে লিভার, কিডনি, প্যান্‌ক্রিয়াস প্রভৃতি জরুরী প্রাণরক্ষক অঙ্গগুলি (vital organs), ক্ষতি হয় থাইরয়েড গ্রন্থির, সৃষ্টি হয় বাত, আরথ্রাইটিস ও arteriosclerosis।

● অধিক মাংসাহার প্রায়ই ক্যানসারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

● অতিরিক্ত মাংসাহার কখনও কখনও ডায়াবেটিস ডেকে আনে। তাছাড়া ডায়াবেটিক রোগী বেশী মাংস খাওয়া শুরু করলে রোগের তীব্রতাও বেড়ে যায়।

● অত্যধিক মাংসাহার রক্ত-ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়ে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত করে। তাছাড়া এর ফলে শরীরে এত অম্লের (acid) সৃষ্টি হয় যে তার প্রভাব কিছুটা সামলাতে হলে খেতে হয় প্রচুর ফল ও সব্‌জি।

● মাংসাহার অন্ত্রের peristaltic movement-এর সহায়ক নয় বলে মাংসাহারীদের ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এবং এই কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য যে টক্সিন শরীরে জমে সেটা কিডনিকেও বিব্রত করে।

● দীর্ঘকাল অত্যধিক মাংসাহারের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

● নিরামিষ আহারীদের তুলনায় দেখা গেছে মাংসাহারীদের মধ্যে নিউয়াসথেনিয়া এবং হিস্টিরিয়া রোগের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া নানারকম স্নায়বিক বিকারে মাংস বর্জন করিয়ে দেখা গেছে রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

● যাঁরা লিভারের রোগে ভুগছেন মাংসাহারে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয় কিন্তু মাংস ছেড়ে দিলে অবস্থা অনেক আয়ত্তে আসে।

□

১00 বা ততোধিক আয়ু যাঁরা পেয়েছেন এরকম মানুষের আহার্যের খবর নিয়ে দেখা গেছে যে এঁদের মধ্যে অতিরিক্ত মাংসাহারী নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ একেবারেই মাংস খান না; আর অনেকে আছেন যাঁরা বয়স বাড়তেই মাংসাহার ছেড়ে দিয়েছেন।

মাছ-মাংস খেতে হবে কি ?
খেলে কতটা ?

মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিন পুরোপুরি পরিহার করলে ৫-১0 বছরের ভিতর আপনার শরীরে ভিটামিন বি-১২-এর অভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু নামমাত্র প্রাণিজ প্রোটিন খেলেই প্রয়োজনের চেয়ে ভিটামিন বি-১২-এর অনেক বেশি যোগান শরীর পাবে। কেননা যদিও এই ভিটামিন শুধুমাত্র প্রাণিজ প্রোটিনেই পাওয়া যায় তবু শরীরে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই সামান্য—প্রত্যহ ১গ্রামের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ।

প্রায় ৮০ বছর আগে ১৯০৮ সালে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকার ছাত্রদের উপর এমন কি সৈন্যদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রত্যহ ৩h গ্রাম মাছ/মাংস খাওয়াই যথেষ্ট। এই অল্প পরিমাণ প্রাণিজ প্রোটিনেও ব্যক্তির কর্মকুশলতা ও শক্তির কোনো অভাব হয় না।

কিন্তু অভাব না হলে কি হবে ? শুধু আমেরিকা কেন সব উন্নত দেশেই অতিরিক্ত প্রোটিন খাওয়াটা এখন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ।

আহার্যে প্রোটিনের এই ভয়াবহ আধিক্য লক্ষ্য করে, প্রিটিকিন জনপ্রতি মাছ / মাংস গ্রহণের দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৯৮ গ্রামে সীমিত রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন ।

তবে এ ব্যাপারে আমরা ভারতবাসীরা কিছুটা নিশ্চিন্ত, বিশেষ করে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত। **Indian Council of Medical Research** তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে মাছ-মাংস সুপারিশ করেছেন জনপ্রতি প্রত্যহ ৩০ গ্রাম। এ জন্যে ভারতবর্ষে প্রিটিকিন আহারীর পক্ষে মাছ-মাংস প্রত্যহ ৩০—৯৮ গ্রামের সঙ্গেই সীমিত রাখা উচিত। সত্যি বলতে সাধারণত ৩০ গ্রামের বেশি মাছ-মাংসের খাওয়া আমাদের বেশির ভাগেরই সাধ্যাতীত। একালে মাছ-মাংসের ক্রমবর্ধমান অগ্নিমূল্য তাই আমাদের কাছে অভিশাপের বেশে আশীর্বাদ।

প্রসঙ্গত, পশুমাংসের চেয়ে মুরগি প্রভৃতি পাখীর মাংস খাওয়া অনেক নিরাপদ কেননা তাতে ফ্যাট কম, কোলেসটেরল কম। অবশ্য পাখীর মাংসের চেয়ে আরো বেশি নিরাপদ হল ছোট মাছ বা lean fish খাওয়া।

বিভিন্ন প্রাণীর মাংসের প্রধান পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে উপস্থিত ফ্যাট-এর ক্রমানুসারে)

	ক্যালরি	প্রোটিন (গ্রাম হিসাবে)	ফ্যাট
মুরগি	১০৯	২৫·৯	০·৬
কচ্ছপ	৯৩	১৫·০	১·২
গরু	১১৪	২২·৬	২·৬
ছাগল	১১৮	২১·৪	৩·৬
শূকর	১১৪	১৮·৭	৪·৪
ভেড়া	১৯৪	১৮·৫	১৩·৫

দুগ্ধং পিবন্তি...?

ভারতবর্ষে বেশির ভাগ মানুষই নিরামিষাশী তাই দুধ নিয়ে এদেশে হইচই-টা খুব বেশি। বাঙালীর তো ভালো খাবার তৈরি করতে হলেই দুধ আর চিনি চাই। দুধ-চিনি দিয়ে তৈরি দোকানের নানা মিষ্টি যেমন খাচ্ছে বাঙালী তেমনি খাচ্ছেন বাঙালীর নানা দেবতা। বাংলার ঈশ্বরী পাটনীও স্বয়ং ঈশ্বরীকে তুষ্ট করে বর চেয়েছিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় যে দুধ নিয়ে আমাদের এইসব প্রচলিত ধারণাগুলো বহুলাংশেই অবৈজ্ঞানিক।

পুষ্টিতাত্ত্বিকরা বলছেন,

শুধু মানুষই নয়, যে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেই স্তন্য-নির্ভর শৈশব ছাড়া অন্য কোন বয়সেই দুধ স্বাভাবিক খাদ্য নয়।

দুধ-ই যখন আমাদের একমাত্র খাদ্য তখন সেই দুধের যোগাড় আসে মাতৃস্তন্য থেকে। মা যদি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী হন, এবং তাঁর আহারে যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি থাকে, তাহলে মাতৃস্তন্যই হচ্ছে স্তন্য-নির্ভর শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

মাতৃদুগ্ধের এমনই ধর্ম যে শিশুর যত বয়স বাড়ে মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন প্রভৃতির পরিমাণও সেই অনুসারে প্রয়োজনমতো বাড়তে থাকে। শুধু তাই নয় ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Steven Gross লক্ষ্য করেছেন যে যথাসময়ের পূর্বেই যদি সন্তান জন্মে যায় তাহলেও মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন, সোডিয়াম এবং ক্লোরাইডের উপস্থিতি এমন পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, যা ঐ অসময়ে জাত শিশুটিও সহজে হজম করতে পারে।

কিন্তু স্তন্য-নির্ভর শৈশবের পর মাতৃস্তন্য ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালে আমরা অন্য প্রাণীর দুধ খাওয়াটা চালিয়ে যাই।

এটা একটা অজানিত অনিয়ম। আসলে মানুষের পক্ষে দুধই 'আদর্শ খাদ্য'—এই কথাটা এদেশে ওদেশে দীর্ঘকাল ধরেই আমরা বিশ্বাস করে চলেছি। ফলে মায়ের দুধ ছাড়বার পরেও আমাদের ঘরে ঘরে শিশুদের অন্য কোন প্রাণীর দুধ খাওয়ানোর রেওয়াজ।

কিন্তু মাতৃস্তন্য ছাড়িয়ে শিশুকে সরাসরি নির্জলা গরুর দুধ খাওয়ানোর বিশেষ বিপদ আছে। গরুর দুধে মাতৃস্তন্যের ৩ গুণ পরিমাণ প্রোটিন থাকে বলে সরাসরি গরুর দুধ খেয়ে শিশুর হাইপারনেট্রেমিক জল-সংকট দেখা দিতে পারে। এ-জাতীয় জল-সংকট (dehydration) অত্যন্ত মারাত্মক। কেননা এতে মস্তিষ্ক ও কিড্‌নি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে!

তাছাড়া আগেই বলেছি কারবোহাইড্রেটের চেয়ে প্রোটিন হজম করতে ৭ গুণ বেশি জল দরকার হয়। এজন্য যে-সমস্ত শিশু কোনো কারণে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বোতলের দুধ খায়, তাদের শরীরে প্রোটিন বিপাকে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ বের করে দিতে প্রচুর জল খাওয়াতে হয়।

সর্বোপরি গরুর দুধে রয়েছে মাতৃদুগ্ধের চেয়ে দস্তুর মতো বেশি পরিমাণে প্রাণিজ ফ্যাট ও কোলেসটেরল। তাই শিশুকে দাঁত ওঠার পরবর্তীকালে গরুর দুধ খাওয়ানোর অর্থ তার শরীরে বাড়তি প্রোটিন-কোলেসটেরল-ফ্যাট-জনিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

আসল কথা, মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে শিশু যখন বড়দের মত ভাত, রুটি, সব্‌জি, ফল প্রভৃতি খেতে পারে তখন তাকে ঐসব খাদ্যই দেওয়া উচিত। তাতেই তার স্বাভাবিক পুষ্টি হতে পারে।

গান্ধীজি বলেছেন, "এ বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম লক্ষ্য করা যাউক। গো-বৎসের দন্তোদগম হইলেই সে আর দুগ্ধ পান করে না। মানুষের আচরণও তদ্রূপ হওয়া উচিত। ফলমূল আহার করিতে

শিখিলে আর দুগ্ধ ব্যবহার উচিত নহে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। দুগ্ধ শিশুরই জন্য।"[১৯]

সভ্য সমাজে এদেশে ওদেশে দুধের মাধ্যমে বাড়ন্ত শিশুর ক্যালসিয়াম যোগানো নিয়ে একটা ব্যস্ততা আছে। কিন্তু এ-ব্যস্ততারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মাতৃস্তন্য ছাড়বার পর কোনরকম দুধ খায়নি বলে শিশুর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ঘটেছে এরকম কোন নজির বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবেও নেই।

মাথার কাজ যারা করে তাদের দুধ খাওয়া দরকার—এটি আর একটি চলিত ভ্রান্তধারণা। ওরেগন-এর Dr. Morice Bowerman তাঁর Milk and Thought Disorder গ্রন্থে লিখেছেন যে পরীক্ষাধীন একাধিক মানসিক রোগী—যাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে এলোমেলো চিন্তা, নিরাসক্তি (detachment), ক্ষীণস্মৃতি, মানসিক সক্রিয়তার অভাব (poor mental efficiency) এবং সর্বোপরি সব কাজে ক্লান্তিতে ভুগছিলেন তাঁদের খাদ্য থেকে যখন দুধ বাদ দেওয়া হয়, তখন শতকরা ৮০ জনেরই সব দুর্লক্ষণ চলে যায় এবং ১০ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি।

তাহলে দুধ খাবো কি ?

দুধ নিয়ে সব রকম বিচার বিশ্লেষণ করে পুষ্টিবিদরা বলছেন :

মাখন-যুক্ত দুধ নয়, জনপ্রতি প্রত্যহ সর্বাধিক ১ গ্লাস (২২৫ গ্রাম) স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধ বা ৫ টেবিল চামচ স্কিমড মিল্ক পাউডার অথবা সেই পরিমাণ দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্য—ছানা প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে।* আর যদি কারো পনিরের দিকে ঝোঁক থাকে তবে তিনি নির্ধারিত পরিমাণ স্কিমড মিল্ক পাউডার ও তৎজাত বিভিন্ন খাদ্যের বদলে প্রত্যহ সর্বাধিক

* অবশ্য দই-এর কথা আলাদা।

২৮-৫৬ গ্রাম ১০০% স্কিমড মিল্কের পনির খেতে পারেন। যে সব ছেলেমেয়ে স্বল্প প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য খায় তারাও সারাদিনে মোট ১ গ্লাস স্কিমড মিল্ক খেতে পারে। গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য।*

—এই স্কিমড মিল্ক এর ব্যবহার প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলেছেন: 'Contrary to the popular belief, skimmed milk is a very valuable article of diet.···The chief function of milk is to supply animal protein for tissue repairs. Skimming, while partially removes the fat, does not affect the protein at all',[২০]

দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে)

	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	এ
		(গ্রাম হিসাবে)			I. U.
মাতৃদুগ্ধ	৬৫	১·১	৩·৪	৭·৪	১৩৭
গরুর দুধ	৬৭	৩·২	৪·১	৪·৪	১৭৪
স্কিমড মিল্ক	২৯	২·৫	০·১	৪·৬	
হোল মিল্ক	৪৯৬	২৫·৮	২৬·৭	৩৮·০	১৪০০
মহিষের দুধ	১১৭	৪·৩	৮·৮	৫·১	১৬০
ছাগলের দুধ	৭২	৩·৩	৪·৫	৪·৬	১৮২
পনির	৩৪৮	২৪·১	২৫·১	৬·৩	২৭৩
ছানা (গরুর দুধের)	২৬৫	১৮·০	২০·৮	১·২	৩৬৩
দই (গরুর দুধের)	৬০	৩·১	৪·০	৩·০	১০২
ঘোল	১৫	০·৮	১·১	০·৫	+

* প্রসঙ্গত মাছ-মাংস যাঁরা খান তাঁদের জন্যে উল্লিখিত পরিমাণ—স্কিমড মিল্ক/পাউডার বা ১০০% স্কিমড মিল্কের পনির খাওয়া পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত। যাঁরা মাছ মাংস খাননা তাঁরা ঐসব খাদ্য প্রত্যহ সর্বাধিক গ্রহণ করতে পারেন দ্বিগুণ পরিমাণে।

টক দই, না লাল-বাজারী ?

এদেশে বহু প্রদেশের লোকের মধ্যেই নিয়মিত টক দই খাওয়ার রেওয়াজ। মাদ্রাজীরা দই-ভাতে সন্তুষ্ট। কত পাঞ্জাবী পরিবারে দই-রুটি আর আচারেই সানন্দ নৈশাহার।

বাঙালীর খাদ্য তালিকায় দই প্রতিদিন থাকে না। থাকলেও মিষ্টি দই খেতেই বাঙালী অভ্যস্ত। অথচ বাঙালী ছাড়া আর কোনো প্রদেশের লোক মিষ্টি দই খায় না। কিন্তু টক দই-এর উপকার মিষ্টি দই-এ পুরোপুরি পাওয়া যায় না। মিষ্টি লাল বাজারী দই উপকারের চেয়ে অপকার করে বেশি। দই পাতার সময় দুধের সঙ্গে চিনি মেশালে মিষ্টি দই। কিন্তু চিনি থাকলেই অ্যাসিড হওয়া থেকে শুরু করে শরীরে নানা দুর্বিপাকের সম্ভাবনা।

আমাদের জাতীয় পুষ্টি সংস্থার মতে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দুপুরে ২০০ গ্রাম আর রাতের ভোজনে ২০০ গ্রাম টক দই খাওয়া দরকার। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রির্সাচ-এর পুষ্টি-বিদ্‌দেরও অভিমত, স্কুল যাবার আগের বয়সের শিশুদের রোজ ২০০ গ্রাম টক দই খাওয়ান উচিত। কেননা খাওয়ার সময় দই বা ঘোল খেলে সমস্ত খাদ্যের প্রোটিন-মূল্য ভালোরকম বেড়ে যায়।

বস্তুত পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখতে হলে টক দই আমাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। কেননা টক দই-এর উপকারিতা এতরকম যে নিয়মিত টক দই একটু না খেলে প্রকৃতপক্ষেই আমরা একটি সুলভ অথচ পুষ্টি মূল্যবান খাদ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবো।

তবে টক দই-এর উপকার জানার আগে দরকার এ সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি বদ্ধমূল ধারণার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা।

এই ধারণাগুলি হল :

- দই খেলে অ্যাসিড হয়
- মাংস খাওয়ার পর দই খাওয়া উচিত নয়
- দই খেলে ঠাণ্ডা লাগে, গলা নষ্ট হয়

দই খেলে অ্যাসিড হতে পারে না। দই নিজেই অন্য খাদ্যের পরিপাক করিয়ে অ্যাসিড নষ্ট করে।

মাংস খাওয়ার পর দই অনায়াসে এবং নিশ্চিন্তে খাওয়া চলে। দই-এর একটা ধর্মই হল আমিষকে হজম করানো আর নিরামিষের খাদ্যগুণ বাড়িয়ে দেওয়া।

দই খেলে ঠাণ্ডা লাগে বা গলা নষ্ট হয় এটাও মিথ্যে ধারণা। দই যে গলার কোন ক্ষতি করে না এ আজ পরীক্ষিত সত্য। তবে ফ্রিজে রাখা 'হিমশীতল দই' খেলে গলার ক্ষতি হতেই পারে।

এবার আসুন দই-এর অগণিত গুণাবলী আর উপকারের প্রসঙ্গে।

'দই থেকে তৈরি ঘোল বা লস্যি শুধু যে মুখোরোচক তাই নয়, এর উপকারও বিবিধ। পেট গরম হলে, পেটে বায়ু হলে এমন কি সর্দি হলেও ঘোল পান করলে উপশম হয়।'[২১]

দই পাকস্থলীতে খাবারের পচন প্রতিরোধ করে। পেটে গিয়ে তৈরি করে ভিটামিন-বি। পেটের ভেতরের ঘা সারাতে দই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করার কাজেও এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দই কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করে, অর্শের পক্ষেও দই উপকারী।

'দই অকাল বার্ধক্য ও চুলপাকা বন্ধ করে।...মুখে মাখলেও চামড়া মসৃণ হয় ও মুখের দাগ উঠে যায়।

...শিশু থেকে বৃদ্ধ দই, সকলের জন্যই সমান পুষ্টিকর। দই মানুষের শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস গ্রহণে সাহায্য করে। এই দুটি উপাদানই শিশুদের মস্তিষ্ক এবং হাড় গঠনে প্রয়োজনীয়।'[২২]

'বৈজ্ঞানিকেরা আজ নিঃসন্দেহ—দই পরমায়ু বাড়ায়···নানাবিধ রোগের আক্রমণ ঠেকায়, এমনকি কোন কোন কর্কট রোগ বা ক্যানসারের প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

···অনেকে আবার দুধের ভক্ত কিন্তু দুধই সহ্য করতে পারেন না। এই পেট-ফাঁপলো না হয় হজম হলো না, পেট দম্ হলো—সেখানে কিন্তু দুধের বিকল্প হচ্ছে দই।

···Gastro-intestinal disturbance, যকৃতের রোগ, ডায়েরিয়া, Nephritis বা কিড্‌নির রোগ, Colitis, রক্তশূন্যতা বা anemia, ক্ষুধা-মান্দ্য বা অক্ষিদে, Intestial intoxication এই সমস্ত রোগে, এখনকার ডাক্তাররা প্রচুর পরিমাণে দই খেতে পরামর্শ দেন। কেউ কেউ বললেন, দই নিজেই অনেকটা Natural Antibiotic এর মতো কাজ করে।···আরও একদল বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করলেন যে দইয়ের Tumour প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। বলতে কি, দইয়ের ব্যাকটিরিয়া Lactobacillus bulgaricus ইন্‌জেকশান করে কিছু কিছু বিশেষ ধরনের Cancer রোগে অনেকটা উপশম হয়েছে। এখন এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে দইয়ের আর এক ব্যাকটিরিয়া Lactobacillus acidophilus মলাশয় বা colon -এর cancer-এর অন্যতম প্রতিষেধক।

আধুনিক একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে বুলগেরিয়ার লোকেরা প্রচুর পরিমাণে দই খান বলে দীর্ঘজীবী। খুঁতখুঁতে লোকেরা বললেন—তাঁদের হৃদ্‌পিণ্ড সরল আর মজবুত সেটাই তাঁদের দীর্ঘজীবনের আসল কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক বাক্যে জানালেন—দই, বুলগেরীয় লোকেদের রক্তে Cholesterol আশাতীত কম রাখে—সেটাই তাঁদের দীর্ঘায়ুর গোপন কথা।

আরও একটা সমীক্ষায় দেখা গেল—আফ্রিকার আদিবাসী মাসাই-রা (Masai) দৈনিক দু গ্যালন পরিমাণ দই খেয়ে থাকেন,

সেই কারণে তাঁরাও দীর্ঘজীবী, অনেক বয়েস পর্যন্ত সুস্থ-সবল দেহে ঘর-সংসার করেন। ল্যাবরেটরীর নিভৃত-কোণে বৈজ্ঞানিকেরা এখন উঠে পড়ে লেগেছেন—দইয়ের মধ্যে কি সেই কারণ বা factor যা, cholesterol-কে রক্তে আশাতীত কম রাখে।

সাবধান করে দিই, দই কখনও বেশি বাসি করে বা তিন-চার দিন পর খাবেন না, এতে বিপদ হতে পারে। Bacterial food poison, Bacterial dysentery বা Fungal foodpoison এর সম্ভাবনা রয়েছে।'[২৩]

আর একটা কথা। সব সময় ঘরে-পাতা দই খাবেন আর স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধের থেকে তৈরি দই হল সবচেয়ে উপকারী, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত। কেননা সেক্ষেত্রে বাড়তি ফ্যাট ও কোলেসটেরল গ্রহণ থেকেও আপনি পারছেন মুক্ত থাকতে।

রক্ত-গরল ঃ মাত্রাধিক কোলেসটেরল

কোলেসটেরল থাকে শুধুমাত্র ডিম, চর্বি, মাংস, মেটে, মাখন, দুধ, মাছ প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যে। ফ্যাটের সঙ্গে সামান্য মিল থাকলেও কোলেসটেরল কিন্তু ফ্যাট নয়।

কোলেসটেরল মোমের মতো এক ধরনের হালকা হলুদ পদার্থ, রক্তে যার পরিমিত মাত্রায় উপস্থিতি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, অথচ যার মাত্রা বেড়ে গেলে জীবন-সংশয় পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

আমাদের রক্তে কোলেসটেরল স্বাভাবিক ভাবেই আছে। দেহের প্রতিটি কোষই কোলেসটেরল তৈরি করে, তবে সবচেয়ে বেশি তৈরি করে লিভার, তারপর হৃদযন্ত্র, কিউনি প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ (organs) ও গ্রন্থিগুলি। স্পাইনাল কর্ড এবং মস্তিষ্কের টিস্যুতেও কোলেসটেরল থাকে উচ্চমাত্রায়। স্নায়ুতন্ত্রের কাজের সঙ্গে কোলেসটেরল যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত বলেই Stress বা মানসিক সংকটকালে কোলেসটেরল-মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।

রক্তস্রোতে দু'রকমের কোলেসটেরল দেখা যায়। এক জাতীয় কোলেসটেরল দেহজাত, অর্থাৎ যা দেহ তার প্রয়োজন মতো নিজেই তৈরি করে। আর এক জাতীয় কোলেসটেরল খাদ্যগত অর্থাৎ যা খাদ্যের মাধ্যমে রক্তস্রোতে পৌঁছায়। রক্ত পরীক্ষা করে যে 'সিরাম কোলেসটেরল-মাত্রা' পাওয়া যায় সেটা ঐ দু'ধরনের কোলেসটেরলের সমষ্টি।

কোলেসরেল বেড়ে যায় কেন

হৃদরোগ, ধমনী-সংক্রান্ত রোগ, পিত্তপাথরী প্রভৃতি নানা ধরনের ডিজেনারেটিভ রোগের সঙ্গেই জড়িত কোলেসটেরলের মাত্রাবৃদ্ধি। সভ্য সমাজে মানুষের রক্তে কোলেসটেরল বেড়ে যাওয়ার প্রধানতম কারণ কোলেসটেরল-যুক্ত খাদ্য গ্রহণ।

আসলে খাদ্যগত কোলেসটেরল দেহ-যন্ত্রের পছন্দ নয়, তাই সে তার প্রয়োজনীয় কোলেসটেরল নিজেও তৈরি করে। এইভাবে খাদ্যগত আর দেহজাত—এই দু'দিক থেকে কোলেসটেরলের উপস্থিতির ফলে ব্যক্তির সর্বমোট কোলেসটেরল-মাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত ঐ খাদ্যগত কোলেসটেরলের উৎস ডিম, মাংস, চর্বি, মাখন। কিন্তু প্রাণিজ খাদ্য ছাড়াও বিকৃত কারবো-হাইড্রেট যেমন চিনি, মিষ্টি, ময়দা, মদ প্রভৃতি খেলেও রক্তে কোলেসটেরল মাত্রা বেড়ে যায়। এর কারণ, এ-জাতীয় খাদ্য শারীরবৃত্তে মানসিক চাপের (stress) সমতুল্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে শরীরকে অত্যধিক দেহজাত কোলেসটেরল তৈরি করতে বাধ্য করে।

বিভিন্ন প্রণিজ খাদ্যে কোলেসটেরল (প্রতি ১০০ গ্রামে)

ডিমের কুসুম	১৫০০	মি. গ্রা.
মুরগির মাংস	৬০	,,
ভেড়া বা পাঁঠার মাংস	৭০	,,
ঐ চর্বি □ ঐ লিভার (মেটে)	৯৫ □ ৩০০	,,
ঐ ব্রেইন	৬৭৫	,,
মাখন	২৫০	,,
১ কাপ দুধ (হোল মিল্ক)	৩৩	,,
২ কাপ দই (স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত দুধের)	১১	,,

কোলেসটেরল মাত্রাধিক্যে রোগসৃষ্টি

বহু অর্থব্যয়ে দীর্ঘ দশ বছর ধরে গবেষণার পর ১৯৮৪ সালে আমেরিকান সরকার ঘোষণা করেছেন যে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে কোলেসটেরল মাত্রাধিক্যের সরাসরি যোগ আছে। শুধু তাই নয়, প্রাণিজ খাদ্য-গ্রহণ যত কমানো যাবে, কোলেসটেরল-মাত্রা তথা হৃদরোগের আশঙ্কাও তত কমে আসবে।[২৪]

ডাক্তাররা কোলেসটেরল-যুক্ত খাদ্য সম্পর্কে তখনই প্রথম সচেতন হয়ে ওঠেন, যখন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে হৃদরোগীদের ধমনীগুলো কোলেসটেরল জমে জমে শক্ত, সরু এবং প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থার নামই হচ্ছে অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস (atherosclerosis)। আর এই অ্যাথেরোস্‌ক্লেরোসিস যখন হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত-সরবরাহকারী করোনারী ধমনীগুলোতে দেখা যায়, তখন সৃষ্টি হয় মারাত্মক cornary artery disease।

এ-রোগের প্রথম অবস্থায় ডিম, মাংস, মাখন প্রভৃতির মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যগত কোলেসটেরল ধমনীগুলির গায়ে গিয়ে জমা হয়। এইভাবে ক্রমাগত কোলেসটেরল জমে জমে ধমনী-দেয়ালের নানা জায়গায় সৃষ্টি হয় হলদে রঙের দাগ। তারপর ধমনীর অসংখ্য কোষ ঐ জমে-ওঠা কোলেসটেরল ধীরে ধীরে শোষণ করে নেয়। কিন্তু এক সময় কোলেসটেরল-ভারাক্রান্ত কোষগুলো ফাটতে শুরু করে। তখন শরীর ঐসব ক্ষতস্থান মেরামত করবার চেষ্টা করলে সেখানে আরও নতুন কোষের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধমনীর গায়ে তৈরি হয় এক-একটি শক্ত ফলক বা arterial plaque.

এই plaque বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তপ্রবাহ ক্রমশ মন্থর হয়ে আসে এবং হৃদযন্ত্রে রক্ত-সরবরাহ যথেষ্ট ব্যাহত হয়। এর ফলে হৃদযন্ত্রের মাংস-পেশীতে দেখা দিতে পারে শ্বাসরোধকারী ক্ষণস্থায়ী তীব্র যন্ত্রণা (অ্যানজাইনা)। ধীরে ধীরে যখন ধমনীর ছিদ্র অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন রক্ত অতি ক্ষীণধারায় বয়ে হৃৎপিণ্ডকে কোনরকমে সঞ্জীবিত রাখে। কালক্রমে ধমনী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে অক্সিজেনের অভাবে ঐ ধমনী-নির্ভর হৃৎপেশীর স্থানিক মৃত্যুর (myocardial infarction) সূচনা হয়। হৃদযন্ত্রে এভাবে রক্ত সরবরাহের অভাবেই দেখা দিতে পারে হার্ট ফেলিওর, হার্ট ব্লক প্রভৃতি নানারকম সাংঘাতিক হৃদরোগ। আর মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে দেখা যায় stroke।

এই কারণে যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্রাধিক রক্ত-ফ্যাটের জন্যেও ধমনী-সংক্রান্ত রোগ দেখা গেছে তবু বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক বিচারে মাত্রাধিক কোলেসটেরলকেই বলা যায় হৃদরোগ তথা ধমনী-সংক্রান্ত রোগের যথার্থ সূচক (accurate indicater)।

এহ বাহ্য। উল্লিখিত রোগগুলি ছাড়াও কোলেসটেরলের মাত্রাবৃদ্ধি আরও যে-সমস্ত রোগসৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, সেগুলি হল : arcus senilus (চক্ষুরোগ), কানে কম শোনা, পিত্তপাথরী প্রভৃতি।

কোলেসটেরলের নিরাপদ-মাত্রা

প্রিটিকিন বলছেন, 'হৃদরোগ তথা ধমনী-সংক্রান্ত রোগ প্রভৃতির থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার একটি সার্থক পরীক্ষিত ফরমূলা হল, রক্ত কোলেসটেরলকে (১০০+আপনার বয়স)—এই মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সীমা রাখতে হবে ১৬০ m. g%-এ। কেননা কোলেসটেরল-মাত্রা ১৬৫ m. g. %-এর বেশি হলেই ধমনীগত বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই মনে করেন যে এই মাত্রা ১৫০ m. g.% থেকে ৩৩০ m. g.%—এর মধ্যে থাকলেই হল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। কোলেসটেরলের ঐ মাত্রাধিক্য যে আদৌ স্বাস্থ্যের সপক্ষে নয় সেটা অগণিত গবেষণার মাধ্যমে সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত।'[২৫]

ম্যাসাচুসেটস-এর ফ্যামিংহাম-এ ৫০০০-এর বেশি স্ত্রী-পুরুষের উপর প্রতি দু'বছর অন্তর দীর্ঘ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যাদের কোলেসটেরল-মাত্রা ১৪০ m. g.% তাদের ক্ষেত্রে ধমনী-সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কল্পনাতীত ভাবে কম—০'৫% অর্থাৎ ২০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জনের। পক্ষান্তরে যাদের কোলেসটেরল-মাত্রা ৩৬০

m. g.%, তাদের ক্ষেত্রে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব বেশি—৭০% অর্থাৎ ২০০ জনের মধ্যে ১৪০ জনের।

ইকোয়াডোরে ৮০০ জনের এক জনগোষ্ঠী নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে ঐ গোষ্ঠীতে হৃদরোগ ও ধমনী-সংক্রান্ত রোগ শুধু অল্প নয়, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গোষ্ঠীতে এমন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের বয়স ছিল শতাধিক। সেখানে সকলেরই আহার্য ছিল প্রধানত লাল চাল, ভুট্টা, শাক-সব্‌জি, ফলমূল প্রভৃতি প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট। আর প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়ার রীতি ছিল সপ্তাহে মাত্র ১ বার। উল্লেখ্য, ঐ গোষ্ঠীর পরিণত ব্যক্তিদের গড় কোলেসটেরল-মাত্রা ছিল ১৫0 m.g.%।

যেহেতু মাত্রাধিক কোলেসটেরল-ই হৃদরোগ, ধমনী-সংক্রান্ত রোগ প্রভৃতির অভ্রান্ত সূচক, তাই ঐ সব রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে কোলেসটেরল কমিয়ে অবশ্যই নিরাপদ মাত্রায় নিয়ে আসতে হবে।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক J. M. R. Beveridge (1956) লক্ষ্য করেন শুধুমাত্র ফ্যাট-সর্বস্ব তথা কোলেসটেরল-সম্পন্ন খাদ্যগ্রহণ কমিয়ে ফেলতে পারলেই কোলেসটেরল-মাত্রা যথা-সত্বর কমে যায়।

পরীক্ষার্থে তিনি পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের প্রায় ফ্যাট-বর্জিত কোলেসটেরল-মুক্ত খাদ্য পরিবেশন করে দেখেন যে মাত্র ৪ দিনের মধ্যেই শতকরা ৯৫ জনের কোলেসটেরল-মাত্রা ২০০ m. g.% থেকে নেমে দাঁড়ায় ১৫০ m. g.%-এ।[২৬]

এই প্রসঙ্গে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট Antonio Gotto বলেন, ধমনী-সংক্রান্ত রোগ (atherosclerosis) ধীরে ধীরে জীবনের গোড়া থেকেই শুরু হয়। তাই শিশুদের ২ বছর বয়স থেকেই কম ফ্যাট এবং কম কোলেসটেরল-যুক্ত খাদ্য খাওয়ানো শুরু করা উচিত। শিশুরা অল্প বয়স থেকে এ-ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত হলে, বড়ো হয়েও ঐ খাদ্যরীতিই অনুসরণ করে।...সবাই যদি একথা মেনে চলেন তাহলে হৃৎপিণ্ডের বাইপাস

সার্জারি—যেটা এখন আমেরিকায় প্রচুর হচ্ছে, সেটা এ-শতাব্দীর শেষভাগে বিরল হয়ে যাবে এবং মনুষ্য সমাজ একদিন ধমনী সংক্রান্ত রোগকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারবে।

নিরাপদ কোলেসটেল-মাত্রা ফিরে পেতে কি খাবো, কি খাবো না

কোলেসটেরল-সম্পন্ন খাদ্যের প্রধানতম উৎস হল প্রাণিজ প্রোটিন এবং প্রাণিজ ফ্যাট। কোলেসটেরল-মাত্রা কমানোর ব্যাপারে ঐ দুই প্রাণিজ খাদ্য-গ্রহণ সম্পর্কে পুষ্টিতাত্ত্বিকদের অতি সাম্প্রতিক পরামর্শ হল :

প্রাণিজ প্রোটিন

কোলেসটেরল নিরাপদ মাত্রায় কমিয়ে আনতে সব রকমের প্রাণিজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ) খাদ্যই পরিহার্য। তবে—অল্প পরিমাণ lean fish* অর্থাৎ স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত ছোট মাছ আর মাংসের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে শুধু চিকেন বা ঐ জাতীয় পাখীর মাংস খাওয়া চললেও পশুমাংস বর্জনীয়। এছাড়া নিষিদ্ধ চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি খোলা-যুক্ত (shelled) প্রাণী।

ডিমের কুসুম ও মাছের ডিম অবশ্য পরিহার্য। (ডিমের সাদা অংশ অর্থাৎ egg white/ albumen কোলেসটেরস-মুক্ত বলে খাওয়া চলবে।)

এছাড়া দুধের ব্যাপারে ফ্যাট-যুক্ত দুধ এবং ঐ দুগ্ধজাত খাদ্য তথা হোলমিল্ক পাউডার সম্পূর্ণ বর্জন করে, স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধ এবং ঐ দুধের দই, ছানা প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে।

---

* Lean fish-এর মধ্যে পড়ে শিঙি, ল্যাঠা, বেলে, মৃগেল, পমফ্রেট, ভেটকি গুড়জাওয়ালি, মাগুর, আড়, ছোট রুই, কাতলা, পাবদা, শোল, পুঁটি, বাটা প্রভৃতি। বিভিন্ন মাছের পুষ্টি-উপাদান (পৃষ্ঠা ৯৯-১০০) দ্রষ্টব্য।

□ প্রাণিজ ফ্যাট

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শুধু ঘি, মাখন, চর্বি, কডলিভার ও শার্ক লিভার তেল প্রভৃতি প্রাণিজ ফ্যাটই নয়, সবরকম স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণেই কোলেসটেরল মাত্রা বেড়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে সবরকম স্যাচুরেটেড ফ্যাটই বর্জন করতে হবে।

এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট-এর আওতায় পড়ে সর্বপ্রকার প্রাণিজ ফ্যাট এবং কয়েকটি উদ্ভিজ্জ ফ্যাট, যেমন—নারকেল তেল, পাম তেল, বনস্পতি প্রভৃতি।

এজন্যেই স্যাচুরেটেড ফ্যাট পরিত্যাগ করে আমরা যখন বাদাম. সরষে, রেপসীড প্রভৃতির তেল (আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট) খেতে শুরু করি তখন দেখি কোলেসটেরল-মাত্রা বেশ কমে গেছে !

অনেকে বলেন আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাটের চেয়ে আরও নিরাপদ হল পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যেমন—Corn, Safflower, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিল প্রভৃতির তেল খাওয়া।

●

মুশকিল হল. পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণে অতিরিক্ত কোলেসটেরল-মাত্রা অবধারিত ভাবে কমে গেলেও দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রেই এরা স্যাচুরেটেড ফ্যাটের চেয়েও ক্ষতিকারক !

এ-প্রসঙ্গে M. Friedman (1965) পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে উভয় প্রকার ফ্যাট গ্রহণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত-ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে ক্যাপিলারি ব্লকেজ' সৃষ্টি হয়। [৭]

ফ্রিডম্যান তাঁর পরীক্ষায় ৪৩ জন পরীক্ষাধীন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে একরাত্রি উপবাস করিয়ে পানীয় হিসেবে পরিবেশন করেন নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্যাট যুক্ত heavy cream (স্যাচুরেটেড ফ্যাট)। দেখা যায় ওঁদের দেহে প্রত্যাশিত ভাবেই লোহিত কণিকা জমাট বেঁধে তথা রক্তফ্যাট-মাত্রা বেড়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্যাপিলারি ব্লকেজ।

এরপর অন্য এক দিন ঐ পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদেরই পানীয় হিসেবে পরিবেশন করা হয়, একই পরিমাণ ফ্যাট সম্পন্ন safflower তেল (পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট)। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সমমানের ক্যাপিলারি ব্লকেজ !

বিপদ এখানেই শেষ নয়। দেখা গেছে পলি আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও ধ্বংস করে ভিটামিন-ই। প্রসঙ্গত এই ভিটামিন-ই'র বিনষ্টিই প্রশ্রয় দেয় পিত্তপাথরী রোগের প্রাদুর্ভাব, এমন কি টিউমার সৃষ্টিকে।

S. M. Grundy (1970) পরীক্ষাগত ভাবে প্রমাণ করেন যে আসলে আন্-স্যাচুরেটেড তথা পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণে কিছু পরিমাণ কোলেসটেরল, রক্তরস (প্লাজমা) থেকে স্থান পরিবর্তন করে দেহকোষে আশ্রয় নেয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে এই জাতীয় ফ্যাট-গ্রহণে কোলেসটেরল-মাত্রা কমে যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ মাত্রার কোনো যথার্থ তারতম্য ঘটে না।[২৮]

●

এত কথার পরেও বলতে হয়, এখন সভ্যতা এমন এক জায়গায় এসেছে যে কোলেসটেরল-সম্পন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রন করার জন্যও আমাদের যথেষ্ট মনোবল দরকার। কেননা আজ মানুষের আভিজাত্য, অর্থ সামর্থ্য প্রভৃতি বিচার করবার সোজা রাস্তা দাঁড়িয়েছে, সে কী খাচ্ছে—সেটা লক্ষ্য করা। এদেশে যারা প্রায়ই পোলাও, মাংস, সন্দেশ, রাবড়ি খায় আমরা ধরে নিই তারা অভিজাত এবং বিত্তবান। তেমনি আবার শাক, সব্‌জি, ছোট মাছ প্রভৃতি খেলে ধরে নিই তারা সাধারণ গৃহস্থ এবং নিম্নবিত্ত। পাশ্চাত্যেও হোটেল, রেস্তোরাঁতে গিয়ে লোকটি কী খাবারের

অর্ডার দিচ্ছে তাই দিয়ে ওয়েটার থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব সবাই তার আর্থিক অবস্থা আঁচ করবার চেষ্টা করে। একটা বড়ো ব্যবসার কথাবার্তা হবে এজন্য অপরপক্ষকে নিয়ে হোটেলে ঢুকে অথবা প্রেমিকাকে নিয়ে হোটেলে ঢুকে যদি অর্ডার দেন টোস্ট, ফিশফ্রাই আর স্যালাড, তাহলে ব্যবসা নিয়ে যাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরাই হোন আর প্রেমিকাই হোন—সবাই ভাববেন আপনি অসুস্থ নয়তো একেবারেই নিরুদ্যম আটপৌরে মানুষ!

তাই যে-সব সুস্থদেহী এখন থেকেই কোলেসটেরল-যুক্ত খাদ্য কম খেতে চান, তাঁদের পক্ষে করণীয় হচ্ছে :

- বাড়িতে বা রেস্টুরেণ্টে পশুমাংস বাদ দিয়ে চিকেন খাওয়া
- টাটকা ছোট মাছ খাওয়া
- কালেভদ্রে উদ্ভিজ্জ-তেলে-ভাজা খাবার খাওয়া
- ডিম, ঘি, মাখন, ক্রীম, দুধের সর পুরোপুরি বাদ দেওয়া।

বিভিন্ন মাছের (Lean fish) পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে □ উপস্থিত ফ্যাট-এর ক্রমানুসারে)

মাছের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি.গ্রা. হিসাবে)		
সিঙ্গি	৯৬	২২.৮	০.৬		৬৭০	৬৫০	২.২
ল্যাটা	৮৩	১৯.৪	০.৬		৬.০	৫৩০	১.৩
বেলে	৭৫	১৪.৫	০.৬	২.৯	৩৭০	৬৩০	১ ০
মৃগেল	৯৮	১৯.৫	০.৮	৩.২	৩৫০	২৮০	১.৯
পমফ্রেট	৭৮	১৫.১	১.০	২.২	২০০	২৯০	০.৯
ফলুই	৮২	১৯.৮	১.০	১.০	[illegible]৯০	৪৫০	১.৭
ভেটকি	৭৩	১৩.৭	১ ১	১.২	৫৩০	৪০০	১.০
গুড়জাওয়ালি	৭৬	১৬.১	১.১	০.৫	৩০০	২০০	২.১
মাগুর	৮৬	১৫.০	১.১	৪.২	২১০	২৯০	০.৭
আড়	৮৯	১৫.৯	১.৩	৩.৫	৩৮০	১৮০	০.৭

মাছের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি.গ্রা. হিসাবে)		
ছোট রুই	৯৭	১৬.৬	১.৪	৪.৪			
কাতলা	১০৬	১৮.৬	১.৯	৩.৭	৫১০	২১০	০.৮
পাবদা	১১৪	১৯.২	২.১	৪.৬	৩১০	২১০	১.৩
শোল	৮৫	১৬.২	২.৩	১.৩	১৪০	৯৫	০.৫
ছোট পুঁটি	১০৬	১৮.১	২.৪	৩.১	১২০	৯৬	১.০
বাটা	৮৯	১৪.৩	২.৫	২.২	৭৯০	২০০	১.১
বোয়াল	১১৬	১৫.৪	২.৭	৭.৬	১৬০	৪৯০	০.৬
খয়রা	১২০	১৮.০	৩.০	৫.২	৫৯০	২২০	০.৭
খলসে	১১২	১৬.১	৩.৯	৩.১	৪৬০	৩৬০	০.৯
মৌরলা	১১৯	১৮	৪.১	২.৬	৫৫০	২৫০	০.৭
বাচা	১৪০	১৮.১	৫.৬	৬.১	৫২০	১৮০	০.৭
ট্যাংরা	১৩৪	১৯.২	৬.৪	০	২৭০	১৭০	২.১
কই	৭০	১৪.৮	৮.৮	৪.৪	৪১০	৩৯০	১.৪
ভাঙ্গর	১৫৪	১৪.৮	৮.৮	৩.৮	১৮২	১৯০	১.২
সরপুঁটি	১৬১	১৬.৫	৯.৪	২.৩	২২০	১২০	০.৫
ইলিশ	২৭৩	২১.৮	১৯.৪	২.৯	১৮০	২৮০	২.১

বিকৃত কারবোহাইড্রেট

(চিনি, মিষ্টি, ময়দা, মদ)

দেহকে শক্তি এবং তাপ জোগায় কারবোহাইড্রেট। কিন্তু আমরা অনেকেই কারবোহাইড্রেট বললেই বুঝি শ্বেতসার বা স্টার্চ। আর মনে করি কারবোহাইড্রেট যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কেননা কারবোহাইড্রেট খেয়ে—

- মানুষ মোটা হয়ে যায়
- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (resistance) চলে যায়
- শরীর-চালনায় সাবলীলতা এবং মস্তিষ্কের সক্রিয়তা কমে যায়।

আসলে 'কারবোহাইড্রেট' নামটাই বিভ্রান্তিকর। চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য, সবরকমের তরি-তরকারি, ফলমূল—এরা সবাই কারবোহাইড্রেট। আবার এই কারবোহাইড্রেট থেকে আমরা যেসব খাদ্য তৈরি করি যেমন চিনি, মিছরি, গুড়, ময়দা, মদ—এরাও কারবোহাইড্রেট।

কারবোহাইড্রেট ২ ভাগে বিভক্ত—

১. **প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট** (natural, complex carbohydrate), যেমন—খাদ্যশস্য, শাক-সব্‌জি, ফলমূল প্রভৃতি।

২. **বিকৃত কারবোহাইড্রেট** (refined carbohydrate), যেমন—চিনি, মিছরি, সর্বপ্রকার মিষ্টি, শোধিত বাজারী মধু, কনফেকশনারি, গুড়, জ্যাম, জেলি, সিরাপ, আইসক্রিম, চকলেট, লজেন্স, চুয়িংগাম, ক্যানডি, ডেক্সট্রোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি এবং ময়দা, পাঁউরুটি বিয়ার, অ্যালকোহল, Sweetener-যুক্ত বিবিধ সফ্‌ট ড্রিংকস প্রভৃতি।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, কার্বোহাইড্রেট নিয়ে আমাদের সমস্ত ধারণা

ঐ বিকৃত কারবোহাইড্রেটের ক্ষেত্রেই সত্যি, কখনোই প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে নয়।

এজন্যে এ-সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করতে প্রধানত চিনি, ময়দা আর মদ—এই তিনটি অতি প্রচলিত বিকৃত কারবো-হাইড্রেট খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

□ চিনিকে চিনে রাখুন □

চিনিকে চিনিয়ে দেবার জন্য মানবপ্রেমিক খাদ্যবিদরা চিনির নাম দিয়েছেন White poison—সাদা বিষ! বলেছেন, pure white and deadly—নিখুঁত, সাদা, সাংঘাতিক!

—বস্তুত, এগুলি চিনির নির্ভুল, সার্থক পরিচয়।

এককভাবে চিনি-ই হল সেই খাদ্যবস্তু যা এই শতাব্দীতে আমাদের উদ্ভাবিত প্রায় সব খাদ্যে অবধারিতভাবে উপস্থিত থেকে আমাদের সুস্থতা ও স্বাস্থ্যকে দস্তরমতো বিপন্ন করে তুলছে।

প্রখ্যাত খাদ্যবিদ Dr. Y. Stein পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, চিনি খেলে দেহে যথাপ্রয়োজন কোলেসটেরল-সৃষ্টিকারী থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে বেড়ে যায় রক্ত-ফ্যাট এবং কোলেসটেরল-মাত্রা তথা রক্ত-ঘনত্ব। এইভাবে চিনি হার্ট অ্যাটাক ত্বরান্বিত করে। আবার ভিটামিন বি-১ নষ্ট করে চিনি দেহে সৃষ্টি করে অয়োডিন-সংকট।

'Anti sugur man' হিসেবে পরিচিত ইংলণ্ডের Dr. John Yndkin বলেন: চিনিতে যদিও কোলেসটেরল নেই কিন্তু চিনি খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীরবৃত্তে মানসিক চাপের (stress) সমতুল্য,প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে দেহ অত্যধিক কোলেসটেরল তৈরি করতে বাধ্য হয়। মানবদেহে রক্ত ফ্যাট এবং রক্ত-কোলেসটেরল মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও চিনি মানুষ, পশু সকলেরই ইনসুলিন, কর্টিজোন প্রভৃতি হরমোন-মাত্রায় এনে দেয় মারাত্মক পরিবর্তন।

পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট বেশি। Dr. Yudkin অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছেন যে দ্বীপবাসীদের অতিরিক্ত চিনি-যুক্ত আহার্যই এই হৃদরোগের জন্য দায়ী। কারণ, এবং ফ্যাট খায় অল্প, সিগারেটও কম খায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে দৈহিক পরিশ্রমও করে প্রচুর। আসলে চিনি-ই অবধারিতভাবে রক্ত-ফ্যাটমাত্রা বাড়িয়ে হৃদরোগের আক্রমণ প্রায় নিশ্চিত করে তোলে।

চিনি তথা সর্বপ্রকার বিকৃত কার্বোহাইড্রেটের আর একটি অনিবার্য ফলশ্রুতি—হাইপোগ্লাইসেমিয়া।

চিনি. মিছরি ময়দা, মদ প্রভৃতি অতি দ্রুত রক্তে মিশে ব্লাড-সুগারের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। তখন মাত্রা কমানোর জন্য সুগারকে ফ্যাটে পরিবর্তিত করতে হয়। এজন্য প্যান্‌ক্রিয়াস নিঃসরণ করে মাত্রাধিক ইনসুলিন। ফলে ব্লাডসুগার-মাত্রা ভীষণ-ভাবে কমে গিয়ে সৃষ্টি হয় হাইপোগ্লাইসেমিয়া রোগ।

সভ্যসমাজে হাইপোগ্লাইসেমিয়া রোগটি দিন দিন বাড়ছে। প্রাথমিক অবস্থায় এর উপসর্গ হল ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতি। আর রোগ বেড়ে গেলে দেখা যায় নানা ধরনের স্নায়বিক ও মানসিক উপসর্গ, যেমন—মাথাঘোরা, অবসন্নতা, কথা বলায় অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছ দৃষ্টি এমন কি অস্বাভাবিক আচরণ, ঘনঘন মূর্ছা থেকে শুরু করে কোমা পর্যন্ত।

এই হাইপোগ্লাইসেমিয়ার জন্যই ব্যক্তি ব্লাডসুগার-মাত্রা বাড়িয়ে তোলবার তাগিদ বোধ করে। এবং এই তাগিদ থেকেই আসে মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা।

এইভাবে মিষ্টি থেকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং হাইপোগ্লাই-সেমিয়া থেকে আবার মিষ্টি খাওয়া এইভাবে একটা নেশার মতো ব্যাপারটা চলতে থাকে। আর এই মিষ্টি খাওয়ার নেশায় যে ডিজেনারেটিভ রোগটি দেহীর অজান্তে সর্বদেহে বিশেষ করে মধ্যদেহে বাসা বাঁধে, তার ডাক নাম 'মোটা হওয়া', ভালো নাম স্থূলতা।

মধু কি চিনির চেয়ে ভালো?

সবরকম শোধিত কারবোহাইড্রেটই ক্ষতিকারক। মধুও। তবে মৌমাছিদের দ্বারা শোধিত হলেও চাক-ভাঙা মধুতে যথেষ্ট খনিজ লবণ এবং এনজাইম থাকে বলে তা স্বল্প পরিমাণ খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ বাজারী মধু-ই processed বলে ঐ-সব খাদ্যগুণ তাতে পাওয়া যায় না। তাই 'অনুপান' ছাড়া অন্য কোন ভাবে অতিরিক্ত মধু খাওয়া ক্ষতিকর।

গুড় কি চিনির চেয়ে ভালো?

দেখতে ভালো না হলেও গুড়ে থাকে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা আর সামান্য প্রোটিন। তবে বিকৃত শর্করা হিসেবে মোটের উপর গুড় ক্ষতি করে চিনির মতোই।

স্যাকারিন?

স্যাকারিন খাওয়া নিরাপদ নয়। কানাডার বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে চিনির বদলে স্যাকারিন যারা খায় তাদের ক্ষেত্রে ব্লাডার-ক্যানসার-এর প্রাদুর্ভাব, যারা খায় না তাদের চেয়ে ৬০ গুণ বেশি!

□ ময়দা □

আবিষ্কারের পর থেকেই সভ্য মানুষের খাওয়া-দাওয়ায় ময়দা বেশ জাঁকিয়ে আসর করে নিয়েছে। ওদেশের পাঁউরুটি, প্যাটিস, পেস্ট্রি, কেক থেকে শুরু করে এদেশের লুচি, নিমকি, কচুরি, সিঙারা, গজা, রাধাবল্লভী প্রভৃতি হালুইকরের হাজার খাবার—সবই তো ময়দার খেলা! কিন্তু অন্যান্য ক্ষতি ছাড়াও ময়দা, বিশেষ করে, দেহের রাসায়নিক সমতা বিপর্যস্ত করে দেয়। তাছাড়া ময়দা খাওয়ার সঙ্গে আরথ্রাইটিসের সম্পর্ক বহু ভাবেই প্রমাণিত।

□ পানদোষে বুঝি প্রাণ যায়! □

চিনি, ময়দার পর আর একটি নামজাদা বিকৃত কারবোহাইড্রেট হল অ্যালকোহল বা মদ।

অতিরিক্ত ক্যালরি ছাড়া আর কোনো পুষ্টি-মূল্য নেই বলে অনেক খাদ্য বিজ্ঞানীর মতে মদ-কে 'পানীয়' না বলে 'ড্রাগ' বলা-ই যুক্তিযুক্ত।

মদ খেলে লিভারের প্রচুর ক্ষতি হয়—এ-কথা বহুকাল ধরে বহুভাবে আলোচিত হয়েছে, তাই মনে হয় এ-বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু মদ খাওয়ার অন্যান্য কুফল সম্পর্কে আধুনিক গবেষণালব্ধ কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করছি :

● মদ খেলে রক্তকণা জমাট বেঁধে যায়, রক্ত-ফ্যাট মাত্রা বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে, নষ্ট হয় বহু প্রয়োজনীয় পুষ্টি-পদার্থ (nutrient) আর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় এনজাইম। সব মিলিয়ে একদিকে রক্তের অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা কমে যায়, অন্যদিকে ব্যাহত হয় হৃৎপিণ্ডে রক্ত-সরবরাহ। আর এই দুই বিপর্যয়ের মারাত্মক প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কের উপর।

● মদ খেলে দেহের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (immunisation system) বিপর্যস্ত হয়। এজন্যেই মদ্যপায়ীদের মধ্যে নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ বেশি হতে দেখা যায়। তাছাড়া এরা কষ্টও পায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে।

● মদ্যপানে বেড়ে যায় সর্বমোট কোলেসটেরল-মাত্রা, বেড়ে যায় ইডেমা তথা আরথ্রাইটিস-জনিত যন্ত্রণার তীব্রতা।

● অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রায়ই মূত্রনালী থেকে শুরু করে মূত্রস্থলী পর্যন্ত সমগ্র মূত্রযন্ত্রে (urinary tract) এবং প্রসটেট গ্রন্থিতে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়।

● অতিরিক্ত ক্যালরি-সম্পন্ন অন্যতম বিকৃত কারবোহাইড্রেট হিসেবে মদ, স্থূলতা ও হাইপোগ্লাইসেমিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

● মদ্যপান শারীরবৃত্তে মানসিক চাপের (stress) সমতুল্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

● সামান্য মদ খেলেও বিচার-বুদ্ধি ব্যাহত হয়। মোটর দুর্ঘটনায় শতকরা ৫০টি ক্ষেত্রেই দেখা যায় চালক মদ্যপান করে অপ্রকৃতিস্থ ছিল।

● মদ খেলে কারো মনে একটা অহেতুক স্ফূর্তি আসে, কেউ ভয়ানক বিষণ্ণ হয়ে পড়ে আবার কেউ-বা হিংস্র হয়ে ওঠে। অনেক সময়েই মনটা বিবেকশূন্য হয়ে সমাজবিরোধী কাজের দিকে বা কোনরকম অপরাধ সাধনের দিকে ছুটে যায়।

□

রক্ত চলাচল উন্নত হবে ভেবে হৃদরোগী বিশেষ করে অ্যানজাইনার বহু রোগী একটু-আধটু মদ্যপান করেন। কিন্তু তাঁদের এই ভাবনাটা একরকম অর্থহীন।

রক্তবাহীনল প্রসারণে মদের একটা ভূমিকা বা vaso-dialating effect নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা দেহচর্মের ঠিক নিচে অবস্থিত সূক্ষ্ম ক্যাপিলারিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রক্তবাহী ধমনীর উপর মদ-এর সামান্যতমও dialating effect নেই। উপরন্তু মদ্যপানে ব্যাহত হয় হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা। দেখা গেছে অ্যানজাইনা রোগীর ক্ষেত্রে মাত্র দুটো ককটেল-ই আগামী ২৪ ঘন্টার জন্যে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় ২০ শতাংশ। কিন্তু মদ্যপানের ফলে শরীর কিছুটা অবশ থাকে বলে রোগী এই বিপর্যয় ঠিক টের পান না। সচরাচর অ্যানজাইনা প্রকাশ পায় অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম বা মানসিক সংকটকালে। মদ্যপায়ী অ্যানজাইনা রোগীদের সৌভাগ্য যে তাঁরা মদ্যপান করতে করতে কোনো রকম

ভারী দৈহিক কাজ করেন না। যদি করতেন, তবে হাতে-নাতে প্রমাণ পেতেন যে প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, মদ্যপান নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেয় অ্যানজাইনার তীব্রতা !

অনেকে বলেন, মদ্যপান শুধু যে মনটা relax করে দেয় তাই নয়, ঘুম আসাতেও যথেষ্ট সহায়তা করে।

সত্যি কথা। কিন্তু মদ্যপানের অগণিত ক্ষতির তুলনায় ঐ গুণ দুটি যথেষ্ট কি ? পক্ষান্তরে স্বাভাবিক দেহচর্চা কোনোরকম ক্ষতিসাধন না করেও দিতে পারে আরো বিশ্রাম, আরো গভীরতর ঘুম আর সেই সাথে আগামী দিনটির জন্যে আরো বেশি প্রাণশক্তি !

□

এক নজরে

বিকৃত কারবোহাইড্রেট গ্রহণের কুফল

যে রূপেই গৃহীত হোক্ না কেন, চিনি থেকে শুরু করে মিষ্টি, শোধিত মধু, ময়দা, মদ, বিয়ার, সফ্ট ড্রিংকস পর্যন্ত অত্যধিক ক্যালরি-সম্পন্ন প্রতিটি বিকৃত কারবোহাইড্রেট খাদ্যই রক্তের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে, রক্ত-ফ্যাট ও কোলেসটেরল-মাত্রা বাড়িয়ে, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, স্থূলতা প্রভৃতি ডিজেনারেটিভ রোগের আক্রমণের ক্ষেত্র তৈরি করে। আর রোগ থাকলে তার দুর্লক্ষণ আরো প্রকট করে তোলে।

এছাড়াও প্রতিটি বিকৃত কারবোহাইড্রেট খাদ্য দেহ-মনের আরও যে-সমস্ত ক্ষতি সাধন করে সেগুলি হল :

- দেহ-কোষে অক্সিজেন-বিনিময় প্রতিহত করে
- নষ্ট করে ভিটামিন ও বিভিন্ন পুষ্টিপদার্থ
- নিষ্ক্রিয় করে দরকারী এনজাইমগুলিকে
- দেহের রাসায়নিক সমতা বিপর্যস্ত করে উপরন্তু শারীরবৃত্তে সৃষ্টি করে মানসিক চাপের (stress) সমতুল্য প্রতিক্রিয়া ॥

সেই সনাতন কারবোহাইড্রেট

চরক বলেছেন—প্রকৃতিমভীক্ষং স্মরেৎ—সর্বদা প্রকৃতির অনুসরণ করবে।

পুষ্টিতত্ত্বের আধুনিক গবেষণাও খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক খাদ্য-গ্রহণকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই নয়, দেখা গেছে খেলোয়াড় অ্যাথ্‌লেটদের জন্যেও প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেই আদর্শ খাদ্য।

গবেষকরা বলছেন, আপনি যদি প্রতিদিন প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট খাদ্য ছাড়া কিছুই না খান, যদি শস্য, শাক্‌-সবজি আর ফলমূলের নানা বৈচিত্র্যে আহারটিকে করে তোলেন আকর্ষণীয় ও উপাদেয়, তাহলেও আপনি পাচ্ছেন—

● আদর্শ তাপশক্তি (ক্যালরি) ও শ্রমশক্তি (stamina) ;

□ প্রোটিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অত্যাবশ্যক (essential) অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি ;

● যথা-প্রয়োজন ফ্যাট, ভিটামিন ও মিনারেল ;

□ প্রয়োজনমতো গ্লুকোজের সরবরাহ (যার ফলে ব্লাড-সুগার মাত্রা সঠিক থাকে, শরীরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং মস্তিষ্কে সক্রিয়তা অব্যাহত থাকে) ;

● প্রাণিজ প্রোটিন/ফ্যাট খাদ্যে না থাকায় অতিরিক্ত কোলেসটেরল থেকে নিষ্কৃতি ;

□ তুষ-যুক্ত চালের সফেন ঝরঝরে ভাত, তুষ-যুক্ত আটার রুটি, চাপাটি, স্যালাড হিসাবে কাঁচা সব্‌জি এবং তৎসহ রান্না তরকারি ও ফলমূলের থেকে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান খাদ্য-ফাইবার।

● শাক ও সব্‌জির মাধ্যমে খাদ্যের পরিপাক ও দহনে যথেষ্ট সহায়তা, এবং প্রভূত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ;

□ দেহে বিশুদ্ধ, সাবলীল অক্সিজেন-সম্পন্ন রক্তপ্রবাহ।

এইসব অনিবার্য সুফল লাভের জন্যই আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ আহার্যে খাদ্যশস্য, শাক্-সব্জি, এবং ফলের উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এবার আসুন ঐ সনাতন কাবোরহাইড্রেট খাদ্যগুলির প্রতি আর একটু বিষদভাবে দৃষ্টি দেওয়া যাক :

ভাত না রুটি ?

খাদ্যগুণের বিচারে একপক্ষে ভাতের চেয়ে আটার রুটি প্রশস্ত কেননা রুটি অনেক বেশি তাপশক্তি বা ক্যালরি উৎপাদন করতে সক্ষম। যেমন ধরুন, আধ ছটাক চাল থেকে আমরা পাই ১০২·১ ক্যালরি আর আধ ছটাক আটা থেকে পাই ৯৬·৪ ক্যালরি। কিন্তু যখনই রান্না হল, অমনি ছবিটা পুরো পালটে গেল। চাল থেকে যখন ভাত তৈরি হল তখন চালের ক্যালরি ১০২·৯ থেকে নেমে দাঁড়াল ৫৬·৭। অথচ আটার ক্যালরি ৯৬·৪ রুটি হয়ে দাঁড়াল ১০১·২।

সাদা ধবধপে 'ফাইন' চালের প্রতি আমাদের দুর্বলতা। কিন্তু ঐ বেশি-ছাঁটা সাদা চালে একে তো ভিটামিন কম থাকে তার উপর যখন ভাতের ফ্যানটাও ফেলি দিই তখন সেই সঙ্গে বাদ পড়ে যায় প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের একটা বড়ো অংশ।

গমের তুষের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভুল আমরা করে থাকি। আটা চেলে রুটি বানাই। অথচ গমের তুষে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি-১ বা থিয়ামিন মজুত থাকে।

সবদিক দিয়ে বিচার করে পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিদিনই ২ রকমের খাদ্যশস্য যেমন ভাত-রুটি মিশিয়ে খাওয়া উচিত। এ-ক্ষেত্রে ভাত হল কম-ছাঁটা (lightly milled) চালের সফেন শুকনো ভাত। রুটির ক্ষেত্রে তুষ-যুক্ত আটার রুটি।

ভাত-রুটির প্রসঙ্গে আরও দু একটা খবর জানাই –বিশেষ করে এদের অন্তর্গত সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সম্বন্ধে।

'ভাতে জল দিয়ে রাখলে অর্থাৎ পান্তা ভাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স তৈরি হয়। তবে পান্তা ভাত ধুয়ে নিয়ে খেলে উপকার হবে না, ভেজান জল সমেতই খেতে হবে। রুটি করার সময়ও একটু বেশি জল দিয়ে আটা মেখে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর রুটি করতে হয়।…এতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তৈরি হয়। মাখা আটার লেচি অল্প একটু তুলে রেখে পরের দিন আটা মাখার সময় সেটা মিশিয়ে নিতে হয়। আবার সেদিনের একটু লেচি রেখে পরের দিনের ফ্রেশ আটার সঙ্গে মেখে রুটি করতে হয়।…এই পদ্ধতির সাহায্যেও রুটিতে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স তৈরি হয়।'[২৯]

ভাত রুটির পরিপ্রেক্ষিতেই বলে রাখি যে সুজিতে প্রোটিন থাকে আটার চেয়ে বেশি অথচ ফ্যাট থাকে কম। সেইজন্য সুজি এক উত্তম খাদ্য। চিড়া, মুড়ি, ছাতু, খৈ-তেও যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালরি, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি আছে।

* চাল, গম, সুজি প্রভৃতির পুষ্টি-উপাদান (পৃষ্ঠা—১১২) দ্রষ্টব্য

ডালের ডালি

ডাল একটি উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। গমের ২ গুণ এবং কলে-ছাঁটা চালের প্রায় ৪ গুণ প্রোটিন ডালে আছে। শুধু তাই নয় এক ছটাক যে-কোন প্রকার ডালে প্রোটিনের পরিমাণ—১ ছটাক মাংসের প্রোটিনের সমান, ১ ছটাক ডিমের প্রোটিনের ২ গুণ এবং ১ ছটাক দুধের প্রোটিনের প্রায় ৭ গুণ! তাই আমাদের মতো গরীব দেশে অল্প খরচে ডাল থেকেই অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যেতে পারে।

অনেকেই বদহজমের ভয়ে বেশি ডাল খেতে চান না। কিন্তু যদি ভালো করে রান্না করা যায়, তবে ডালের প্রোটিনের এক বিরাট অংশ (৯৯%) দেহযন্ত্রের ব্যবহারে লাগে। জাতীয় পুষ্টি সংস্থার মতে ৫ গ্রাম চাল/আটার সঙ্গে ১ গ্রাম ডাল খাওয়া দরকার। অথচ আমরা গড়ে ১২ গ্রাম চাল / আটার সঙ্গে মাত্র ১ গ্রাম ডাল খাই! কিন্তু যথেষ্ট গ্রহণের আগে চাই ডালের সঠিক নির্বাচন।

মুগ ডাল সবচেয়ে সহজপাচ্য এবং রোগীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারও যথেষ্ট

মসুর-ও সহজপাচ্য এবং এতে প্রোটিনের পরিমাণ সর্বাধিক।

মাসকলাই ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লোহা থাকে। দক্ষিণ ভারতীয়রা নানাভাবে এই ডাল ব্যবহার করেন।

সয়াবিন ও **ছোলার** ডাল 'প্রোটিন! প্রোটিন' বলে বাজার মাতালেও, অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন। তাই পুষ্টিতত্ত্বের সাম্প্রতিক বিচারে সোয়াবিন আর ছোলার ডাল এবং তৎজাত খাদ্য অত্যধিক খাওয়া নিষিদ্ধ।

অড়হর ডালে গন্ধক থাকার দরুণ হজম করা কিছু কঠিন।

মটর ডাল অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে নানা ধরনের বাত, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি সৃষ্টি করে। তাই মাঝে মধ্যে মটর ডাল খাওয়া চললেও বেশি খাওয়া ঠিক নয়।

খেসারি-র ডাল বেশী খেলে একরকম রোগ দেখা যায় যার ফলে দেহের নিম্নভাগ অবশ হয়ে পড়ে।

উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হলেও কোনো একরকম ডালেই সব অ্যামাইনো অ্যাসিড নেই। তাই প্রতিদিন একরকম ডাল না খেয়ে এক-এক দিন এক-এক রকম ডাল কিংবা একই দিনে ২-৩ রকম ডাল মিশিয়ে খাওয়া উচিত।

* বিভিন্ন প্রকার ডালের পুষ্টি-উপাদান (পৃষ্ঠা—১১৩) দ্রষ্টব্য

চাল, গম, সুজি প্রভৃতির পুষ্টি-উপাদান
(প্রতি ০০ গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	বি-১	বি-২	নিয়াসিন
	(গ্রাম হিসাবে)				(মিঃ গ্রাঃ হিসাবে)					
* চাল (কলে ছাঁটা)	৩৪৫	৬'৪	০'৪	৭৯'০	২৪	১৩৬	০'৮	'২১	'০৯	৩'৮
গমের আটা	৩৪১	১২'১	১'৭	৬৯'৪	৪১	৩৭২	৩'৩	'৫৫	'১২	'৩
সুজি	৩৪৮	১০'৪	০'৬	৭৪'৮	১৬	১০২	১'৬	'১২	'৮০	০'৩
চিড়া	৩৪৬	৬'৬	১'২	৭৩'৩	২০	২২৩	৫'৫	'১২	'০৫	৪'০
মুড়ি	৩২৫	৭'৫	০'১	৭৩'৬	২৩	১৫০	৬'৬	'২১	১২	৪'১
খৈ	৩৬৩	৭'২	০'৪	৮২'৬	৯	৯২	০'৯	'০৫	'০৩	১'৪
পাঁউরুটি	২৪৭	৭.৮	০'৭	৫২'৫						

- এই গ্রন্থের সমস্ত পুষ্টি উপাদান তালিকা Food Value Chart : Indian Council of Medical Research-থেকে সংগৃহীত।
- আতপ চালের থেকে সিদ্ধ চালের পুষ্টিকারিতা বেশি। বিশেষ করে সিদ্ধ চালের ভিটামিন বি-১ এবং বিভিন্ন ধাতব লবণ বেশি থাকে।

কয়েক প্রকার ডালের পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে)

ডালের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি গ্রা. হিসাবে)			I. U	(মি. গ্রা. হিসাবে)			
মুগ	৩৫৮	২৪.৫	১.২	৫৯.৯	৭৫	৪০৫	৮.৫		০.৪৬			
মসুর	৩১৬	২৫.১	০.৭	৫৯.৯	৬৯	২৪২	৪.৮	৪৫০	০.৪৫	০.৪৯	১.৫	
মাস কলাই	৩২৬	২৪.০	১.৪	৫৯.৬	১৫৪	৩৮৫	৯.১	৬৪	০.৪২	০.৩৭	২.০	
ছোলার ডাল	৩৮৫	২০.৮	৫.৬	৫৯.৮	৫৬	৩৩১	৯.১	২১৬	০.৪৮	০.১৮	২.৪	১
সোয়াবিন	৩৫০	৩৪.৯	১৮.১	১২.০	১২০	৬৩১	৬.৯	৭১০	০.৭০	০.৭০	২.৪	
অড়হর		২২.৩	১.৭	৫৭.৬	৭৩	৩০৪	৫.৮	২২০	০.৪৫	০.৫১	২.৬	
মটর ডাল	৩৫৪	২৪.৫	১.১	৭১.৩	৭০	৩০৩	৪.৭	১৫৮	০.৪৭	০.৫৯	২.১	১
খেসারি	৩২৭	২২.৯	০.৭	৫৫.৭	৯০	৩১৭	৬.৩					
ছোলা (গোটা)	৩২৩	১৭.১	৫.১	৬০.৯	১৯০	১৮৪	৯.৮	৩১৬	০.৩	০.৫	২.১	

শাক ও সব্জি

শাস্ত্রে আছে, যদি শাক-সব্জি খেয়েই দেহধারণ সম্ভব হয় তবে পশুপক্ষী বিনাশের প্রয়োজন কি ?

বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে সামনে রেখে আজ পুষ্টিবিদ্‌রা সেই অতীতের কথাটাই আমাদের নতুন করে বলতে চাইছেন।

দরিদ্র ভারতবাসী চিরকালই শাক্ সবজি খেয়ে থাকত। শাকে আছে বিবিধ ভিটামিন যা দেহকে নানা রোগ থেকে রক্ষা করে। এজন্যে শাক-কে বলা হয় প্রতিষেধক বা protective খাদ্য। গবেষকরা দেখেছেন, শাক ও সবজি শুধু যে অন্যান্য পুষ্টি-পদার্থের চেয়ে পরিপাক ও দহনে বেশি সহায়তা করে তাই নয়, দেহে রক্তের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

শাক-সবজি নিয়েও হয়তো আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে, তাই এ-সম্বন্ধে যেসব তথ্য মনে রাখা দরকার সেগুলি হল :

□ শাক ও সব্জি কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। এজন্যে প্রতিদিনই কিছু শাক-সব্জি স্যালাড হিসেবে কাঁচা খাওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত স্যালাডের সাথে বা যে কোনো ভাবে প্রচুর পেঁয়াজ খাওয়া খুব উপকারী। অন্যান্য উপকার ছাড়াও পেঁয়াজ রক্তের জমাট বাঁধাকে প্রতিহত করে। ফলে রক্তপ্রবাহ তার সাবলীলতা বাজায় রাখতে পারে। পেঁয়াজের এই গুণটি রসুনেও বর্তমান। রসুন একটি উল্লেখযোগ্য অ্যানটিসেপটিক। উপরন্তু রসুনে আছে ডায়াবেটিস রোগীর অত্যধিক ব্লাড-সুগার, হৃদরোগীর কোলেসটেরল এবং স্থূলদেহীর মেদ কমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। এইজন্য প্রতিদিন অন্তত একটি কোয়া রসুন খাওয়া দরকার।

● সবজির মধ্যে রাঙা আলুর পুষ্টি উপাদান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তবে রাঙা আলুর রঙ বেশি উজ্জ্বল হলে বুঝবেন সেটা তার স্বাভাবিক রঙ নয়। আসল রঙ ফ্যাকাসে মেটে মেটে। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহু সময় রোডামিন-বি রং মাখান হয়। এই রঙ বিষধর্মী ও ক্ষতিকারক! রঙ ঝলমলে রাঙা আলু যদি কিনতেই হয় তাকে ভালো করে ধুয়ে কিংবা অগত্যা খোসা ছাড়িয়ে নিতে ভুলবেন না।*

রাঙা আলুর কথায় কথায় আলুর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আজকাল 'ওল খেওনা—ধরবে গলা'-র মতো 'আলু খাওয়া—মোটা হওয়া'—এই ব্যাপারটিও প্রবাদের মতন হয়ে গেছে। কিন্তু আলু খেলে মোটা হয় এটা একটা রীতিমতো ভুল ধরণা। প্রকৃতপক্ষে নানাভাবে সরাসরি আলু খেলে মেদ জন্মাবার কোনো কারণ নেই। আসলে আলু খেতে গিয়ে তার সাথে তেল, ঘি, প্রভৃতি যে সমস্ত ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ যোগ করি সেই সব স্নেহ-ই মেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তেল-ঘি প্রভৃতি বাদ দিলে সে ভয় আর থাকে না। বস্তুত, আলু এমনই একটি চমৎকার সুষম খাদ্য যার মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি উপাদান। আর তেল-ঘি ছাড়া আলু খাওয়ার ব্যাপারেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এই গ্রন্থেই 'প্রিটিকিনী রান্না' পর্যায়ে পেয়ে যাচ্ছেন ৫ রকমের আলু-লালিত রেসিপি।

□ সিম, কড়াইশুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা / মুগ প্রভৃতিতে থাকে 'ল্যাকটিন' নামে একটি উদ্ভিজ প্রোটিন। **Dr. L. Watenberg** অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে এই ল্যাকটিন প্রাণীদের ক্যানসারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

---

*পটল, ঝিঙে, বরবটি, উচ্ছে, বিন, করলা প্রভৃতি সব্জিরও টকটকে সবুজ রঙে ভুলবেন না। এখানেও ক্ষতিকর কৃত্রিম রঙের খেলা। এজন্য সবজির বোঁটার দিকে নজর করুন। রাঙানো না হলে বোঁটা হবে ধূসর বর্ণের।

● কাঁচ কলায় লোহার পরিমাণ উপেক্ষণীয়। প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচকলায় আছে মাত্র ০·৬ মি.গ্রা লোহা যেখানে সমপরিমাণ উচ্ছেতে লোহা আছে ৯·৪, বিনে ২·৬, নটে শাকে ২৫·৫, এবং পালং শাকে ১৯·৫ মি গ্রা.।

□ পালং শাক, সজনে শাক, নটে শাক, কুমড়া শাক এবং সবজির মধ্যে বিট, ঢেঁড়স, ডুমুর, বিন, মূলা প্রভৃতিতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

● ডাঁটা শাক, পুঁইশাক, পলতা পাতা, কুমড়া শাক ও সজনে ডাঁটায় ফসফরাস আছে প্রচুর। সবজির মধ্যে ফসফরাসের আধিক্য বিন, আলু, কচু এবং কাঁঠালবিচিতে।

□ যেসব শাক-সব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে বহু ভিটামিন আছে :

ভিটামিন-এ (দেহবৃদ্ধিকারক ও চক্ষুরোগ-প্রতিষেধক)	পালং, নটে, কলমি, এবং গাজর, বাঁধাকপি, ডুমুর, উচ্ছে।
ভিটামিন-বি-১ (বেরিবেরি ও অন্যান্য স্নায়ুরোগ-প্রতিষেধক)	ছোলা, মটর, পলতা, বিন, কাঁঠাল-বিচি, লাউ।
ভিটামিন বি-২ (১) বা রিবোফ্লাবিন (দেহবৃদ্ধিকারক)	পলতা, ডাঁটা, কলমি, পালং এবং আলু, কাঁচা লংকা, বিন, কাঁঠাল-বিচি।
ভিটামিন বি-২ (২) বা নিয়াসিন (পেলেগ্রা প্রতিষেধক)	নটে শাক এবং আলু, কাঁচালংকা, বেগুন, রাঙা আলু, গাজর, বিট।

ভিটামিন-বি 'সি' বা ফোলিক অ্যাসিড (রক্তাল্পতা প্রতিষেধক)	হিঞ্চে শাক, পালংশাক।
ভিটামিন-সি বা অ্যাসকর্‌বিক অ্যাসিড (রক্তাল্পতা ও স্কার্ভি-প্রতিষেধক)	সজনে শাক (leaves), কলমি শাক, সজনে ডাঁটা এবং ডুমুর, বাঁধাকপি, লাউ।
ভিটামিন-ই বা টকোফেরল (বন্ধ্যাত্ব-প্রতিষেধক)	লেটুশ শাক।
ভিটামিন-কে (রক্তভঞ্চন-প্রতিষেধক)	পালং শাক, বাঁধাকপি।

(প্রসঙ্গত অল্প পরিমাণে পালং শাক খুবই উপকারী, তাই বলে প্রতিদিন অতিরিক্ত পরিমাণে পালং শাক খাওয়া উচিত নয়। পালং-এ থাকে অক্সালেট যা মূত্রপাথরী সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যালসিয়াম গ্রহণে বাধা দিয়ে প্রশ্রয় দেয় অসটিওপোরোসিস রোগের প্রাদুর্ভাবকে)।

শাক ও সব্‌জি নিয়ে আমাদের প্রধান ভ্রান্তধারণাটি পুষ্টি-মূল্য সম্পর্কে। অনেক সময় আমরা স্বল্প পুষ্টি-মূল্যের শাক-সব্‌জি অত্যধিক মূল্যে কিনে বসি অথবা অগ্নিমূল্য হওয়ার জন্য না কিনে মন খারাপ করি। শাক-সব্‌জির প্রধান প্রধান পুষ্টি-উপাদান বিশেষ করে তাপমূল্য (ক্যালরি) জানা থাকলে এ ভুল আর হবে না। এইজন্য এখানে কয়েকটি শাক ও সব্‌জির পুষ্টি-উপাদান দেওয়া হল :

বিভিন্ন শাকের পুষ্টি-উপাদান

● প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে ●

(ক্যালরির ক্রমানুসারে)

শাকের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেড	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি. গ্রা. হিসাবে)			I. U	(মিঃ গ্রাঃ হিসাবে)			
নটে শাক	৪৬	৪.০	০.৫	৬.৩	৩৯৭	৮৩	২৫.৫	৯২০০	০.০৩	০.১০	১.২	৯৯
পেঁয়াজকলি	৪১	০.৯	০.২	৮.৯	৫০	৫০	.৫	৯৯৩		.০৩	০.৩	১৭
পালং শাক	৩৪	৫.১	০.৯	৭.৭	৫৯৫	৯৩	১৯.৫	৯৫০০	০.০৩	০.০৭	০.৫	২৮
ডাঁটা শাক	৩৪	১.৬	০.৫	৫.৬	৫৮	৭০৩	৮.৩	৪২৫	০.০১	০.১৮		১০
কলমি শাক	২৮	১.৭	০.৪	৪.৩	১১০	৫০	৩.৯	৩৩০০	০.০৫	০.১২	০.৬	১৩৭
সজ্‌নে শাক	২৬	২.৫	০.১	৩.৭	৩০	১১০	৫.৩	১৮৪	০.০৫	০.০৭	০.২	১২০
কচুশাক	২১	০.৭	০.৩	৪.২	৫৯	২০	০.৫	৬০০		০.১		

বিভিন্ন সব্জির পুষ্টি উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে □ ক্যালরি ক্রমানুসারে)

সব্জির নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি. গ্রা. হিসাবে)			I. U	(মি. গ্রা. হিসাবে)			
কাঁঠাল বিচি	১৮৪	৬'৬	০'৪	৩৮'৪	৫০	১৩০	১'২	১৭	০'২	০'১১	০'৩	১১
বিন	১৫৮	৭'৪	১'০	২'৯৮	৫০	১৭০	২'৬	৫৭	০'৩৪	০'১৯		২৭
রাঙা আলু	১২৫		০'৭	২০'৯	৩০	৪৯	০'৭	১০	০'০৮	০'০৪	০'৭	২৪
কড়াইশুঁটি	১১২	৭'২		১৯'৮	৩৮	১০৪	১'৪	৮'৪				
ওল	১১০	২'৪	০'১	২৪	৬০	২০	১'৩	১৩০	০'০৭		০'৭	
আলু	৮৩	২'০	০'১	১৯'১	১১	৫৬	০'৭	৪০	০'১১	০'০১	১'২	১৭
কাঁচকলা	৬৩	১'৪	০'২	১৪'৭	১০	৩০	০'৬	৫০	০'০৫	০'০২	০'৩	২৪
সিম	৬২	২'৫	০'৩	৫'১	২১	৪৯	০'৬			+		+
উচ্ছে	৬০	২'৯	১'০	৯৮	৫০	১৪০	৯'৪	২১০	০'০৭	০'৯	০'৫	২৭
গাজর	৪৮	১'২	০'৩	১০'৭	৩৯	৩৭	০'৮	৩১৫০	০'০৪			
ফুলকপি	৪৩	৩'৫	+	৫'৩	৩৩	৫৭	১'৫	৫১	০'০৪	০'১	১'০	৫৬
বিট	৪৬	১'৪	+	৭'৬	২০০	৫৫	১'০		০'০৪	০'০২	০'৬	৮৮
ডুমুর	৩৭	১'৩	০'২	৭'৬	৬০	৩০	১'২	২৭০	০'০৬	০'০৫	০'৪	১৮০
ঢেঁড়স	৩৫	১'৯	+	৬'৪	৬৬	৫৭	১'৫	৫১	০'০৪	০'১	১'০	৫৬

সব্‌জির নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি. গ্রা. হিসাবে)			I. U	(মি. গ্রা. হিসাবে)			
শালগম	৩৫	১.১	+	৭.৬	৩০	৮০	০.৪		০.০৪	০.০৪	০.৫	৪১
মোচা	৩৪	১.৭	০.৭	৫.১	৩২	৪২	১.৬	৪৬	০.০৫	০.০২	০.৪	১৬
ওলকপি	৩০	১.১	০.১	৫.৯	২০	৪০	০.৪	+		+		+
বাঁধাকপি	৩০	১.১	০.১	৫.৯	৩৯	৪৪	০.৮	২০০০	০.০৬	০.০৩	০.৪	১২৪
কাঁচালংকা	২৯	২.৯	০.৬	৩.০	৩০	৮০	১.২	২৯২	০.১৯	০.৩৯	০.৯	১১১
কাঁচা পেঁপে	২৯	০.৫	০.৩	৬.২	৩৪	৬৪	০.৯		০.১	০.০১	০.১	১২
বরবটি	২৭	১.৭		৪.৭								
বেগুন	২৪	০.৩	০.৩	৪.০	১৮	৪০	০.৯	১২৪	০.০৪	০.১১	০.৯	১২
কুমড়ো	২৫	১.৪	০.১	৪.৬	১০	১৯	০.৩	৮৪	০.০৬	০.০৪	০.৫	২
মুলা	২২	০.৬	+	৪.২	৩০	২০	০.৫	৫	০.০৬	০.০২	০.২	১৬
পটল	২০	২	৩.৬	২.২	৩০	৪০	১.৭	২৫৫	০.০৫	০.০৬	০.৫	২৯
ঝিঙে	১৭	০.৫	০.১	৩.৪	৪০	৪০	১.৬	৫৬	০.০৭	০.০১	০.২	৫
লাউ	১২	০.২	০.১	২.৫	২০	১০	০.৭		০.০৩	০.০১	০.৪	৬
চাল কুমড়ো	৯	০.৪		১.৭	৩০	২০	০.৮		০.০৬	০.০১	০.৪	১

ফলে সুফলের শেষ নেই

সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘজীবনের আশায় অনেকে নিরামিষ খান। অনেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রধানত ফল খেয়েই জীবন ধারণ করেন। এঁরা বলেন, প্রকৃতির দুলাল মানুষের পক্ষে প্রকৃতির দেওয়া ফল-ই সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

—কথাটা কিন্তু অনেক কারণেই যুক্তিযুক্ত। ফলাহারের উপকারিতা অনেক—

● ফল খেয়ে পুষ্টি ও শক্তি দুই-ই পাওয়া যায়।

□ ফল হজম হয় সহজে আর সেজন্য দরকার হয় অনেক কম তাপশক্তি বা ক্যালরির। ফলহারীদের স্থূলদেহী হওয়ার সম্ভাবনা তাই কোনদিনই থাকে না।

● তুলনামূলকভাবে কিছু কম হলেও ফলাহারে পাওয়া যায় যথা-প্রয়োজন প্রোটিন এবং ফ্যাট আর উপজাত হিসাবে জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড—যেগুলি পুরোপুরি non toxic। ফলাহারীর শরীর তাই টক্সিন-মুক্ত থাকে।

□ ফলের খোসা বা ছিব্‌ড়ায় শুধু যে কোষ্ঠ বদ্ধতা দূর হয় তাই নয়। এতে থাকে ভিটামিন-পি বা 'রুটিন' নামক পদার্থ যা করোনারী থ্রমবোসিসের প্রধান কারণ রক্তের জমাট-বাঁধাকে প্রাথমিক ভাবে নিরাময় করতে পারে।

● ফলাহারে রক্ত দূষণ-মুক্ত থাকে বলে রক্ত-ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না, তাই রক্তপ্রবাহটি থাকে সাবলীল।

□ ঈশ্বরের পৃথিবীতে ফল-ই একমাত্র খাদ্যবস্তু যা খেয়ে মানুষ জল ছাড়াও জীবন ধারণ করতে পারে।

—এজন্যেই ভাবতে ইচ্ছে করে যে ফল যথার্থই মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য। অবশ্য এ-ভাবনার সপক্ষেও অনেক যুক্তি আছে।

যদিও অন্যান্য অনেক প্রাণীর মতোই মানুষ নানারকম খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু মানবদেহে গঠনগত (anatomical), শারীরবৃত্তীয় (physiological) এবং জৈবনিক (biological) কমপক্ষে এমন ৪০টি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি বলে দিচ্ছে যে মানুষের দেহটি ফলহারের জন্যই তৈরি। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরে মানুষের চোয়াল এবং দাঁতের গড়ন, অন্ত্রের, দৈর্ঘ্য প্যানক্রিয়াসের আকার, লালা নিঃসরণ, শরীরে ভিটামিন-সি তৈরির অক্ষমতা প্রভৃতি।

মহাত্মা গান্ধী ৩২ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত ক্ষীণস্বাস্থ্য ছিলেন। তারপর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী হয়ে ধীরে ধীরে পুরোপুরি ফলাহারী হলেন। এই ফলাহার প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলছেন ঃ

'আমি বিগত ছয়মাস যাবৎ কেবল ফল খাইয়াই জীবনধারণ করিতেছি। ...এতদিনের খাদ্যাভ্যাস হঠাৎ পরিবর্তন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সুফল আশা করা যায় না। তবে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে অপরের ন্যায় আমি কোনও রোগ ভোগ করি নাই এবং ফলাহারে আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমধিক বর্ধিতই হইয়াছে। আমি অবশ্য গুরুভার-সম্পন্ন কোনও দ্রব্য তুলিতে পারি না, তবে ক্লান্তি বোধ না করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারি, একথা বলিবই। মানসিক পরিশ্রমের শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে মানসিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। ...এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ফলাহারই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আহার।'

ফলাহারের সুফল সম্পর্কে আর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যামপিয়ান ওয়েট লিফ্‌টার Wiley Brooks। ৬ ফুট লম্বা Brooks-এর বয়স যখন ৪৪, ওজন ৬৮ কে. জি. তখনও

তিনি অনায়াসে লিফ্‌ট করে নিতেন ৪২৫ কে. জি.! অথচ এই Brooks-এর একমাত্র খাদ্য ছিল শুধু ফল আর ফলের রস!

Dr. Lacy Evans তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই উৎসর্গ করেছেন জরা এবং বার্ধক্য নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানে।

তিনি বলছেন, 'আজ দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষ যে-স্বাস্থ্য উপভোগ করছে, 'পুরোপুরি ফল খেয়ে' একজন মানুষ তার চেয়ে অনেক ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। ফলাহারে শরীরের পুষ্টি যথেষ্ট হয়, বার্ধক্যের কারণগুলিও বহুলাংশেই অপসারিত হয়। আর আয়ুষ্কাল, প্রচলিত 'Three score and ten' অর্থাৎ ৭০ বছরের চেয়েও ঢের বেশি বেড়ে যায়।"

ফলাহারের উপকার সম্বন্ধে উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে প্রতিদিনই সাধ্যমত কিছু ফল খাওয়া অত্যন্ত দরকার। তবে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে 'পুরোপুরি ফল খেয়ে' থাকা নানা কারণেই অসুবিধাজনক। তাছাড়া—

□ অতি বাণিজ্যিক কারণে আজকাল ফলের গায়ে অনেক বিষাক্ত কীটনাশক পদার্থ ছড়ানো হয় তাই ফল ভালো করে ধুয়ে বা সম্ভব হলে খাওয়ার আগে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ভিজিয়ে বীজাণুমুক্ত না করে খাওয়া বিপদজনক।

● মিষ্টি ফল, 'ফ্রুট জুস্' হিসেবে খেলে 'ফ্রুট জুস্'-এ উপস্থিত অতিরিক্ত শর্করা, রক্ত-ফ্যাট মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

● অতিরিক্ত সুগার-সম্পন্ন অত্যধিক পাকা বা শুকনো ফল (over-ripe or dry fruits) বেশি খেলে, বিশেষ করে যাঁরা হৃদরোগী বা যাঁরা ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি রোগে ভুগেছেন তাঁদের ক্ষতি হয়।

—কিন্তু মানুষের এমনই অভ্যাস যে সে দিনে তিনবার প্রধান আহার্যের মত তিনবার একসঙ্গে অনেক ফল খায় না। তার ফল খাওয়ার রীতিই হচ্ছে সারাদিনে কয়েকবার কিছু ফল খাওয়া।

এবং ফল খাওয়ার এ-রীতিতে ব্লাড-সুগার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

প্রসঙ্গত, ফল সম্বন্ধে আমাদের একটা পুরনো ধারণা আছে যে, সকালে ফল বেশি পুষ্টিকর কিন্তু রাতে ফল খাওয়ার তেমন কোন উপকারিতা নেই। এটা পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণা। ফলের যা গুণ আছে সেটা যে সময়েই খান না কেন একই থাকে, কোন পরিবর্তন তো হয়ই না বরঞ্চ রাতের দিকে ফল খাওয়া ভালোই।

সবশেষে বলি, সব্জির মতো ফলের ব্যাপারেও আমরা অনেক সময় ক্রয়-মূল্য আর পুষ্টি-মূল্যকে একাকার করে ফেলি। এজন্যে যথার্থ পুষ্টি-মূল্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলে ফলের যথার্থ মূল্য ছাড়াও আমরা জানতে পারবো বহু বিস্ময়কর তথ্য। যেমন—

● আতা-য় ক্যালসিয়াম আছে—আপেলের প্রায় ৪৪ গুণ, আঙুর/আনারসের প্রায় ২০ গুণ, মুসাম্বির ১০ গুণ, এবং কিসমিসের প্রায় ৪ গুণ।

□ আম, কমলালেবু, পাকা পেঁপেতে ভিটামিন-এ রয়েছে প্রচুর। টমেটো, কুল এবং ফুটিতেও যথেষ্ট আছে। কিন্তু আপেল, আঙুর, মুসাম্বি, ন্যাসপাতি ডালিম, কিসমিস প্রভৃতিতে এ-ভিটামিনের পরিমাণ অতি সামান্য।

● ভিটামিন বি-১ আতায় আছে যথেষ্ট, তারপর আছে বেল, কমলালেবু আর টমেটো-তে। কিন্তু খেজুর, আনারস, ন্যাসপাতি, মুসাম্বিতে আছে অতি নগণ্য পরিমাণে!

□ পেয়ারায় ভিটামিন-সি আছে—আপেলের ১০৬ গুণ, কিসমিসের ৭১ গুণ, আঙুরের প্রায় ৭ গুণ, আনারসের প্রায় ৫ গুণ!

(বিভিন্ন ফলের পুষ্টি-উপাদান দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন ফলের পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের □ উপস্থিত ভিটামিন সি'র ক্রমানুসারে)

ফলের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি, গ্রা,)			I. U	(মি. গ্রা. হিসাবে)			
পেয়ারা	৫১	০'০৯	০'৩৩	১১'২	১০	২৮	১'৪		০'০৩	০'০৩	০'০৪	২১২
আম (লাঙড়া)	৮২	০'৮	০'৮	১৭'৮	১০	২০	০'৯	১০৩৫			১'৫	৮৩
কমলালেবু (নাগপুর)	৪০	০'৬	০'২	৮৯	৫০	২০	০'১	১৮০০	০'১২	০'০৬	০'৩	৮৫
লেবু (কাগজি/পাতি)	৫৭	১'০	০'৯	১১'১	৯০	২০	০'২		০'০২	০'০২	০'১	৬৩
পাকা পেঁপে	৩২	০'৬	০'১	৭'২	১৭	১৩	০'৫	১১১০	০'০৪	০'২৫	০'২	৫৭
মুসাম্বি	৩৫	০'৭	০'৩	৭'৩	৪০	২০	০'৩					৫০
টঁ্যাপারি	৫৩	১'৮	০'২	১১'১	১০	৬৭	২'০	২৩৮০	০'০৫	০'০২	০'৩	৪৯
আনারস	৪৬	০'৪	০'১	১০'৮	২০	৯	১'২	৩০	০'২	০'১২	০'১	৩৯
আম (আলফানসো)	৭৫	০'৪	০ ৯	১৬'২	৪২	১৬	১'৬	১১৪২০	০'০৭	০'১০	০'৬	৩৭

ফলের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি. গ্রা. হিসাবে)			I. U	(মি. গ্রা. হিসাবে)			
আঙুর	৭১	০·৫	০·৩	১৬·৫	২০	৩০	১·৫		০·১২	০·০২	০·৩	৩১
লিচু	৬১	১·১	০·২	১৩·৬	১০	৩৫	০·৭		০·০২	০·০৬	০·৪	৩১
টমেটো (পাকা)	২০	০·৯	০·৬	৫·৮	৪৮	২০	০·৪	৫৮৫	০·১২	০·০৬	০·৪	২৭
আতা	১১	১·৬	০.৩	২৬·২	৩৯৮	৪০	০·৩		০·৩৩	০ ৪৪	১·৩	২৬
বাতাবি	৪৪	০·৬	০·১	১০·২	৩০	৩০	০·৩	২০০	০·০৩	০·০৩	০·২	২০
কালোজাম	৬২	০·৭	০·৩	১৪·০	১৫	১৫	১·০	৮০		০·১	০·২	১৮
ডালিম	৬৫	১·৬	০·১	১৪·৫	১০	৭০	০·৩		০·০৬	০ ১	০·৩	১৩
ফুটি	২৫	০·৬	০·২	৫·৪	১৫	১০	১·০	২৬৫			০·১	১০
বেল	১৩৬	১·৮	০·৩	০১·৮	৮৫	৫০	০·৬	৯৩	০·১৩	১·১৯	১·১৪	৮
কলা	৯৮	০·৮	০·৫	২২·৫	১০	৩০	০·৫	৮০	০·৩০	০· ০	০·৬	৮
নারকেল	৬৬২	৬·৮	৬২·৩	১৮·৪	৪০০	২১০	২·৭		০·০৮	০·০৬	০·৬	৭
কাঁঠাল	৮৮	১·৯	০·১	১৯·৮	২০	৪১	০·৫	২৯২	০·০৩	০·১৩	০·৪	৭
শশা	১৩	০·৪	০·১	২·৫	১০	২৫	১·৫		০·০৩	০·০১	০·২	৭
সফেদা	৯৪	০·৫	১·২	২২·৩	১০	২০	০·৩		০·০১		০·১	৬

ফলের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	কারবোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	এ	বি-১	বি-২	নিয়াসিন	সি
		(গ্রাম হিসাবে)			(মি, গ্রা হিসাবে)			I, U	(মি, গ্রা হিসাবে)			
কিসমিস	৩০১	১·৮	০·৫	৭২·২	১০০	৮০	৭·১		০·১২	০·২৩	০·৫	৩
খেজুর	১৪৪	০·২	০·৪	৩৩·৮	১২০	৫০	৭·৩	৪৪	০·০১	০·০২	০·৯	৩
জামরুল	৪৩	০·৭	০·২	৯·৭	১০	৩০	০·৫	২৩৪	০·০১	০·০৫	০·৪	৩
আপেল	৫৫	০·৩	০·১	১৩·৩	৯	২০	১·০		০·১২	০·০৩	০·২	২
কচি ডাবের জল	২২	০·১	০·১	৫·০	২০	১০	০·১		+	+	০·১	২
তরমুজ	১৬	০·২	০·২	৩·৩	১১	১২	৭·৯		০·০২	০·০৪	০·১	১
আখ	৮৩	০·১	০·১	২০·৫	১০	২০	০·৩					
আখের রস	৩৯	০·১	০·২	৯·১	১০	১০	১·১	১০		০·০৪	০·৬	
ন্যাসপাতি (দেশী)	৫৮	০·৩	০·৩	১৩·৪	২০	২০	৩·৬	১৪	০·০২	০·৩	০·২	

ফাইবার ঃ ফেলে দিই তবু ফেলনা নয়

শস্যদানা, শাক, সব্‌জি এবং ফলের যে অংশকে আমরা তুষ, ভুষি, খোসা, ছিবড়ে ইত্যাদি বলি সেটাই হচ্ছে খাদ্য-ফাইবার (fibre, roughage / cellulose / bran) ।

পুষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে, আমাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিক থেকে এই ফাইবারের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু মুশকিল হল, সভ্যতা যত এগোচ্ছে ততই আমরা খাদ্যের ফাইবার বর্জন করে চলেছি।

প্রায় এক শতাব্দী আগে জনৈক প্রতিভাধর ময়দার ব্যবহার উদ্ভাবন করেছিলেন। এই ময়দা আমদানির ফলে যখন ঘরে এল পুরি, পরোটা, পাঁউরুটি, পেস্ট্রি তখন ফাইবার খাওয়ার সুযোগ গেল কমে, আর সেই সুযোগে মনুষ্য সমাজে হাজির হল হাজার রোগ।

পুরি-পেস্ট্রীর কথা বাদ দিয়ে ভাত-রুটির কথা ভাবুন। সেখানেও আমরা ফাইবার বর্জনে প্রমত্ত।

সাদা ধবধবে চালের উপর আমাদের সকলেরই দুর্বলতা। কিন্তু ঐ ধরনের চালে খাদ্য-ফাইবার প্রায় থাকেই না, আর ভিটামিনের অংশও বেশ কম থাকে। অথচ অল্প-ছাঁটা বা লাল রঙের চালে বাইরের তুষ বা bran অংশটিতে থাকে—

● ভিটামিন-বি-১ (থিয়ামিন)—যার অভাবে অবসাদ, ক্ষুধা-মান্দ্য, এমন কি বেরিবেরি ও অন্যান্য স্নায়ুরোগ হয়,

□ ভিটামিন-বি-২ (নিয়াসিন)—যার অভাবে হয় জিভে ও মুখে ঘা, চর্মরোগ আর গুরুতর অভাবে পেলেগ্রা রোগ,

● ভিটামিন-বি-৩—যার অভাব সৃষ্টি করে অন্ত্রের ক্ষত, স্নায়ুর বিকৃতি, কিডনি ও পুংগ্রন্থির ক্রিয়া বৈকল্য প্রভৃতি,

● ভিটামিন-বি-৬—যার অভাবে দেখা যায় স্নায়ুদৌর্বল্য, নিদ্রাহীনতা, বদমেজাজ, পেটেব্যথা প্রভৃতি, সর্বোপরি

● ভিটামিন-কে—যার অভাবে রক্তপড়া বন্ধ হতে বেশি সময় লাগে।

ভিটামিন-বি—১ অর্থাৎ থিয়ামিনে ভরা গমের ভুষির বেলাতেও আটা চেলে রুটি বানিয়ে একই ভুল আমরা করে থাকি।

শুধু চাল-গমের ক্ষেত্রে কেন, খাদ্য-ফাইবার বজায় রেখে (স্যালাড হিসেবে) প্রতিদিনই কিছু কাঁচা শাক-সব্‌জি খাওয়া এখনও আমাদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নয়। তাছাড়া রান্নার আগে তরি-তরকারির খোসা যথাসম্ভব ফেলে দিতেই আমরা বেশি আগ্রহী।

ফলের ক্ষেত্রেও আছে খোসা ও ছিবড়ে বাদ দিয়ে ফাইবার গ্রহণের সুযোগ থেকে নিজেদের সস্নেহে বঞ্চনা। অথচ পেয়ারা, কমলা-কোয়া, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফলের খোসা না ফেলে অনায়াসে খাওয়া যায়।

এই ফাইবার বর্জনের পরিপ্রেক্ষিত আমাদের নতুন করে জানা দরকার যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ফাইবারের গুরুত্ব বড়ো কম নয়ঃ

● খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত ফাইবার নিজের আয়তনের ৮গুণ জলীয় অংশ স্পঞ্জের মতো শুষে নেয়। ফলে মলের আয়তন বেড়ে মলত্যাগের ব্যাপারটা সহজ হয়, আর খাদ্যগ্রহণ ও মলত্যাগের মধ্যবর্তী সময় কম-বেশি ৭২ ঘণ্টা থেকে কমে ২৪ ঘণ্টায় নেমে আসে। এই-ভাবে সহজে মল নির্গত হলে অর্শ এবং ডাইভারটিকুলাইটিস রোগের কোনো আশঙ্কা থাকে না। তাছাড়া কারসিনোজেন এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থও অন্ত্রের দেওয়াল আক্রমণ করতে পারে না।

□ খাদ্য ফাইবার প্রায় ৩০%-এরও বেশি পিত্তরস শোষণ করে তা মলের সঙ্গে বের করে দেয়। পিত্তরসের প্রায় ৬৭ শতাংশই হল কোলেসটেরল। ফলে ফাইবার-যুক্ত খাদ্য খেলে অতিরিক্ত কোলেসটেরল-মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই নেমে যেতে পারে। কিছু সংখ্যক গবেষক দাবী করেন যে উচ্চমাত্রায় ফাইবার-সম্পন্ন খাদ্য খেলে রক্তের মাত্রাধিক কোলেসটেরল কমে যায় ২২—২৫%।

● **Dr.D. Burkitt** এবং **H. Trowel** আফ্রিকার গ্রামবাসীদের খাদ্য সম্পর্কে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে অতিরিক্ত ফাইবার-যুক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলেই গ্রামবাসীদের মধ্যে পাকস্থলী এবং মলদ্বারের ক্যানসার, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা, আপেনডিসাইটিস, হায়টাস হার্নিয়া, ডাইভারটিকুলাইটিস প্রভৃতি রোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এজন্যেই কিছুটা শাক-সব্জি কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় আর সব্জির খোসা যথাসম্ভব না ফেলেই গ্রহণ করা শ্রেয়। তবে আলুর খোসা বাদ দেওয়া দরকার কেননা আলুর খোসায় আছে সোলানিন (Solanin) নামক একটি বিষধর্মী অ্যালকালয়েড। প্রসঙ্গত, সবুজ রঙ-ধরা আলুতে সোলানিন থাকে সবচেয়ে বেশী।

● **Dr. J. Anderson** পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে ফাইবার-সম্পন্নখাদ্য অতিরিক্ত ব্লাড-সুগারও কমিয়ে আনে। যে সব ডায়াবেটিক রোগীর দিনে ৩৫-৪৫ ইউনিট ইনসুলিন দরকার হয়, ফাইবার-যুক্ত খাদ্য তাদের ইনসুলিন-চাহিদা ৫০% থেকে ৬৭% পর্যন্ত কমিয়ে আনতে পারে।

● ফাইবার-প্রধান খাদ্যে দেহের বাড়তি মেদ বা ওজন কমানোও সম্ভব। প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট খাদ্যে ফাইবার থাকে প্রচুর কিন্তু ঐ খাদ্য পেটভরে খেলেও বেশি ক্যালরি নেওয়া হয় না। অথচ চিনি, মিছরি ময়দা, পাঁউরুটি, বিয়ার, অ্যালকোহল বা অন্য বিকৃত কারবোহাইড্রেট খাদ্যে, ফাইবার তো থাকেই না আর সেগুলি অল্প খেলেই প্রচুর ক্যালরি নেওয়া হয়ে যায়, অথচ ক্ষিদেও তেমন মেটে না। উদাহরণস্বরূপ ৬০ গ্রামের একটা চকোলেটে যা ক্যালরি, তা পাওয়া যায় ৭০০ গ্রাম আপেল খেলে। এজন্যই মোটা মানুষের প্রথম করণীয় হচ্ছে ফাইবার-যুক্ত খাদ্য খেতে শুরু করা।

নির্গুণ কাঁচা নুন

শরীরের প্রয়োজনীয় নুন—শাক, সব্জি, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্য থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। রান্নায় বা পাতে আলাদা নুন খাওয়া এজন্যে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

তবু আমরা নুন খাই। কারণ দীর্ঘকাল ধরে রসনাকে এমন ভাবে অভ্যস্থ করেছি যে সেই অভ্যাসগত পরিমাণের কম-বেশি হলেই খাদ্য আমাদের কাছে বিস্বাদ লাগে। অনেকের রসনা আবার এমনভাবে তৈরি যে রান্নার নুন ছাড়াও তাঁরা পাতে কাঁচা নুন না খেয়ে পারেন না। বহুকাল ধরে অর্জিত এই অভ্যাস ছাড়াও নুন খাওয়া সম্বন্ধে কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে আছে ঃ

আমরা ভাবি, ঘাম হয়ে শরীরের যে জল বেরিয়ে যায় তা পূর্তির জন্য নুন খাওয়া দরকার। এই বিশ্বাসেই মনে করি খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, বাড়তি নুন খাওয়া আবশ্যক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে ঘামের মাধ্যমে শরীর বাড়তি নুনটাই বের করে দেয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে কী শীত কী গ্রীষ্ম—যে কোনো ঋতুতেই লম্বা দৌড় যাঁদের দৌড়তে হয় তাঁরা সবচেয়ে ভালো দৌড়াতে পারেন যদি নুন-মুক্ত খাদ্য খান।

সুখুমীর Instiute of Experimental Therapy and Pathology-র রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকরা নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, নুন সুনিশ্চিতভাবেই হৃদরোগ এবং অন্যান্য উপসর্গের সৃষ্টি করে।

পর্যবেক্ষণে জানা গেছে ৪০ বছর বয়েসের পর কাঁচা নুন খেলে হাই ব্লাডপ্রেশার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আসলে অতিরিক্ত নুন খেলে, শরীতে যে অনুপাতে জল আর নুন আছে সেই অনুপাত বিঘ্নিত হয়, তখন শরীরকে ঐ অতিরিক্ত নুন সামাল দেওয়ার জন্য ধরে রাখতে হয় বাড়তি জল। আর ঐ বাড়তি জলের ওজন সামলাতে হৃদযন্ত্রের পরিশ্রম হয় বেশী।

উত্তর জাপানের লোকেরা আমাদের চেয়ে ৩-৪ গুণ বেশি নুন খায় এবং ওদের শতকরা ৪০ জনই হাই ব্লাডপ্রেশারে ভোগে।

পক্ষান্তরে যে দেশের লোকেরা নুন কম খায় তাদের মধ্যে হাই ব্লাডপ্রেশারও খুব কম দেখা যায়। যেমন – গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো, চীন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এবং পানামার কুনা ইণ্ডিয়ানরা।

খাদ্যে বাড়তি নুন খাওয়ার ফলে পাকস্থলীর আস্তরণ (lining) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে কালক্রমে পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

নুন শরীরে শোথ (œdema) সৃষ্টি করে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি দেখা যায় মাংসপেশী বা গাঁটগুলো শক্ত (stiff) হয়ে আছে তাহলে বুঝতে হবে বাড়তি নুন খাওয়ার ফলেই শোথ দেখা দিয়েছে। শোথ শরীরের টিস্যুগুলিকে অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে। ফলে দেখা দেয় আরথ্রাইটিস, দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের ত্রুটি ইত্যাদি।

Dr Niel Laverson বলেন : মেয়েদের প্রায় শতকরা ৮০-৯০ জন নিয়মিতভাবে মাসিকের আগে আগে বদমেজাজ, বিষন্নতা প্রভৃতি নানা অকারণ টেনসনে ভোগেন। এঁরা কিন্তু নুন খাওয়া নির্মমভাবে কমিয়ে অনায়াসেই ঐ টেনসন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তবে অভ্যস্থ সুস্থদেহীর পক্ষে নুন একেবারেই ছেড়ে দেওয়া কষ্টকর বলে তাঁদের জন্যে পুষ্টিতত্ত্বের বিচারে সব মিলিয়ে জনপ্রতি রোজ ৩-৪ গ্রাম নুন খাওয়া অনুমোদিত। এজন্যে গৃহিনীর উচিৎ রান্নায় নুনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে ঐ অনুমোদিত মাত্রায় নিয়ে আসা।

□ তবে ডিজেনারেটিভ রোগে রীতিমতো আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে কিন্তু নুন অবশ্যই পরিহার্য।

ভিটামিন ও খনিজ লবণ

ভিটামিন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ অনেকেই বেশ সচেতন। আসলে অধিকাংশ প্রকৃতিজাত খাদ্যবস্তুকে আমরা নানাভাবে শোধিত বা process করে, তার সংরক্ষণের জন্য বীজাণু-নাশক রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে, খাদ্যগত স্বাভাবিক ভিটামিন-গুলিকে বহুলাংশে নষ্ট করে ফেলি। এজন্যেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক সময় ভিটামিন সাপ্লিমেণ্ট খাওয়ার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের চিন্তায় না গিয়ে শুধু স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ভেবে আজকাল অনেকেই সাপ্লিমেণ্ট হিসাবে ভিটামিন খান প্রায় মুড়ি-মুড়কির মতোন অবলীলাক্রমে। বিশেষ করে বি, সি এবং ই— এইসব ভিটামিনগুলি। কিন্তু দেহের ভিটামিন-চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা উচিত খাদ্যের মাধ্যমে, 'ভিটামিন সাপ্লিমেণ্ট' গ্রহণের মাধ্যমে নয়। কেননা এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি!

●

● কলে-ছাঁটা অতিরিক্ত শোধিত চাল বাদ দিয়ে কম-ছাঁটা চালের ভাত আর সেই সাথে তুষ-যুক্ত আটার রুটি পরিমাণ মতো খেলে যথাপ্রয়োজন ভিটামিন বি-র স্বাভাবিক সংস্থান হয়।

পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পরিমাণে 'বি'-কমপ্লেক্স' গোষ্ঠীভুক্ত ভিটামিন সাপ্লিমেণ্ট খেলে, বিশেষ করে ভিটামিন-বি-১ খেলে, দেখা দিতে পারে অ্যালার্জি রিঅ্যাকশন। আবার অত্যধিক ভিটামিন বি—২ বা নিয়াসিন খেলে শুরু হতে পারে মাথাধরা, বমনেচ্ছা, ইত্যাদি।

□ মানুষ নিজদেহে ভিটামিন 'সি' তৈরি করতে পারে না। তাই আলাদাভাবে এই ভিটামিন-সি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই জেনে অনেকে ভাবেন যে, শুধু খাদ্যের মাধ্যমেই নয় সাপ্লিমেণ্ট হিসাবেও

প্রচুর পরিমাণে বাড়তি ভিটামিন-সি খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভিটামিন-সি-র দৈনিক প্রয়োজন দিনে ৫০ মিলিগ্রাম, যা ১ টুকরো পেয়ারা কি ১টা লেবু কিংবা ২টি টমেটো অথবা ১টা বড় কমলালেবু থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত সিন্থেটিক ভিটামিন-সি খাওয়া আবার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক। কেননা এতে নষ্ট হয়ে যায় শরীরে অন্যান্য ভিটামিন এবং খনিজ লবণের ভারসাম্য। তাছাড়া সিন্থেটিক ভিটামিন-সি দীর্ঘকাল খেলে দেখা দিতে পারে, স্কার্ভি রোগ, মেয়েদের অকাল রজঃস্রাব, এবং বহু ক্ষেত্রেই বাতের আক্রমণ।

ইতিপূর্বে এই সিন্থেটিক ভিটামিন-সি, কোলেসটেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে বলে বিশ্বাস করা হত। কিন্তু স্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে এ-বিশ্বাস অমূলক। বস্তুত অতিরিক্ত সিন্থেটিক ভিটামিন-সি গ্রহণে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

হ্যাঁ, ভিটামিন-সি ঠাণ্ডা-লাগা (common cold) প্রতিরোধ করতে পারে, এমন কি ঠাণ্ডা লেগে গেলে তার স্থায়িত্বের সময়ও কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রত্যহ ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম ভিটামিনেই এ-কাজ সম্ভব। তাই যাঁদের খাদ্যে ভিটামিন-সি-র মারাত্মক অভাব তাঁরা ঐ ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম সিন্থেটিক ভিটামিন-সি খেতে পারেন। কিন্তু এজন্যে গাদা-গাদা ভিটামিন-সি খাওয়া কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

● ভিটামিন-ই পাওয়া যায় আমাদের প্রচলিত সবরকম খাদ্যে বিশেষত শস্যদানা এবং শাকপাতায়।

বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে আমরা অনেকেই মনে করি যে সিন্থেটিক ভিটামিন-ই যৌনশক্তি বাড়িয়ে দেয়, জরা প্রতিরোধ করে, হৃদরোগ হতে দেয় না। বিজ্ঞাপনদাতাদের এ-সব দাবির

প্রত্যেকটাই কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভিটামিন-ই-র অভাব ঘটেছে এরকম রোগীর খবর নেই বললেই চলে। কারণ একে তো এই ভিটামিন সাধারণ খাদ্যের মধ্যেই যথেষ্ট আছে, তাছাড়া আমাদের দেহে এটা সঞ্চিতও থাকতে পারে দীর্ঘকাল ধরে।

□

খনিক লবণের ক্ষেত্রেও সেই কথা। যাঁরা আহার্যে শাক-সব্‌জি বাদ দিয়ে গ্রহণ করেন অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্যাট ও প্রোটিন তাঁদের দেহে বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও লোহার অভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনার আহার্যটি হয় প্রকৃতিজাত অশোধিত নানা খাদ্য-সম্পন্ন তবে বাড়তি খনিজ লবণ বা মিনারেল সাপ্লিমেণ্ট গ্রহণের আদৌ কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া ভিটামিনের মতো অতিরিক্ত মিনারেল সাপ্লিমেণ্টও একরকম ক্ষতিকারক। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণীয় পরিমাণ পটাসিয়াম. সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ১ বারেই গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তেমনি অতিরিক্ত আয়রণ সাপ্লিমেন্ট গ্রহণে দেখা দিতে পারে লৌহ-ঘটিত বিষক্রিয়া।

●

প্রিটিকিন ডায়েটের মতো স্বাস্থ্য-সম্মত স্বাভাবিক আহার্যে, আহারী প্রয়োজনীয় প্রতিটি ভিটামিন ও মিনারেল পান যথেষ্ট পরিমাণে। তাই আলাদা করে সিন্থেটিক ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার কোনো দরকার পড়ে না।

চা, না কফি ?

স্থান কাল যাই হোক্, যে পাত্রেই পরিবেশিত হোক্, কফি কিম্বা চা-এ—চুমুক মানেই প্রফুল্লতা! এবং উভয়ক্ষেত্রেই এই প্রফুল্লতার পিছনে আছে একটি ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান—ক্যাফিন। এ ছাড়াও আছে ক্যাফিনের দু-একজন নিকট আত্মীয় যেমন— চা-এর ক্যাফিনের সঙ্গে থিওফাইলিন, কোকো-তে থিওব্রোমিন প্রভৃতি। ক্যাফিন ও তার আত্মীয়দের এই পুরো দলটিকে বলা হয় জ্যানথিনস্। জ্যানথিনস দূর করে ক্লান্তি, অবসন্নতা, শানিত করে চিন্তা।

এ' তো গেল গুণপনার খবর। কিন্তু ক্যাফিনের অন্য পরিচয় ভিন্নতর। ক্যাফিন হল সেই ধরণের 'ড্রাগ' যা অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে এবং এই অস্বাভাবিক উত্তেজনাহেতু সৃষ্টি করে—

- ☐ বর্ধিত রক্ত-ফ্যাট মাত্রা
- ☐ বর্ধিত ব্লাড-সুগার মাত্রা
- ☐ হাই ব্লাডপ্রেশার
- ☐ অদ্ভুত রকমের দ্রুত হৃৎ-স্পন্দন
- ☐ অতিরিক্ত গ্যাষ্ট্রিক অ্যাসিড।

ক্যাফিনে শরীরের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা নির্ভর করে মূলত চা, কফি প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালীর উপর। সাধারণভাবে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, যত বেশিক্ষণ ধরে চা/কফি ভেজাবেন বা ফোটাবেন (!) তত বেশি ক্যাফিন মিশবে আপনার পানীয়ে। ১ কাপ বা প্রায় ৫ আউন্স পরিমাণ বিভিন্ন পানীয়ে ক্যাফিনের পরিমাণ থাকে এই রকম ঃ৩০

কফি	৯০—১২০ মি. গ্রা.
চা	৩০—৬০ মি. গ্রা.
কোকো	৫০ মি. গ্রা. পর্যন্ত
কোলা ড্রিঙ্কস	১৫—৪০ মি. গ্রা.

ক্যাফিনিজম

চা/কফি প্রভৃতির মাধ্যমে অত্যধিক ক্যাফিন গ্রহণে যে শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে ক্যাফিনিজম।

ক্যাফিনিজম শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। চকোলেট, কোলা ড্রিঙ্কস প্রভৃতির প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক দুর্বলতা। মা-বাবাও প্রায়শই এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, একটা ছোট চকোলেট বার-এ ক্যাফিন থাকছে প্রায় ২৫ মি. গ্রা. আর একটা কোলা ড্রিঙ্কস-এ প্রায় ৪০ মি. গ্রা. !

এই হিসেবে ৭ বছর বয়সের একটি ছেলের (যার ওজন মাত্র ২৭ কে.জি.) সারাদিনে ৩টি কোলা ড্রিঙ্কস খাওয়া—প্রায় ৮০ কে.জি. ওজনের একজন বয়স্ক লোকের ৮ কাপ কফি খাওয়ার সমান ! এজন্যই ডাক্তাররা ছোট ছেলেমেয়েদের চকোলেট, কোলা ড্রিঙ্কস বেশি খেতে নিষেধ করেন। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বদ মেজাজ অনিদ্রা, প্রভৃতি ক্যাফিন-জনিত উপসর্গের প্রকোপ বেড়ে যায়।

ক্যাফিন-জনিত অন্যান্য উপসর্গ

অতিরিক্ত ক্যাফিন গ্রহণে আকস্মিকভাবে নানাবিধ হৃদরোগের সূচনা হতে পারে আর যাঁরা রীতিমত হৃদরোগে (Myocardial infarction) আক্রান্ত, ক্যাফিন তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

অনেক সময় প্রসবগত সমস্যার জন্য ক্যাফিনকে দোষী করা হয়। বহু ডাক্তারই গর্ভবতী মেয়েদের ক্যাফিন-যুক্ত বিভিন্ন পানীয় গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। বস্তুত, ক্যাফিনের পারমানবিক সংযুক্তটি এমনই যে তা গর্ভপত্রকে (placenta) অতিক্রম করে বিকাশমান ভ্রূণটিরও ক্ষতি করতে পারে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল ক্যানসার ইনিসটিটিউটের Dr. Mulvihil বলেন, ক্রোমোজোম-গত পরিবর্তন

এবং অস্বাভাবিক শিশু জন্মগ্রহণের পিছনে ক্যাফিনের একটা ভূমিকা থাকা কিছু অসম্ভব নয়।

অনেক গবেষক মনে করেন যে দুশ্চিন্তা, রুক্ষ মেজাজ, ক্রোধ, অনিদ্রা, ডিস্‌পনিয়া, গ্যাসট্রাইটিস প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গেও ক্যাফিনের রীতিমত যোগাযোগ আছে।

কফির চেয়ে চা কি ভালো ?

কফিতে যে পরিমাণ ক্যাফিন আছে, চা-এ আছে তার অর্ধেক। এই হিসেবে কফির চেয়ে চা কিছুটা নিরাপদ। কিন্তু কয়েকজন গবেষকের মতে চা, কফির চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। পাশ্চাত্যে যাঁরা দুধ-ছাড়া চা বেশী খান, তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় পাকস্থলীর ক্যানসারের প্রাদুর্ভাবেই এ-জাতীয় ভাবনার সূত্রপাত।

সমস্ত দোষ-গুণ বিচার করে পুষ্টিতাত্ত্বিকরা বলছেন যে, স্কিমড মিল্ক-এর প্রোটিন অন্তত চা-এর ট্যানিনকে দোষমুক্ত করে বলে স্কিমড মিল্ক-সহ পাতলা লিকারের হালকা চা ২-৩ বার খাওয়া অনেকটা নিরাপদ।

Whole milk বা ফ্যাট-যুক্ত দুধ এবং চিনি, খাদ্যবস্তু হিসেবে কি কি অপকার করে তা আগেই বলেছি। তাই চা এর লিকারের সঙ্গে এই দুধ আর চিনি মিশলে যে 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটে তার বিপদ— সে তো সহজেই অনুমেয়!

ধূমপান ঃ ফিলটারে ক্ষতি আরও বেশি

ধূমপানের আলোচনা করতে গেলে প্রায়শই আমরা বলি 'নিকোটিন' আর 'টার'-এর কথা। এই ভাবনার জন্যই বোধ হয় ফিলটার সিগারেটের উদ্ভাবন এবং প্রচলন।

কিন্তু ধূমপানের ক্ষতি নিয়ে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে 'নিকোটিন' বা 'টার-এর চেয়েও ঢের বেশি ক্ষতিকারক হল ধূমপানের মাধ্যমে গৃহীত কারবন মনোক্সাইড (Co)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে ফিলটার সিগারেটে ক্ষতি আরও বেশি। ফিলটার সিগারেটে নিকোটিন বা টার কিছু কম এলেও এক্ষেত্রে বিষাক্ত কারবন মনোক্সাইড গৃহীত হয় ২৮% বেশি। কিন্তু ফিলটারহীন সিগারেটের ক্ষেত্রে কড়া ধোঁয়ার জন্যে অত বেশি পরিমাণ কারবোন মনোক্সইড গ্রহণ করা যায় না।

ঐ কারবোন মনোক্সাইড রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে কারবোক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এই যৌগ রক্তকণিকাদের অক্সিজেন বহনে অক্ষম করে রাখে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। ফ্লোরিডার Dr. Eliot বলছেন, ধূমপান রক্তের অক্সিজেন-সংবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ২০%। বস্তুত অক্সিজেনের প্রতি রক্তকণিকাদের যে আকর্ষণ, তার চেয়ে ২০০ গুণ বেশি আকর্ষণ কারবোন মনোক্সাইডের প্রতি। এজন্যেই অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন আহারের আগে বা পরে ধূমপান করলে রক্তস্রোতে দেখা দেয় অক্সিজেন-সংকট।

এই অক্সিজেন সংকট-ই ইঙ্গিত করে যে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, স্ট্রোক, হাই ব্লাডপ্রেশার, অ্যানজাইনা তথা সমস্ত ধমনী-সংক্রান্ত রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। ধূমপানের মাধ্যমে নেওয়া এই কারবোন মনোক্সাইড মস্তিষ্কের কর্মকুশলতাকেও (brain efficiency) ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমরা অনেকেই জানি ফুসফুসে ক্যানসার হওয়ার পিছনে ধূমপানের ভূমিকা আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, অন্যান্য ক্যানসারের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গেও ধূমপান যথেষ্ট জড়িত। ধূমপানের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ক্যানসার-উদ্রেককারী কারসিনোজেন। তারপর প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসার আগে এরা শরীরে থাকে প্রায় ১০ ঘন্টা এই দীর্ঘ সময় দেহের বিভিন্ন টিস্যুর সংস্পর্শে এসে কারসিনোজেন সৃষ্টি করে ক্যানসার আক্রমণের সম্ভাবনা।

ধূমপানে ক্ষতি হয় হাড়ের ক্যালসিয়ামের, কমে যায় ধমনীগুলির স্থিতিস্থাপকতা, বয়স্ক ব্যক্তিদের মতো কুঁচকে যায় দেহের চামড়া, ব্যাহত হয় দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি, কমে আসে জিভের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা. ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমস্ত দেহের ও মনের কর্মক্ষমতা। সর্বোপরি ধূমপানে নষ্ট হয় ভিটামিন-সি, রক্তে অক্সিজেন-সংবহণের ব্যাপারে যার আছে বিশিষ্ট ভূমিকা।

প্রসঙ্গত, এককভাবে ধূমপান-ই পারে প্রিটিকিন ডায়েটের সমস্ত সুফলকে একযোগে বিনষ্ট করে নিতে।

ধূমপান কেমন করে ছাড়ব ?

আস্তে আস্তে, একটু একটু করে, ধূমপান ছাড়া যায় না। ধূমপান ছাড়তে হলে ধূমপায়ীকে মনে করতে হবে যে তার জীবনের শেষ সিগারেটটি সে খেয়েছে। এরপর যদি আর একটি সিগারেটও খায় তাহলে এ-জীবনে আর সিগারেট ছাড়া হবে না। দিন ছয়েক অন্য কোন ধূমপানরত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসাও তার উচিত হবেনা। এমন কি সিগারেট, চুরুট যে-সব দোকানে বিক্রী হয়, প্রথম ৬ দিন সে-সব দোকান থেকেও দূরে থাকতে হবে। ৬ দিন এই নিয়মগুলি পালন করতে বলার কারণ, ধূমপান বন্ধ করলে ধূমপায়ীদের যেসব দৈহিক ও মানসিক অস্বস্তি বোধ হয় (withdrawl symptoms) সেগুলো পুরোপুরি কাটতে ৪ থেকে ৬ দিন লাগে।

ধূমপান পরিত্যাগ প্রসঙ্গে প্রিটিকিনের এক অনন্য পরামর্শ হল : যখনই ধূমপানের জন্য মনটা উশখুশ করবে তখনই এক গ্লাস জল আস্তে আস্তে খেতে শুরু করুন। যদি নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায় দেখা যাবে যে গ্লাসের জল শেষ হওয়ার আগেই ধূমপানের ইচ্ছা উবে গেছে। আসলে অনেকদিনের অভ্যাস বশত ঐ-ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে মনে এসে হাজির হলেও ওটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী! আর প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণ করলে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে ধূমপান ছাড়ার সমস্যাটা বড়োজোর ১ সপ্তাহের সমস্যা।

বস্তুত, প্রিটিকিন ডায়েট অনুসারীর কাছে ধূমপান পরিত্যাগ ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কেননা খাদ্যশস্য, শাক-সব্জি আর ফলমূল-প্রধান প্রিটিকিন ডায়েট শুরু করার পর আহারীর রক্ত দেহকোষে এমন এক পরিবর্তন আসে যার ফলে ধূমপান করার তাগিদটাই প্রায় চলে যায়। প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণের ৩য়-৪র্থ দিনে ঐ ধূমপানের ইচ্ছেটা ৫০% চলে যায় এবং ১ সপ্তাহের মধ্যে দেখা যায় ধূমপানের জন্য ব্যাকুলতা ৯০% চলে গেছে। সপ্তাহান্তে বোঝা যায় যে ধূমপানের ইচ্ছে আর মনে উঁকি দিচ্ছে না। এরপর নিজেকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে যে সারাদিনের কাজে ক্লান্তিবোধ কমে আসছে, দেখা দিচ্ছে বাড়তি উদ্যম, ইন্দ্রিয় গুলির অনেকটা যেন নবজাগরণ ঘটছে, বেড়ে যাচ্ছে মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা এবং স্মরণশক্তি।

এই বাহ্য। ধূমপান পরিত্যাগ করে প্রাক্তন ধূমপায়ী খাদ্যে খুঁজে পান সেই অপূর্ব আস্বাদ, জীবনে ফিরে পান সেই অনিবার্য অনুপম অনুভূতি, যা থেকে বছরের পর বছর তিনি নিজেকে রেখেছিলেন বঞ্চিত করে। অতঃপর সেই স্বাস্থ্য-সচেতন প্রাক্তন ধূমপায়ী, যিনি নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন, ধূমপানের অপকারিতার দীর্ঘ তালিকা মনে এনে পর, পুনরায় আর ধূমপানে ফিরে যেতে চান না।

বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম

পূর্ববর্তী বিভিন্ন আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্য-সত্যের ভিত্তিতে খাদ্য-উপাদানের গুণাগুণ বিচার করতে বসে আমরা জেনেছি— খাদ্য শুধু উপভোগের নয়, রোগভোগের পশ্চাতেও বিশিষ্ট খাদ্যের বলিষ্ঠ ভূমিকা। জেনেছি হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি ডিজেনারেটিভ রোগের প্রাদুর্ভাবে এদের কী মারাত্মক তৎপরতা!

বিভিন্ন খাদ্য সম্পর্কে এখন আর আমরা কোনো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী নই। আর সে জন্যেই আমরা আগ্রহী সামগ্রিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবর্তিত প্রিটিকিন ডায়েট সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে। কিন্তু প্রিটিকিন প্রোগ্রামে, আহার্য একটা বড়ো কথা হলেও শেষ কথা নয়। বস্তুত, প্রিটিকিন তাঁর স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাটিকে ভাগ করেছেন পরস্পরের পরিপূরক দুটি পর্যায়ে :

প্রথম পর্যায়---

প্রিটিকিন-সম্মত খাদ্য : প্রিটিকিন ডায়েট

দ্বিতীয় পর্যায়—

স্বাভাবিক দেহচর্চা বা রোভিং

- হাঁটা
- জগিং/দৌড়ানো

প্রিটাকন প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়

—প্রিটিকিন ডায়েট

প্রিটিকিন ডায়েটের মূলকথাটি হল :

স্বল্প ফ্যাট-প্রোটিন-লবণ-যুক্ত, বিকৃত কারবোহাইড্রেট-বর্জিত, অতিরিক্ত ফাইবার-সম্পন্ন, প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্য।

মোট ক্যালরির হিসেবে এই আহার্যে বিভিন্ন খাদ্য-উপাদানের পরিমাণ—

প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট	—৮0%
ফ্যাট	—১0%
প্রোটিন	—১0%
ক্যালরি সরবরাহ	১00%

● **প্রিটিকিন ডায়েটই** হল সর্বপ্রকার হৃদরোগ, হাই ব্লাডপ্রেশার, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, বক্ষ ও মলাশয়ের ক্যানসার প্রভৃতি ডিজেনারেটিভ তথা বিপাকীয় রোগমুক্ত দীর্ঘজীবনের চাবিকাঠি। যাঁরা প্রিটিকিন প্রোগ্রাম থেকে সর্বাধিক ও সর্বাঙ্গীণ সুফল পেতে চান তাঁদের আজীবন অবিচলিতভাবে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ডায়েটটি-ই অনুসরণ করতে হবে।

প্রিটিকিন ডায়েট

(বিভিন্ন খাদ্যের অনুমোদিত পরিমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিধি-নিষেধ)

● ছোটমাছ, মাংস ও অন্যান্য

সব রকমের স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত (Lean/ছোট) মাছ যেমন পমফ্রেট, পুঁটি, ছোট রুই, বেলে, ভেটকি, মাগুর, মৌরলা, মৃগেল প্রভৃতি—জনপ্রতি রোজ সর্বাধিক ৩০—৯৮ গ্রাম বা সপ্তাহে ১½ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬৮০ গ্রাম। অথবা

অপেক্ষাকৃত কম ফ্যাট-যুক্ত চিকেন, টার্কি, হাঁস, বিভিন্ন গেম বার্ডস ও অন্যান্য পাখীর মাংস বা স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত কচ্ছপ, পাঁঠা অথবা গোরুর মাংস—জনপ্রতি সর্বাধিক ৩০—৯৮ গ্রাম প্রত্যহ বা সপ্তাহে ৬৮০ গ্রাম। (অবশ্যই চামড়া ও চর্বি বাদ দিয়ে)।

যাঁরা ডিজানেরেটিভ রোগে বিশেষত হৃদরোগে (coronary artery disease) রীতিমত আক্রান্ত তথা শয্যাযায়ী তাঁদের ক্ষেত্রে স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত (lean/ছোট) মাছ বা চিকেন প্রতি ৫ দিন অন্তর ২৮—৩০ গ্রাম অনুমোদিত (প্রিটিকিন রিগ্রেশন ডায়েট)।

□ নিষিদ্ধ

অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন যে-কোন মাছ (যেমন ইলিশ, সরপুঁটি, কই প্রভৃতি) বা. অতিরিক্ত ফ্যট সম্পন্ন যে-কোন প্রাণীর মাংস (যেমন শূকরের মাংস), এবং কোলেসটেরল-যুক্ত গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া, গুগলি, শামুক প্রভৃতি খোলা-যুক্ত (shelled) প্রাণী ও কোলেসটেল-পূর্ণ লিভার (মেটে), কিডনি, ব্রেন প্রভৃতি।

(মধ্যবয়সীয় পক্ষে প্রত্যহ ৯৮ গ্রাম মাছ/মাংস গ্রহণ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।)

● ডিম

ডিমের সাদা অংশ (egg white/albumen) জনপ্রতি সর্বাধিক সপ্তাহে ৭টি আর কাঁচা খেলে সপ্তাহে ২টি।

□ নিষিদ্ধ : ডিমের কুসুম ও মাছের ডিম।

● **দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য**

মাছ-মাংস প্রভৃতি যে কোনো প্রাণিজ প্রোটিন ছাড়াও জনপ্রতি প্রত্যহ সর্বাধিক ২২৫ গ্রাম স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধ বা ৫ টেবিল চামচ স্কিমড মিল্ক পাউডার কিংবা সম-পরিমাণ ঐ দুগ্ধজাত দই, ছানা প্রভৃতি ; অথবা প্রত্যহ সর্বাধিক ২৮—৫৬ গ্রাম ১০০% স্কিমড মিল্কের পনির।

মাছ-মাংস না খেলে স্কিমড মিল্ক/পাউডার প্রভৃতি দ্বিগুণ পরিমাণে খেতে হবে।

স্কিমড মিল্কের তৈরি চিনি-ছাড়া দই প্রয়োজনমতো পরিমাণে রান্নায় অনুমোদিত।

□ **নিষিদ্ধ**

সাধারণ (মাখন-যুক্ত) দুধ এবং ঐ প্রকার দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্য ; হোলমিল্ক পাউডার ; সর্বপ্রকার ফ্যাট-যুক্ত পনির।

● **ফ্যাট ও তেল**

কোন রকম ফ্যাট বা তেল খাওয়াই প্রিটিকিন-সম্মত নয়। এই ডায়েটে তাই কঠোরভাবে বর্জিত সবরকম প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তেল/ফ্যাট, অর্থাৎ—

১। ঘি, মাখন, চর্বি, নারকেল তেল, পাম তেল, বনস্পতি প্রভৃতি স্যাচুরেটেড ফ্যাট ;

২। সরষে, বাদাম, রেপসীড, কটনসীড তেল প্রভৃতি আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট ;

৩। corn তেল, Saffower তেল, সূর্যমুখী-সয়াবিন-তিল তেল প্রভৃতি পলি-আন্-স্যাচুরেটেড ফ্যাট, এছাড়া

৪। মার্জারিন, লেসিথিন এবং সর্বপ্রকার তেলেভাজা।

(তেল, ঘি প্রভৃতি ছাড়াই লোভনীয় রান্নার ব্যাপারে 'প্রিটিকিনী রান্না' পৃষ্ঠা ১৮৫ দ্রষ্টব্য)

● বাদাম ও তৈলবীজ (Nuts and Oil seeds)

বাদামের মধ্যে চেস্টনাট খাওয়া চলবে। সরষে, তিল, পোস্ত প্রভৃতি তৈলবীজ রান্নায় অল্প পরিমাণে অনুমোদিত।

□ নিষিদ্ধ

সর্বপ্রকার বাদাম (nuts)—চিনাবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট, নারকেল প্রভৃতি (কচি ডাবের জল খাওয়া চলবে) । এছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে তৈলবীজ খাওয়া নিষিদ্ধ।

● শস্য ও শস্যজাত খাদ্য

স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত (naturally processed) সবরকমের খাদ্যশস্য এবং শস্যজাত খাদ্য, যেমন—ঢেঁকিছাঁটা বা স্বাভাবিক শোধিত চালের সফেন শুকনো ভাত, তুষ-যুক্ত আটার রুটি এবং আটার পাঁউরুটি, সুজি, চিঁড়ে, খৈ, ছাতু, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি। এছাড়া বাড়তি ফ্যাট-তেল-চিনি বা ডিমের কুসুম-বর্জিত অন্যান্য শস্যজাত খাদ্য।

(খাদ্যশস্য ও শস্যজাত খাদ্য উভয় ক্ষেত্রেই কতটা খাবেন সেই পরিমাণের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। তবে অতিরিক্ত শোধিত খাদ্য, যেমন— ময়দা, কর্নফ্লেকস প্রভৃতি মাঝে-মধ্যে স্বল্প পরিমাণে খেতে পারেন।)

□ নিষিদ্ধ

বাড়তি ফ্যাট-তেল-চিনি ও ডিমের কুসুম-যুক্ত সমস্ত শস্যজাত খাদ্য।

● ডাল ও সমজাতীয় খাদ্য

সব রকমের ডাল—মুগ, মসুর, কলাই, অড়হর, মটর, প্রভৃতি জনপ্রতি সর্বাধিক সপ্তাহে ৭০০ গ্রাম (রান্না করা করা অবস্থায়)। অঙ্কুরিত মুগ বা ছোলাও প্রিটিকিন অনুমোদিত।

মাছ/মাংস না খেলে প্রত্যহ ২৪৪ গ্রাম ডাল (রান্না করা অবস্থায়) খেতে হবে।

□ নিষিদ্ধ

অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন সয়াবিন ও তৎজাত সবরকমের খাদ্য। ছোলার ডালও একই কারণে অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া নিষিদ্ধ।

বিন, কড়াইশুঁটি ও মটর ডাল সপ্তাহে ২-৩ বারের বেশি খাবেন না।

● শাক ও সব্জি

সবরকমের শাক ও সব্জি যথাসম্ভব খাদ্য-ফাইবার সহ অর্থাৎ খোসা সমেত এবং কাঁচা স্যালাড হিসাবে। সবুজ দাগ-যুক্ত আলুর খোসায় বিষধর্মী অ্যালকালয়েড 'সোলানিন' থাকে বলে আলুর খোসা বাদ দেবেন। এছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণে অক্সালেট-যুক্ত পালং ও বিটপাতা নিষিদ্ধ।

● **ফল ও ফলজাত খাদ্য**

প্রত্যহ সর্বাধিক ৫ বার (servings) বা ৯৩ গ্রাম বাড়তি চিনি/নুন ছাড়া টাটকা ফল—বিশেষ করে ভিটামিন-সি সম্পন্ন ফল, যেমন—পেয়ারা, কমলা, কাগ্জি বা পাতি লেবু, পেঁপে, টমেটো প্রভৃতি।

এছাড়া অধিক চিনি-মুক্ত কয়েক প্রকার (cooked/canned/ puried/frozen) ফল জনপ্রতি সপ্তাহে সর্বাধিক ৬৫০ গ্রাম।

শুকনো ফল (dry fruits) যেমন—খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি অতিরিক্ত শর্করা-সম্পন্ন বলে প্রত্যহ সর্বাধিক ২৮ গ্রাম।

চিনি-নুন বর্জিত ফলের রস সর্বাধিক রোজ ১০০ গ্রাম।

ঘরে তৈরি চিনি-মুক্ত আচার, জ্যাম প্রভৃতি দরকার মতো।

□ **নিষিদ্ধ**

অতিরিক্ত ফ্যাট-সম্পন্ন জলপাই ও অ্যাভোকাডো। এছাড়া বাড়তি চিনি-নুন-যুক্ত ফল, বাজারী জ্যাম, জেলি, ফ্রুট বাটার/সিরাপ প্রভৃতি।

যাঁদের রক্ত-ফ্যাট (Tryglycerides)-মাত্রা ১২৫ মিগ্রা%-এর বেশি তাঁরা ফলের রস বা অতি পাকা ফল যথাসাধ্য কম খাবেন।

● **চিনি তথা চিনি-যুক্ত সর্বপ্রকার খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি**

সামান্যতম পরিমাণেও চিনি বা চিনি-যুক্ত কোনপ্রকার খাদ্য, স্ন্যাকস বা পানীয়ই প্রিটিকিন-সম্মত নয়। এইরকম কঠোরভাবে প্রিটিকিন-নিষিদ্ধ খাদ্যগুলি হল :

চিনি, মিষ্টি, মল্ট, মিছরি, গুড়, বাজারী জ্যাম, জেলি, সিরাপ, কনফেনশনারি, আইসক্রিম, চকোলেট, চুয়িংগাম, ক্যানডি, সফট ড্রিঙ্কস, ফ্রাকটোজ, ডেক্সট্রোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি। বাজারী 'মধু'-ও চিনি প্রভৃতির মতো বিকৃত কারবোহাইড্রেট তাই 'অনুপান' ছাড়া অন্য কোনভাবে অতিরিক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ।

● **সবরকম লবণ বা নুন**

জনপ্রতি সব মিলিয়ে প্রত্যহ ৩—৪ গ্রাম। কাঁচা নুন খাওয়া প্রথমেই পরিত্যাগ করতে হবে তবে রান্নায় নুন দেওয়া রাতারাতি বন্ধ করবেন না। ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে অনুমোদিত পরিমাণে নামিয়ে নিয়ে আনতে হবে।

□ **নিষিদ্ধ**

টেবিল সল্ট, বিট নুন তথা সৈন্ধব লবণ। এছাড়া সর্বপ্রকার বাজারী কনডিমেণ্টস, বাজারী সস্, মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) প্রভৃতি নুন-যুক্ত খাদ্য।

● **কনডিমেণ্টস (আচার, চাটনি, কাসুন্দি), সস্ প্রভৃতি**

অতিরিক্ত ফ্যাট-তেল-চিনি এবং ডিমের কুসুম-বর্জিত ঘরে-তৈরি অল্প নুন-যুক্ত আচার, চাটনি, কাসুন্দি, কনডিমেণ্টস, সস্ প্রভৃতি স্বল্প পরিমাণে প্রিটিকিন অনুমোদিত। এছাড়া খাদ্যাদি সুগন্ধপূর্ণ করবার নানাবিধ প্রকৃতিজাত সামগ্রী, যেমন—কারিপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, জাফরান প্রভৃতি স্বাভাবিক পরিমাণে ব্যবহার করা চলবে।

□ **নিষিদ্ধ**

বাড়তি তেল-চিনি-নুন বা ডিমের কুসুম-যুক্ত সর্ববিধ বাজারী কনডিমেণ্টস, সস্, মায়োনেজ, কেচাপ প্রভৃতি।

● **বিভিন্ন জলখাবার ও আহারের শেষ পদ (স্ন্যাকস ও ডেশার্ট)**

স্বাভাবিক পরিমাণে ফ্যাট-তেল-চিনি-নুন এবং ডিমের কুসুম-বর্জিত সর্বপ্রকার স্ন্যাকস ও ডেশার্ট।

□ **নিষিদ্ধ**

ফ্যাট-তেল-চিনি-নুন এবং ডিমের কুসুম-যুক্ত সর্ববিধ স্ন্যাকস ও ডেশার্ট এবং প্রিজারভেটিভ বা রঙ দেওয়া নানান খাবার।

● **পানীয়**

অনুমোদিত পরিমাণে চিনি-ছাড়া স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধ, চিনি-নুন-বর্জিত ভেজিটেবল সুপ / ফ্রুট-জুস। স্কিমড মিল্ক-যুক্ত চিনি-ছাড়া পাতলা লিকারের চা অথবা লেমন-টি দিনে ২-৩ কাপ।

□ **নিষিদ্ধ**

সাধারণ (মাখন-যুক্ত) দুধ ও হোল-মিল্ক পাউডার। চিনি ও নুন-যুক্ত ভেজিটেবল সুপ/ফ্রুট জুস। এছাড়া Sweetener-যুক্ত নানাবিধ সফ্ট ড্রিঙ্কস সর্বোপরি কফি, কোকো, বিয়ার ও অ্যালকোহল এবং সাধারণ দুধ-চিনি-যুক্ত চা।

● **মুখশুদ্ধি, ধূমপান প্রভৃতি**

জর্দা ও মিষ্টি মশলা ছাড়া 'পান'। মুখশুদ্ধি হিসেব ভাজা মশলা।

□ **নিষিদ্ধ**

জর্দা / মিষ্টি মশলা দেওয়া পান, খৈনি এবং সিগারেট, সিগার থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার ধূমপান।

* রোভিং তথা প্রিটিকিন প্রোগ্রাম শুরু করার আগে আরেকবার আপনার ওজন, ব্লাড প্রেশার কোলেসটেরল-ট্রাইগ্লিসারাইডস্-ইউরিক অ্যাসিড-মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে রাখুন। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমোন্নতিটা ধরা সহজ হবে।

নিষ্ঠা নিয়ে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম করলে আপনি দেহ-মনে তো অনুভব করবেনই তবু একমাস পর পরীক্ষাগুলো আর একবার করিয়ে আপনার একাগ্রতার পুরস্কার সম্বন্ধে নিশ্চিত হোন।

প্রিটিকিন রিগ্রেশন ডায়েট

যাঁরা ডিজেনারেটিভ রোগে, বিশেষত হৃদরোগে (advanced coronary artery disease) রীতিমত আক্রান্ত শুধু তাঁদের জন্যেই এই বিশেষ আহার্য। প্রিটিকিন ডায়েটের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই শুধু এক্ষেত্রে স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত (lean / ছোট) মাছ বা চিকেন প্রতি ৫ দিন অন্তর ২৮—৩০ গ্রাম অনুমোদিত।

প্রাসঙ্গিক সতর্কতা

● যাঁরা ওষুধ খাচ্ছেন বা ইনসুলিন প্রভৃতি নিচ্ছেন তাঁদের প্রিটিকিন ডায়েটের মাধ্যমে শরীরের অনিবার্য উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক ওষুধ প্রভৃতির প্রয়োজনও ক্রমশ কমে আসবে। তাই মাত্রাও ক্রমশ কমিয়ে নিতে হবে। এজন্য ডায়েট অনুসরণের মাঝে মাঝে রোগ নিরাময়ে খাদ্যের ভূমিকার সঙ্গে পরিচিত বা নিদেনপক্ষে সংস্কারমুক্ত কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিন। এইভাবে ধীরে ধীরে ওষুধ-মুক্ত পরিপূর্ণ সুস্থতার দিকে অগ্রসর হোন।

● আরোগ্যমুখী রোগীরা প্রলুব্ধ হয়ে হঠাৎ প্রিটিকিন-নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তু অত্যধিক খেয়ে বসলে আবার ভীষণভাবে অসুস্থ হতে পারেন।

প্রিটিকিন ডায়েট গ্রহণ প্রসঙ্গে কয়েকটি দরকারী কথা

সচেতন পাঠক-পাঠিকার অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে, **প্রিটিকিন ডায়েট কি যথাযথ সুষম আহার্য (balanced diet)?**

—উত্তরে জানাই, সুনিশ্চিভাবেই একটি সুষম আহার্য এই প্রিটিকিন ডায়েট। তবে যথাযথ পুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য-সামগ্রী নির্বাচনের সময় নিশ্চয়ই দেখতে হবে যে আহার্যে খাদ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনমতো ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের সরবরাহ ঠিক আছে কিনা। কিন্তু এ-নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের যথার্থ ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রিটিকিন অনুসারীকে যে কয়েকটি নির্দেশ মেনে চললেই হবে সেগুলি হল ঃ

□ প্রতিদিন যে কোনো ২ ধরনের খাদ্যশস্য অবশ্যই খেতে হবে। অর্থাৎ শুধু ভাত নয়, ভাত-রুটি মিশিয়ে খেতে হবে।

● প্রতিদিন দুই বা ততোধিক বার কাঁচা শাক-সবজির স্যালাড (প্রয়োজনে আলাদা সিদ্ধ করে) এবং রান্না-করা সবুজ ও হলুদ সবজি খেতে হবে। (প্রত্যেকবার খাওয়ার সঙ্গেই খোসা ছাড়িয়ে আলু খাওয়া যেতে পারে। কেননা আলু একটি চমৎকার সুষম খাদ্য।)

□ একটুকরো লেবু-জাতীয় ফল এবং অন্তত ২-৩ টুকরো যে কোন তাজা ফল প্রত্যহ খাওয়া দরকার।

● বিন, মটর, কড়াইশুঁটি পছন্দ হলে সপ্তাহে ৩ দিন না হলে ১ দিন খাবেন।

□ ভিটামিন বি-১২-এর প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বল্প ফ্যাট-যুক্ত (lean/ছোট) মাছ, পোলট্রি বা মাংস রোজ ৩০ গ্রাম খাবেন তবে কোনক্রমেই সারা সপ্তাহে মোট ৬৮০ গ্রামের বেশি খাওয়া চলবে না।

মাছ-মাংস না খেলে প্রত্যহ স্কিমড মিল্ক বা মাখন-তোলা দুধ ৪৫০ গ্রাম এবং ডাল ২৪৪ গ্রাম (রান্না করা) খাবেন।

যদি পুরোপুরি নিরামিশাষী হন, এমন কি দুধ-ও না খান, তাহলে সপ্তাহে ১টা ভিটামিন বি-১২ ট্যাবলেট খেতে পারেন।

□ স্বাভাবিকভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার যাঁদের হয় না তাঁদের প্রিটিকিন ডায়েট গ্রহণের শুরুতে ১ চা-চামচ এবং পরে পরে ২ চা-চামচ আটার ভূষি (bran) প্রতিদিন তরকারি, ঝোল, স্যুপ প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। যদিও ঠিকমত নিয়ম মেনে প্রিটিকিন ডায়েট খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের পুরনো রোগীরও সামান্যতম অসুবিধে থাকার কোন হেতু নেই।

● প্রধান খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুতেই ক্ষুধিত থাকবেন না —তরকারি দিয়ে ২-৩টি আটার রুটি বা ফ্যাট-চিনি-ডিমের কুসুম-বর্জিত ২-৩টি বিস্কিট/ক্রেকার কিংবা ২-৪ টুকরো তাজা ফল বা এক বাটি স্যুপ অথবা খানিকটা কাঁচা সবজির স্যালাড অবশ্যই খাবেন।

□ ওজন বা মেদ কমিয়ে ফেলতে চাইলে প্রিটিকিন আহারীরা শাক, সিদ্ধ সবজি আর ফলমূল বেশি করে খাওয়া শুরু করুন। আর ওজন বাড়াতে হলে পূর্বোক্ত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে বেশি করে ভাত, রুটি, বিভিন্ন ডাল প্রভৃতি গ্রহণ করুন।

<>

প্রিটিকিন ডায়েট শুরু করার অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই একটা নতুন প্রাণশক্তি, নতুন উদ্দীপনা, একটা সুস্বাস্থ্যের স্বাদ অনুভব এবং উপভোগ করেন। কিন্তু এর মধ্যেই আবার কেউ কেউ প্রথমটায় পেট ফাঁপা বা পেটে গ্যাস (flatulance) নিয়ে অস্বস্তি ভোগ করেন। সাধারণত এ সমস্যাটা

একেবারেই স্বল্পস্থায়ী তবু কারো কারো ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি কয়েক মাস চলতে পারে।

এক্ষেত্রে গ্যাস হওয়ার অন্যতম কারণ অভ্যস্ত ফ্যাট-প্রধান খাদ্য থেকে সরে প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্য খেতে শুরু করা। আরও একটু গভীর ভাবে বিচার করলে এর কারণ হচ্ছে নতুন ধরণের খাদ্য খাওয়ার ফলে intestinal flora-র পরিবর্তন। কিন্তু এ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কেন না অতিরিক্ত ফ্যাট-প্রধান খাদ্য যাঁরা খান, তাঁদের অন্ত্রে থাকে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা মলদ্বারের ক্যানসার ডেকে আনতে পারে। intestinal flora-র পরিবর্তন এই দুর্বিপাক থেকে দেহকে রক্ষা করে।

তবুও যাঁদের পেট ফাঁপা চলতেই থাকে অস্বস্তি দূর করবার জন্য তাঁদের কিছু করা দরকার। এ-ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপই নেওয়া যেতে পারে—

□ সিম, মটর, তুষ / ভুষি প্রভৃতি শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে পেট ফাঁপার জন্য দায়ী থাকে। যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাঁরা তুষ/ভুষি অবশ্যই খাবেন কিন্তু যাঁদের তা নেই তাঁদের পক্ষে শুরুতেই এগুলি খাওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁরা প্রথমটায় এগুলি কম খেতে পারেন অথবা বাদ দিতে পারেন ; এবং কিছুকাল প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণের পর ধীরে ধীরে এগুলি খাওয়া শুরু করতে পারেন।

● অল্প-সিদ্ধ-করা সব্‌জি, কাঁচা সব্‌জির চেয়ে হজম করা সহজ। তাই পেটে গ্যাস যাঁদের শুরু হয়েছে তাঁরা প্রথমটায় অল্প-সিদ্ধ-করা সব্‌জি-ই খাবেন। তারপর ক্রমে ক্রমে কাঁচা সব্‌জি খাওয়া শুরু করবেন। তবে সব্‌জি খাওয়ার ব্যাপারে মনে রাখতে হবে ফুলকপি, বাঁধাকপি জাতীয় সব্‌জি বেশি করে খাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। কারণ ঐ জাতীয় সব্‌জি বেশি খেলে পেটে গ্যাস হওয়ার প্রবণতা হয়।

● অতিরিক্ত খাওয়াও অনেক সময় পেট ফাঁপার কারণ হতে পারে। তাই এক বৈঠকে পেট-ভরে খাওয়া বাদ দিতে হয়। যাঁরা সারাদিনে বারে বারে অল্প অল্প খান তাঁদের এ-সমস্যা প্রায় দেখাই যায় না।

পেটে গ্যাস হওয়া নিয়ে শেষ কথা হচ্ছে যে প্রিটিকিন ডায়েট খেয়ে গ্যাসের অস্বস্তি বোধ করলেই উপরের নির্দেশগুলি অনুসরণ করে জলদি সেটা সারিয়ে ফেলবেন। মনে রাখবেন প্রিটিকিন ডায়েটে যে অনন্য সুস্থতা, অপূর্ব আনন্দ এবং পর্যাপ্ত প্রাণশক্তির আশ্বাস আছে সেই তুলনায় এই স্বল্পস্থায়ী অস্বস্তি ভোগ কিছুই নয়।

কখন কী খাব

আমরা সাধারণত সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাই। তারপর একটু বাদে কিছু জলখাবার খাই। দুপুরে কিংবা বাইরে বেরনোর আগে ভাত খাই। বিকেলে আবার চা-জলখাবার আর রাত্রে রুটি অথবা ভাত। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের এই প্রচলিত খাদ্যগ্রহণ রীতিটি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের খাওয়ার রীতি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাঁরা ভোরবেলায় প্রধান খাদ্য এবং দুপুরে সামান্য জলখাবার খেয়ে আবার সন্ধ্যার পর স্নান সেরে প্রধান খাদ্য গ্রহণ করেন। এ দেশের কৃষকদের খাদ্য গ্রহণ রীতিটিও ঐ ধরনের।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, সূর্যরশ্মি যত প্রখর হয়ে ওঠে, হজমের তত ব্যাঘাত ঘটে। তাই সূর্যরশ্মি প্রখর হওয়ার আগে প্রধান খাদ্য গ্রহণই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। তবে আমরা দীর্ঘকাল ধরে যেরকমভাবে খেতে অভ্যস্ত তাতে খাদ্যগ্রহণ হয়তো অতখানি বিজ্ঞানসম্মত করে উঠতে পারব না। কিন্তু একটু পরিবর্তন নিশ্চই করতে পারি।

যেমন সকালে শুধু চায়ের পর কিছু প্রাতরাশ করে দুপুরে অল্প খেতে পারি। আবার সন্ধ্যার পরেই আমরা রাতে যে ধরনের খাওয়াতে অভ্যস্ত সেটা খেয়ে নিয়ে তারপর রাত্রে শোবার আগে সামান্য কিছু মুখে দিতে পারি।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের প্রাণকেন্দ্র প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টারে অবশ্য খাওয়া দাওয়ার ধরনটা একটু অন্য রকম।

সেখানে আমাদের দু-তিনবার পেট ভরে খাওয়ার ব্যাপারটাকেই একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে, কেননা একসঙ্গে অনেকখানি বেশী খেলে ব্লাডসুগার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে রক্ত-ফ্যাট এবং কোলেসটেরল-মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে। দেখা দিতে পারে হাইপোগ্লাইসেমিয়া রোগ। এইজন্য লন্‌জিভিটি সেণ্টার-এ মধ্যাহ্ন ও নৈশ-ভোজনে আহার্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অন্তবর্তী সময়গুলিতে ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে পরিবেশন করা হচ্ছে Snacks বা হালকা খাবার। খাওয়া-দাওয়ার রুটিনটি সেখানে সাধারণত এইরকম :

খাদ্য-পরিকল্পনা ● প্রিটিকিন লন্‌জিভিটি সেণ্টার

সকাল ৮ টা	খৈ (বা ঐ জাতীয় খাদ্য)+ স্কিম্‌ড মিল্ক+ কয়েক টুকরো ফল।
সকাল ৯-১৫	১টি লেবু জাতীয় ফল।
সকাল ১০-৩০	সব্‌জি সুপ + স্কিমড্ মিল্কের পনির মাখানো আটার পাঁউরুটি।
সকাল ১১-৩০	স্যালাড।
দুপুর ১২টা	সুপ+স্কিম্‌ড মিল্কের পনির-মাখানো রুটি।
দুপুর ১-৪৫	সাওয়ার ক্রীম (সম পরিমাণ স্কিম্‌ড মিল্ক-জাত ছানা ও দই-এর মিশ্রণ) সহ সেঁকা আলু (Baked potato)।

বিকেল ৩-৩০	স্যুপ+পনির-মাখানো আটার রুটি।
সন্ধ্যা ৬টা	তরকারি+সফেন শুকনো ভাত (লাল চালের)+২৮ গ্রাম চিকেনের কারি+স্কিম্‌ড মিল্কের পনির-মাখানো রুটি।
রাত ৮-১৫	টাটকা ফলের স্যালাড/১টি আপেল।

তাহলে একদিকে কৃষিপ্রধান গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদের খাদ্যগ্রহণ রীতি অন্যদিকে প্রিটিকিনের খাদ্য পরিকল্পন—এই দু'ধরনের মাঝে সোনালী মধ্যপথটি বেছে নেওয়াই আমাদের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত সেক্ষেত্রে খাদ্য পরিকল্পনা হতে পারে এই রকম :

খাদ্য-পরিকল্পনা

সকাল ৬টা	স্কিম্‌ড মিল্ক / লেবুর রস দেওয়া চিনি-ছাড়া চা+১টি থিন অ্যারারুট বা আটার বিস্কিট।
সকাল ৬-৩০—৭টা	অঙ্কুরিত বা সিদ্ধ মুগ বা ছোলা+স্কিম্‌ড মিল্ক বা তৎজাত দই (চিনি-ছাড়া)+কয়েক টুকরো যে কোনো মিষ্টি ফল (কলা ইত্যাদি)+রুটি / মুড়ি / চিড়ে / খৈ / ছাতু / সুজি।
সকাল ৯টা (যাঁরা বাইরে যাবেন) যাঁরা বাড়িতে আছেন তাঁরা এই সময় সম্ভব হলে ১টি তাজা ফল খাবেন।	সফেন শুকনো ভাত বা তুষ-যুক্ত আটার রুটি+ছোট পেঁয়াজ বা কাঁচা লঙ্কাসহ ১টি আলু সিদ্ধ+ডাল+½ খানা পাতি / কাগজি লেবু+রসুন ২টি কোয়া+তরকারি+কাসন্দি বা ঘরে-তৈরি আচার +স্যালাড সময়োপযোগী সবজি দিয়ে।

দুপুর ১২টা (যাঁরা বাড়িতে আছেন)	দুপুরের খাবার (পূর্ববৎ)
বেলা ২টা—২-৩০ (যাঁরা বাইরে আছেন)	তুষ-যুক্ত আটার রুটি + তরকারি + সব্জি স্যুপ (সম্ভব হলে) + কয়েক টুকরো ফল।
বিকেল ৩-৩০ (যাঁরা বাড়িতে আছেন)	সব্জি স্যুপ (অথবা ছোলা সিদ্ধ + মুড়ি) + কয়েক টুকরো ফল।
বিকেল ৫-৩০—৬টা	চা (পূর্ববৎ) + ১টি বিস্কিট।
সন্ধ্যা ৭টা—৭-৩০	তুষ-যুক্ত আটার রুটি বা সফেন শুকনো ভাত + ডাল + তরকারি + স্যালাড + ৩০ গ্রাম ছোটমাছ বা চিকেন + স্কিম্‌ড মিল্কের চিনি ছাড়া দই + কয়েক টুকরো মিষ্টি ফল।
রাত্রি ৯টা—৯-৩০	সব্জি স্যুপ বা স্কিমড মিল্ক + ২-৪ টুকরো যে কোনো মিষ্টি ফল বা খেজুর।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়

—রোভিং

স্বাস্থ্যবিদরা বলেন, ব্যায়াম তথা দেহচর্চা দীর্ঘজীবন লাভে সহায়তা করে। এ-কথা প্রমাণ করতে অবশ্য কয়েক পুরুষ ধরে নিয়ন্ত্রিত ডাক্তারি পরীক্ষা করা দরকার। তবে এ-সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় যে প্রিটিকিন ডায়েটের সঙ্গে দেহচর্চা যুক্ত হলে জীবনের চেহারাটাই পালটে যায়। ব্যক্তির দেহে একটা নতুন সুস্থতাবোধ আসে। সে যেন একটা নতুন জীবন উপভোগ করতে শুরু করে। আর এই রোগমুক্ত নতুন জীবন যে দীর্ঘ হবে—এটা ভাবা একটুও অযৌক্তিক নয়।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামে, প্রিটিকিন ডায়েটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার পরিপূরক—মানবজাতির আদি স্বাভাবিক দেহচর্চা—রোভিং। রোভিং-এর মধ্যে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ একটানা দ্রুত হাঁটা (brisk and sustained walking), জগিং এবং সম্ভব হলে দৌড়ানো। এই ধরনের ব্যায়ামকে বলা হয় 'আইসোটোনিক' বা অ্যারোবিক ব্যায়াম। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামগ্রিক বিচারে এই ব্যায়ামই শ্রেষ্ঠ, কেননা এ-ব্যায়ামে বাহু নাড়তে হয়, পা চালাতে হয় এবং এই ব্যায়াম হৃদযন্ত্রের উন্নতিসাধন ও দেহে রক্ত সঞ্চালনে প্রকৃত সহায়তা করে।

আর এক ধরনের জনপ্রিয় ব্যায়াম হচ্ছে 'আইসোমেট্রিক'। যেমন—ভারী-ওজন তোলা। এ-জাতীয় ব্যায়ামে মাংসপেশীগুলোকে সংকুচিত করতে হয়। দৈহিক নড়াচড়ার তেমন ব্যাপার নেই। এ-ব্যায়াম হৃদযন্ত্রকে সুস্থ থাকতে বা সবল হতে সাহায্য করেনা। পরন্তু এতে হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে এবং রক্তচাপ বাড়ে।

সর্বোপরি আইসোমেট্রিক ব্যায়াম দীর্ঘজীবন লাভের সপক্ষে নয়।

'Who's Who in American Sports'-গ্রন্থে অ্যাথলেট-দের গড় আয়ুষ্কাল নিয়ে এক সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে—

☐ ফুটবল খেলোয়াড়রা বাঁচেন ৫৭ বছর। ☐ বক্সাররা বাঁচেন ৬১ বছর ☐ বেসবল খেলোয়াড়রা ৬৪ বছর। ☐ ট্র্যাক রানাররা ৭১ বছর।—এর মধ্যে ৫০ বছরের বেশি বেঁচেছেন ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে শতকরা মাত্র ৬৫ জন, অথচ রানারদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জন!

—তাহলে রানাররা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী কেন?

এর কারণ এই হতে পারে যে, দৌড়ানো একটা নিখুঁত অ্যারোবিক ব্যায়াম। দৌড়ানো এক ধরনের রোভিং। কিন্তু অবশিষ্ট আইটেমগুলি সম্পাদনেব মধ্যে অনেকটা সময় জুড়ে আছে বিশ্রাম তথা ব্যায়ামের অনুপস্থিতি।

বস্তুত, আজ নানারকম খেলাধুলোর আমদানি হওয়াতে হাঁটা কিংবা জগিং বা দৌড়ানো প্রভৃতি অ্যারোবিক ব্যায়াম তথা রোভিং-এর আনন্দ মানুষ ভুলতে বসেছে। ভুলতে বসেছে যে, এই রোভিং-এর উপকারিতা যে-কোন ধরনের প্রথাগত ব্যায়ামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কেননা, রোভিং—

● শরীরে রক্ত চলাচল ঠিক রাখে ● অস্থিসমূহ দুর্বল হতে দেয় না ● দেহের সঠিক ওজন বজায় রাখে ● বাড়তি চর্বি তথা মেদভার কমিয়ে দেয় ● হৃদরোগ নিবারণ করে ● ইউরিক অ্যাসিড-মাত্রা কমিয়ে বাতব্যাধি নিবারণ করে ● হৃদযন্ত্রকে আরও বেশি কর্মক্ষম করে মস্তিষ্কের রক্ত-সংবহন ও তার কার্যকারিতা বাড়িয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করে তাছাড়া

● দেহের ব্যথা বেদনা কমিয়ে দেয় ● শুদ্ধ রক্তের প্রভাবে শরীরে ঔজ্জ্বল্য আনে, শরীর আরও বেশি শক্তিশালী ও নমনীয় হয়ে ওঠে ● মনের বিষন্নতা, দুর্ভাবনা দূর করে ● অনিদ্রা দূর করে ● যে কোন ট্রাংকুইলাইজারের চেয়ে অধিক তৎপরতায় সঙ্গে দেহ-মনের ভার কমিয়ে দেয়।* ●মাংসপেশীগুলিতে স্বাভাবিক ভাবে শক্তি প্রবাহিত করে দেহের সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া সোৎসাহে ভালোরকম রোভিং করলে দেহ তৈরি করতে পারে সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ গ্লাইকোজেন। প্রসঙ্গত, এই দেহজ গ্লাইকোজেনই হল অ্যাথলেটদের প্রধান মূলধন। এর দৌলতেই তাঁদের এত সহিষ্ণুতা, এত স্ট্যামিনা।

---

* দেহচর্চার অভাব হলে অলস মাংসপেশীগুলি প্রচুর পরিমাণে যে-ইলেকট্রিক চার্জ (শক্তি) সঞ্চয় করে রাখে, তা সার্থক বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটায়। রোভিং-এর ফলে যখন ঐ সঞ্চিত চার্জ খরচ হয় তখনই দেহ সার্থক বিশ্রাম নিতে পারে। আমরা সাধারণত যে ট্রাংকুইলাইজার ব্যবহার করি তার কাজও হল ঐ সঞ্চিত চার্জ মুক্ত করা। এক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, একটি ট্রাংকুইলাইজার ট্যাবলেটের থেকেও অনেক সহজভাবে ঐ চার্জ কমে যায় ঘুমোবার আগে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটলে!

হৃদযন্ত্রের উন্নতিসাধনে রোভিং

প্রতিদিনের নিয়মিত রোভিং-এ –

□ রক্তের অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা বেড়ে যায় ফলে প্রয়োজনে দেহ অল্প সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পেতে পারে। এর ফলে হৃদযন্ত্রের কাজের চাপ কমে গিয়ে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। এইভাবে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব তো প্রতিহত হয়ই, সাধারণভাবে অসুখ-বিসুখ হওয়ার প্রবণতা কমে আসে আর হলেও অনেক জলদি সেরে যায়।

● পায়ের মাংসপেশীগুলির ব্যবহার হয় এবং রক্ত পায়ের পাতা থেকে হৃদযন্ত্রে খুব সহজে পৌঁছে যায়।

□ রক্ত জমাট বাঁধার (clotting) সময়কাল দীর্ঘ হয়। এমনকি রক্ত জমাট বেঁধে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব জীবন থেকে একেবারেই চলে যায়।

● হৃদস্পন্দনের মধ্যবর্তী সময়ে হৃদযন্ত্র আরও বেশি বিশ্রামের অবকাশ পায়। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মানসিক বা শারীরিক সংকটকালে হৃদস্পন্দন ত্বরান্বিত হয় না, রক্তচাপও বেড়ে যায় না আকস্মিকভাবে।

□ হাই ব্লাডপ্রেশার স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে।

● রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস্ তথা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমে গিয়ে রক্তবাহী ধমনীগুলিকে খুবই ইলাসটিক করে তোলে। এর ফলে শরীর অপেক্ষাকৃত শ্রমশালী এবং নমনীয় হয়ে ওঠে।

Dr. R. S. Paffenbarger-এর মূল্যবান পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে শ্রমবিমুখতা তথা আলস্য হৃদযন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। কেননা আলস্য, ধূমপান আর হাই ব্লাডপ্রেশার

—এই তিন মিলেই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

● অল্পকালমধ্যে সমান্তরাল সংবহন ব্যবস্থা (collateral circulation) তৈরি হয় এবং এইভাবে সৃষ্ট নতুন রক্তনালীগুলির মাধ্যমে রক্তসংবহনের আরও উন্নতি ঘটে।

Dr. Paffenbarger-ই ২০ হাজার রেল শ্রমিকের উপর পরীক্ষা করে দেখেন যে, অফিস-কর্মীদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে রেল-শ্রমিকদের দ্বিগুণ। এদের মধ্যে মূল তফাৎ হল শ্রমিকরা যে পরিমাণে নানা কাজে ঘুরে বেড়ান সে তুলনায় অফিস-কর্মীদের ঘোরা-ফেরা অনেক কম।

এইসব পরীক্ষালব্ধ ফলের উপর ভিত্তি করেই Dr. P. D. White তাঁর বিশ্বখ্যাত রোগী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে বলেছিলেন, রাষ্ট্র চালনার চেয়েও গল্‌ফ খেলার উপর একটু বেশি জোর দিতে।

হাঁটুন, একটু হাঁটুন !

দীর্ঘজীবন লাভের জন্য আর যৌবনের স্ফূর্তি ও আনন্দ বেশি বয়সেও অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে হাতুড়ে বদ্যি আর অ্যালকেমিস্টদের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কত পিল-পুরিয়া আর পানীয়ের নিষ্ফল সন্ধান করেছে।

নাথান প্রিটিকিন এই দীর্ঘজীবন এবং দীর্ঘায়ত যৌবনের জন্যে বিনা পয়সার একটা প্রেসক্রিপশন উপহার দিয়েছেন। প্রেসক্রিপশনটা হচ্ছে, কোন কঠিন ব্যায়ামের দরকার নেই, শুধু পা বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করুন ! একটু হাঁটুন !

প্রকৃতি মানুষকে দুটো পা দিয়েছে হেঁটে বেড়ানোর জন্য, দৌড়ানোর জন্য। চতুষ্পদদের ক্ষেত্রেও তাই। আসল কথা পা যাদের আছে তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য হাঁটা বা দৌড়ানোই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই হাঁটা বা রোভিং-এ যে দেহে-মনে কত অগণিত সুফল পাওয়া যায় সে কথা তো আগেই বলেছি।

হ্যাঁ, রোভিং শুরু করুন হাঁটা দিয়ে। অনেক কাল ধরে যাঁর হেঁটে বেড়ানো অভ্যাস নেই তাঁকে হাঁটা শুরু করতে হবে ধীরে ধীরে। প্রথম প্রথম স্বচ্ছন্দে যতটা হাঁটা যায়, ততটাই হাঁটবেন। এভাবে ৩ দিন চলুক। ৪র্থ দিনে দূরত্বটা ১০% বাড়িয়ে দিন। এর ৪ দিন পর আরও ১০% বাড়ান। এভাবে বাড়িয়ে চললে দেখা যাবে ৪০ দিনে আপনি প্রথমদিন যতটা হেঁটেছিলেন তার ডবল হাঁটতে পারছেন।

হাঁটার ব্যাপারে কত দ্রুত হাঁটলেন সেটা গৌণ। মুখ্য হচ্ছে কতটা হাঁটলেন। প্রিটিকিন বলছেন, ধীরে ধীরে সাধ্যমত সময় বাড়িয়ে সারাদিনে অন্তত দু-বারে ৩০ মিনিট করে মোট ১ ঘণ্টা হাঁটতে অভ্যস্ত হতে হবে। ৪০ দিন এইভাবে হাঁটায় অভ্যস্থ হওয়ার পরই আপনি একটু দ্রুত হাঁটার কথা ভাবতে পারেন। তার আগে

নয়। কখনোই নয়। আর ঠিক ততটা দ্রুতই হাঁটবেন যতটা আপনার পক্ষে স্বচ্ছন্দে সম্ভব। কখনো হয়তো ঝোঁকের বশে একটু বেশি হাঁটা হয়ে যেতে পারে, ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু হাঁটার মাত্রা সঠিক নিয়ন্ত্রণের একটা সহজ উপায় আছে। এজন্যে হাঁটার শেষে ১ মিনিট শান্ত হয়ে বসে নিজের পালস্-রেট (৬০ সেকেণ্ডে হৃদয় যতবার স্পন্দিত হল) নিতে হবে। প্রতি মিনিটে ১৩০ বার হৃৎস্পন্দন হলে বুঝবেন হাঁটা মাত্রাধিক হয়ে গেছে। আর যদি হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ বার হয় তবে বুঝে নেবেন আপনার সুস্থতার মান যথেষ্ট উন্নত।

আপনি যখন একটানা দিব্যি ৪·৫ মাইল (৭৫০ পদক্ষেপ = $\frac{১}{৪}$ মাইল) হাঁটতে পারছেন তখন জগিং শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। তবে যাঁদের হার্টের অবস্থা ভালো না কিংবা রক্তবাহী ধমনীগুলি যথেষ্ট ক্রিয়াশীল নয়, তাঁদের পক্ষে জগিং করা নিরাপদ নয়। তাছাড়া তাঁদের জগিং করবার কোনো প্রয়োজনও নেই। কেননা তাঁদের হৃদযন্ত্র হাঁটার মাধ্যমেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অল্পকাল মধ্যে সমান্তরাল সংবহন ব্যবস্থা (collateral circulatoin) তৈরি হয়। তাছাড়া শারীরগত (physiological) অন্যান্য উন্নতি কি হাঁটা কি জগিং—উভয় ক্ষেত্রেই সমান ভাবে সাধিত হয়।

নবীন স্বাস্থ্যামোদীদের কথা

হাঁটার ব্যাপারে কিন্তু প্রিটিকিন অনুসারী স্বাস্থ্যামোদীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন একেবারেই আলাদা। কেননা রোগ নিরাময় এঁদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা অর্থাৎ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন। এক্ষেত্রে তাই রোভিং মানে শুধু হাঁটা নয়, একটানা বেশ কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটা (brisk and sustained walking)।

মনে রাখতে হবে যে হাঁটার সময় তাঁরা যেন একটানা ১৫—৩০ মিনিট বেশ জোরে জোরে শ্বাস নেন এবং তাঁদের হৃদস্পন্দন একটু দ্রুত মাত্রায় চলে। এই 'দ্রুত মাত্রা' প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার।

প্রথমত, নবীন স্বাস্থ্যামোদী হিসেবে আপনার ক্ষেত্রে হৃৎস্পনের হার সর্বাধিক কত হতে পারে এটা জানা থাকলে মাত্রাধিক দ্রুত হাঁটার থেকে আপনি বিরত থাকলে পারবেন। এক্ষেত্রে হিসেবটা হল :

সর্বাধিক হৃৎস্পন্দন-মাত্রা (maximum heart-rate)
=২২০ – আপনার বয়স।

দ্বিতীয়ত, জেনে রাখতে হবে আপনার হৃৎস্পন্দনের লক্ষ্য-মাত্রা (target heart-rate) কী হওয়া উচিত। এ-ব্যাপারে হিসেবটা হল :

১। যদি আপনি কোন ধরনের ব্যায়ামে নিয়মিত অভ্যস্ত না থাকেন তবে আপনার ক্ষেত্রে দ্রুতহাঁটার সময় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের লক্ষ্য-মাত্রা হওয়া উচিত

=(২২০ — আপনার বয়স) × ০·৭০

২। যদি আপনি কোনো ধরনের ব্যয়ামে নিয়মিত অভ্যস্ত থাকেন তবে আপনার ক্ষেত্রে দ্রুতহাঁটার সময় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত

=(২২০— আপনার বয়স) × ০·৭৫

৩। যদি আপনি ধূমপায়ী হন বা আপনার দেহে ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ কে. জি. বা ততোধিক বাড়তি ওজন থাকে * তবে আপনার ক্ষেত্রে দ্রুত হাঁটায় সময় প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের লক্ষ্য-মাত্রা হওয়া উচিত

=(২২০— আপনার বয়স) × ·৬৫

* দৈর্ঘ্য-ওজন সারণি দ্রষ্টব্য

দৈর্ঘ্য-ওজন সারণি

ভারতীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে

দৈর্ঘ্য	বয়স ২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০
সে. মি.				কিলোগ্রাম			
১৪৮	৪২·৭	৪৪·৭	৪৬·২	৪৭·৬	৪৮·৮	৫০	৫০·৯
১৫০	৪৩·৬	৪৪·৯	৪৬·৯	৪৮·৫	৪৯·৭	৫০·৮	৫১·৫
১৫৩	৪৫·৪	৪৭	৪৯	৫০·৪	৫১·৮	৫২·৩	৫৩·৫
১৫৫	৪৬·৩	৪৮·১	৪৯·৯	৫১·৫	৫২·৭	৫৩·৫	৫৪·২
১৫৮	৪৮·৬	৫০	৫২	৫৩·৫	৫৪·৫	৫৫·৭	৫৬·৩
১৬০	৪৯·৭	৫১·১	৫৩·১	৫৪·৭	৫৫·৬	৫৬·৭	৫৭·৪
১৬৩	৫১·১	৫২·৭	৫৪·৯	৫৬·৩	৫৭·৬	৫৮·৫	৫৯·৪
১৬৫	৫৩·১	৫৪·৭	৫৬·৯	৫৮·৫	৫৯·৭	৬০·৬	৬২
১৬৮	৫৪	৫৬·৩	৫৮·১	৬০·১	৬১·৫	৬২·৪	৬৩·৭
১৭০	৫৬·৫	৫৭·৯	৬০·৩	৬২·২	৬৩·৭	৬৪·৭	৬৫·৮
১৭৩	৫৮·১	৬০·১	৬২·২	৬৪·০	৬৫·৮	৬৭	৬৮·৩
১৭৫	৬০·১	৬২·২	৬৪·২	৬৬	৬৮·১	৬৯·৭	৭১
১৭৮	৬১·৯	৬৪	৬৬·৩	৬৮·৫	৭০·৬	৭১·৯	৭২·৪
১৮০	৬৪	৬৬·২	৬৮·৫	৭১	৭৩·৩	৭৪·৪	৭৫·১
১৮৩	৬৬	৬৮·৫	৭১	৭৩·৩	৭৫·৬	৭৭:১	৭৭·৮

ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে

দৈর্ঘ্য	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০
১৪৮	৩৮·৬	৪১	৪২·৬	৪৪	৪৫·১	৪৬·৩	৪৭·১
১৫০	৪০·৩	৪১·৬	৪৩·৫	৪৪·৮	৪৬	৪৭	৪৭·৭
১৫৩	৪১·৯	৪৩·৫	৪৫·৩	৪৬·৬	৪৭·৯	৪৮·	৪৯·৫
১৫৫	৪২·৮	৪৪·৩	৪৬·২	৪৭·৭	৪৮·৮	৪৯·৫	৫০·১
১৫৮	৪৪·৯	৪৬·৩	৪৮·১	৪৯·৫	৫০·৪	৫১·৬	৫২·১
১৬০	৪৬	৪৭·৩	৪৯·১	৫০·৬	৫১·৫	৫২·৪	৫৩
১৬৩	৪৭·৩	৪৮·৮	৫০·৮	৫২·১	৫২·২	৫৪·১	৫৪·৯
১৬৬	৪৯·১	৫০·৬	৫২·৬	৫৪·১	৫৫·৩	৫৬	৫৭·৩
১৬৮	৫০	৫২·১	৫৩·৮	৫৫·৮	৫৬·৬	৫৭·৭	৫৯

সব নেশার সেরা নেশা
—জগিং

একটানা বেশ কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটা, জগিং এবং দৌড়ানোর মধ্যে জগিং-ই নবীন স্বাস্থ্যামোদীর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। রোভিং শুরু করুন হাঁটা দিয়ে তারপর শরীর সইয়ে হাঁটার থেকে জগিং-এ উত্তরণ—সে এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা!

আপনি যখন একটানা দিব্যি ½ ঘণ্টা দ্রুত হাঁটতে পারছেন তখন ইচ্ছে করলে জগিং শুরু করতে পারেন।

কিন্তু বয়স ৩০ বছরের বেশি হলে বা হার্টের কোনোরকম দুর্বলতা থাকলে ডাক্তারী পরীক্ষা বিশেষত E. C. G. করিয়ে অবশ্যই জেনে নেবেন আপনার হৃদযন্ত্রটি, জগিং সহ্য করতে পারবে কিনা। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে তবেই জগিং করা শুরু করুন।

☐ কিভাবে জগিং করবেন?

মাথা সোজা রেখে, শিথিল দেহে, দুটি হাত সুবিধেমতো বুকের কাছে রেখে, পা দুটি ধীর ছন্দে ওঠা-নামা করে জগিং করুন। যদি ছোট ছোট পা ফেলে জগিং করতে গিয়ে জলদি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে লম্বা পা ফেলুন। শীতকালে হাঁটু দুটো হট্ ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে গরম করে কিন্তু জগিং-এর জন্য প্রস্তুত হলে খুব ভালো হয়।

শুরুতে কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটুন। তারপর কিছুটা জগিং আবার কিছুটা হাঁটা এইভাবে alternately রোভিং করে গিয়ে অন্তিম পর্যায়ে শরীর ঠাণ্ডা (cool down) করবার জন্য ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে জগিং শেষ করতে হয়। এইভাবে ২০ দিন অভ্যাস না করে কিন্তু একটানা জগিং করা আদৌ নিরাপদ নয়।

দ্রুত হাঁটার থেকে জগিং-এ উত্তরণের ব্যাপারে প্রিটিকিনে-প্রদত্ত প্ল্যানটি অবলম্বন করাই সবচেয়ে শ্রেয়। প্ল্যানটি এই রকম ঃ

দিন	রুটিন	সময়কাল (মিনিট)	হার
১ম	দ্রুত হাঁটা	২৫	৭ দিনে ৪ বার
	ক্রমান্বয়ে ১ মিনিট জগিং এবং	১০	
	১ মিনিট হাঁটা, ৫ বার		
৮-১৪	দ্রুত হাঁটা	২০	
	ক্রমান্বয়ে ২ মিনিট জগিং এবং	১৫	৭ দিনে ৪ বার
	১ মিনিট হাঁটা, ৫ বার		
১৫-১৯	দ্রুত হাঁটা	১০	৫ দিনে ৩ বার
	ক্রমান্বয়ে ৩½ মিনিট জগিং এবং	২০	
	½ মিনিট হাঁটা, ৫ বার		
২০-২৪	দ্রুত হাঁটা	১৫	৫ দিনে ৩ বার
	ক্রমান্বয়ে ৪½ মিনিট জগিং এবং	২০	
	½ মিনিট হাঁটা, ৪ বার		
	একটানা জগিং	১০	
২৫-২৯	দ্রুত হাঁটা	৫	৫ দিনে ৩ বার
	ক্রমান্বয়ে ৪½ মিনিট জগিং এবং	১৫	
	½ মিনিট হাঁটা, ৩ বার		
	একটানা জগিং	১৫	
৩০-৩৫	দ্রুত হাঁটা	৫	
	ক্রমান্বয়ে ৪½ মিনিট জগিং এবং	১০	৫ দিনে ৩ বার
	½ মিনিট হাঁটা, ২ বার		
	একটানা জগিং	২০	
৩৬—	দ্রুত হাঁটা	৫	
	একটানা জগিং	৩০	প্রতি ৭ দিনে ৪ বার

* প্রতিবারই ৫ মিনিট ধরে ধীর গতিতে হেঁটে (Cool down) রোডিং শেষ করতে হবে।

জগিং সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য

□ কখন জগিং করবেন ?

যদি সকালবেলা জগিং করতে কোনরকম অসুবিধে হয় তবে বিকেলবেলা করা স্থির করুন। তবে যাঁরা ওজন বা মেদ কমাতে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে নৈশাহারের আগে স্বাভাবিক মাত্রা রেখে জগিং করা একদিক দিয়ে সুবিধাজনক। কারণ, পরিমিত জগিং-এ ক্ষিদে কমে যায় বলে রাত্রে কম খেলেও চলে। প্রসঙ্গত, কখনোই অত্যধিক রোদ বা উত্তাপ থাকাকালীন জগিং করবেন না।

□ কোথায় করবেন ?

সিমেন্টের ফ্লোর বা পাথুরে জায়গা, বেড়ানো বা জগিং-এর জন্যে আদৌ যথাযথ নয়। সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঠই প্রশস্ত। কিন্তু তেমন জায়গা সবসময় হাতের কাছে নাও পেতে পারেন। তখন যে-ধরনের রাস্তা আপনার হাঁটু সহ্য করে, পরীক্ষা করে তেমন রাস্তাই নির্বাচন করুন।

□ গায়ে কী পরে করবেন ?

জগিং-এর পোষাক সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে সেই পোষাক পরে খুব গরম যেন না লাগে আবার খুব শীতবোধও না হয়। গ্রীষ্মে একটা স্পোর্টস গেঞ্জি আর শর্টস পরে বেরিয়ে পড়ুন। শীতকালের জন্য একটা track suit থাকলে ভালো, না হলে বেশ ঢিলে এবং নরম ট্রাউজার, স্পোর্টস শার্ট আর তার উপর হালকা একটা সোয়েটারেই চলবে। শুধু দেখবেন জগিং-এর সঙ্গে সঙ্গে দেহের তাপমাত্রা যখন বেশ বেড়ে যাবে তখন সোয়েটার বা স্পোর্টস শার্টটি আপনি যেন সহজে খুলে ফেলতে পারেন।

□ পায়ে কী পরে করবেন ?

জগিং-এর ক্ষেত্রে পদার্পণটি কী ধরণের হবে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যথাযথ জুতোটি না পড়লে নানা দৈহিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই জন্যে জুতোর দোকানে নিজে গিয়ে (কখনই মাপ পাঠিয়ে ডাকযোগে নয়) সেরা Running shoe-টি সংগ্রহ করুন। Running shoe-তে থাকে বাড়তি কুশন দিয়ে পা দুটিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা—সচরাচর খেলার কেড্‌স-এ যা থাকে না। এই 'cushioned arch support' ব্যবস্থাটি জগিং-এর জন্যে অত্যাবশ্যক। এর অভাবে জগিং-এর সময় গোড়ালির টেনডনগুলিতে অসম্ভব টান পড়ে, যার ফলস্বরূপ অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় পায়ের নানা উপসর্গ, যেমন—তরুণাস্থির প্রদাহ, পায়ের হাড়ের (leg bones) নিম্নপেশী ও টেনডনগুলিতে ব্যথা, heel bone spur প্রভৃতি।

মোটকথা জগিং-এর জন্য জুতোটি এমন হওয়া দরকার যাতে আপনার দেহের ভার ছড়ানো ভাবে পড়ে এবং গোড়ালির উপর কোন বাড়তি চাপ না সৃষ্টি হয়। এরজন্যে প্রয়োজন— ● বেশ চওড়া হিল, ● হিল এবং ইনসোলের মাঝে যথেষ্ট প্যাডিং যাতে সেটা 'shock-support' হিসেবে কাজ করতে পারে, ● জুতোটির নমনীয়তা—তাহলে জগিং-এর সময় জুতোটিতে যত ভাঁজই পড়ুক না কেন, তা আর পায়ের উপর কোন অতিরিক্ত চাপ বা ঘর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

□ কী খেয়ে করবেন ?

কখনোই একেবারে খালি পেটে হাঁটতে বা জগিং করতে যাবেন না। খুব ভোরবেলায় হলেও শুরু করার আগে অতি অবশ্যই কয়েক টুকরো ফল বা ২-৪টি বিস্কিট মুখে দিন। খালি পেটে

হাঁটার চেয়ে জগিং করা আরও বিপদজনক। কেননা সেক্ষেত্রে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি (free fatty acids) রক্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে দেহের তথা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীগুলিকে অত্যন্ত বিব্রত করে। যাঁদের করোনারী ধমনীগুলি বেশ রুদ্ধ, এটা তাঁদের ক্ষেত্রে ভেনট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন তো বটেই এমনকি মৃত্যুরও কারণ হ'তে পারে।

□ কতক্ষণ করবেন ?

ক্লান্তি বোধ করার অব্যবহিত আগেই জগিং করা থামাতে হবে। গা-জোয়ারি করে একসঙ্গে বেশ অনেকটা জগিং-এর চেষ্টা করা বিপদজনক হতে। জগিং করতে হয়ত ঘেমে যেতে পারেন। কিন্তু ঘাম ঝরানোই আসল উদ্দেশ্য হলে চলবে না, গা-গরম হয়ে যাওয়াটাও সহ্যের মধ্যে রাখতে হবে। তবে প্রতিবারে একটানা ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৪ বার জগিং করাই যথেষ্ট। (পৃষ্ঠা ১৬৯ দ্রষ্টব্য)

কিভাবে শেষ করবেন ?

জগিং শেষ করার পর অন্তত ৫ মিনিট স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা দরকার। এতে দেহে রক্ত সঞ্চালনের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

জগিং : এক অনুপম আনন্দের অনুভূতি

প্রথম প্রথম মনে হতে পারে জগিং একটা কষ্টসাধ্য, পরিশ্রম-সাপেক্ষ, নিরানন্দ স্বাস্থ্যাভ্যাস। কিন্তু যাঁরা নিয়মিত জগিং করেন তাঁরা জানেন কিছুদিন জগিং করার পর দেহে-মনে যে অপূর্ব স্ফূর্তি ও আনন্দ নেমে আসে তার তুলনা মেলা ভার। তাঁরা এই অনুভূতিকে বর্ণনা করে বলেন 'সুতীব্র আনন্দ', 'স্বর্গীয় আনন্দ'!

বিশেষজ্ঞদের মতে নিয়মিত জগিং শুরু করার ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে জগিং একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। আর সে নেশাটা একজন নিষ্ঠাবান জগারের কাছে এমনই অপরিহার্য হয়ে পড়ে

যে, কোন কারণে কিছুদিন জগিং করতে না পারলে—অ্যালকোহল, সিগারেট প্রভৃতি ছেড়ে দিলে প্রথমে যেমন কিছুটা মানসিক চাঞ্চল্য, অস্বস্তি প্রভৃতি withdrawl symptoms দেখা যায়—তাঁর মধ্যেও ঠিক সেই ধরনের নানা উপসর্গ প্রকাশ পেতে থাকে। এর মূল কারণ, জগিং নামক অনন্য নেশাটি তাঁকে এক অনুপম আনন্দের শীর্ষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারে।

যিনি ৬ মাস থেকে ১ বছর ধরে নিয়মিত ১ ঘণ্টা করে জগ করছেন দেখা যায় তাঁর ক্ষেত্রে এই 'তুঙ্গ-আনন্দ' আসে আধঘণ্টা জগিং করার পর।

পরবর্তী ১০ মিনিটে মনের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি হয়ে ওঠে সুসংবদ্ধ, দেখা দেয় নানা গভীর উপলব্ধি সর্বোপরি এক পরম সজীবতা তথা প্রাণবন্ততার অনুভূতি!

সমস্ত দুশ্চিন্তা অতিক্রম করে মনে এই প্রাণবন্ততার অনুভূতি হয় সম্ভবত জগিং-এর ফলস্বরূপ দেহে অ্যাড্রেনাল হর্মোন এপিনেফ্রিন অধিকমাত্রায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে।

মাত্র ১০ মিনিট জগিং করার পর এই হর্মোন-মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর অন্যান্য সম্পূরক হর্মোনের প্রবাহও জগিং শেষ করবার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি অব্যাহত থাকে।

—তবে এর পরেও জগিং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের একটি মন্তব্যের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। এ নিয়ে সান দিয়াগো মার্সি হাসপাতালের সাইকিয়াট্রির বিভাগীয় প্রধান Dr. Thaddeus Kostrubala বলেন:

সব নেশার সেরা নেশা জগিং—অ্যালকোহল, হেরোইন প্রভৃতি নানা অস্বাস্থ্যকর নেশাকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

□ ● হাঁটা, জগিং বা দৌড়ানো অনেকের পক্ষেই নানা কারণে সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য তাঁরা প্রতিদিন বেশ খানিকটা সাইকেল চালাতে বা সাঁতার দিতে পারেন। তা-ও সম্ভব না হলে Stationary cycling করতে পারেন ঘরে বসেই।

□ ● অনেক সময় আমরা ভাবি কিছুকাল তোড়জোর করে ব্যায়াম করে নিলে তার সুফল আগামী দিনগুলিতেও ভোগ করা যাবে। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারনা। আসলে যখনি ব্যায়ামচর্চা থেকে বিরত থাকব, ব্যায়ামের সুফলও সেই সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে। এজন্য যদি কোনো কারণে কিছুকাল রোভিং বন্ধ রাখতে হয় তবে রোভিং শুরু করতে হবে আবার সেই প্রথম পর্যায় থেকে। যেখানে এসে থেমেছিলাম আবার সেখান থেকে শুরু করলে ব্যাপারটা বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের সুনিশ্চিত্ত ফলশ্রুতি

নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রিটিকিন ডায়েট অনুসরণের অর্থ হল প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক কারবোহাইড্রেট খাদ্যের প্রতিটি সুফল লাভ।[১] কিন্তু এ-সমস্ত সুফলও কিছু নয়।[২] প্রিটিকিন ডায়েটের সঙ্গে তার পরিপূরক স্বাভাবিক দেহচর্চা বা রোভিং-এর সম্মিলনে প্রিটিকিন প্রোগ্রামের সুনিশ্চিন্ত ফলশ্রুতিগুলি এইরকম ঃ

□ শরীর বা স্বাস্থ্যের যে অবস্থাই থাকুক না কেন, এই প্রোগ্রামে সুস্থ এবং অসুস্থ প্রত্যেকেই আশাতীত লাভবান হয়।

● কোলেসটেরল-মাত্রা কমে যায়—৬ দিনের মধ্যে ১০%, ৪ সপ্তাহে—২৯%, এবং এইভাবে নেমে দঁড়োয় ১০০—১৬০ m.g.%।

□ ডায়েটটি অতিরিক্ত ফাইবার-সম্পন্ন বলে শতকরা ৫ ভাগ ক্যালরি কম গৃহীত হয়। ভাত, রুটি এবং নানা শস্যজাত খাদ্য কমিয়ে, বিকৃত কারবোহাইড্রেট সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, স্যালাড, সুপ আর বিবিধ তরকারি খাওয়ার দিকে একটু জোর দিলেই প্রিটিকিন প্রোগ্রামে ৪ সপ্তাহে বাড়তি মেদ কমে যায় ১৩ পাউণ্ড বা প্রায় ৬ কে. জি. আর বাড়তি ওজন কমে যায় ৪·৫ কে. জি.।

হ্যাঁ, অতিরিক্ত প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট খাদ্য খেয়েও ওজন বা মেদ কমা সম্ভব। কেননা প্রিটিকিন ডায়েটে বর্জিত চিনি, মিষ্টি, মদ প্রভৃতি সমস্ত বিকৃত কারবোহাইড্রেট খাদ্যই অত্যধিক ক্যালরি সম্পন্ন বলে স্থূলতা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রভৃতি বিবিধ ডিজেনারেটিভ রোগের প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট খাদ্য শুধু যে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য-সম্মত তাই-ই নয়, অপেক্ষাকৃত কম ক্যালরি-যুক্ত এবং নিরাপদ।

---

১. পৃষ্ঠা ১০৮ দ্রষ্টব্য।   ২. পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য।

● হাই ব্লাড প্রেশার কমে যায় ৪ সপ্তাহে ১৬%।

□ প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় বলে পরিশ্রম করতে ইচ্ছে হয়। তখন ডায়েটের পরিপূরক 'রোভিং' শুরু করার প্রেরণা ও উদ্যম আসে।

● উপবাস না করেই স্থূলদেহী সহ সকলেই উপবাসের সমস্ত সুফল লাভ করে।* উপরন্তু ভিটামিন, খনিজ লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলিরও কোন অভাব দেখা যায় না। সর্বোপরি শীর্ণদেহীরা ফিরে পায় নীরোগ আদর্শ স্বাস্থ্য।

□ বাড়তি ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেণ্ট খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

● লিভার তার estrogen হরমোন-মাত্রা যথাযথ রাখতে পারে। (এই estrogen-মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার সঙ্গে মেয়েদের স্তন-ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব জড়িত।)

□। শতকরা ৮০ ভাগ ডায়াবেটিস রোগী ১-৩ মাসের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

● অবিচলিতভাবে এই ডায়েট গ্রহণে ২ বছরের মধ্যেই ধমনীগত সমস্ত হৃদবৈকল্য (atherosclerosis) দূরীভূত হয়।

□। এইভাবে শুধু হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস নয়, আদর্শ আহার্য ও স্বাভাবিক দেহচর্চা থেকে পাওয়া বিশুদ্ধ অব্যাহত অক্সিজেন-সম্পন্ন রক্তপ্রবাহের কল্যাণে অকালে জীবননাশী প্রায় সমস্ত প্রধান ডিজেনারেটিভ তথা বিপাকীয় রোগের সার্থক নিবারণ, প্রশমন ও নিরাময় হয়।

---

* স্বাস্থ্যলাভে আগ্রহী অনেকেই নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন বা পঞ্জিকা মিলিয়ে মাঝে মাঝেই উপবাস করেন। এতে কাজ হয়। কেননা উপবাসের ফলে রক্তে জমে-যাওয়া দূষিত পদার্থ খুব তাড়াতাড়ি বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু মাত্রাধিক উপবাস করলে রক্তের দূষিত পদার্থের সঙ্গে দরকারী ভিটামিন ও মিনারেলগুলিও বর্জিত হয়। যার ফলে দেহে ভিটামিন তথা খনিজ লবণের অভাব দেখা দেয়।

প্রিটিকিন ডায়েটে উপবাস ছাড়াই, উপবাসের আসল উদ্দেশ্যকে—অর্থাৎ দেহের অধিবিষ বা toxin নিষ্কাশনকে সর্বার্থে সার্থক করে তোলে।

কোন্ কোন্ রোগে প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অব্যর্থ ?

(আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত)

বিভিন্ন ডিজেনারেটিভ রোগের নিবারণ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রিটিকিন প্রোগ্রামের সার্থকতা নিরূপণে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের স্ব স্ব গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রকাশ করেছেন সন্তোষজনক অভিমত। Dr. Hugh Trowell, OBE, M. D., F. R. C. P. এঁদের মধ্যে অন্যতম।

Dr. Trowell ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে উগাণ্ডার ম্যাকেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। অতঃপর ১৯৭৭ সালে তিনি আমেরিকান সিনেট নিয়োজিত 'মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও পুষ্টি'-সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তবে Dr. Trowell-এর আন্তর্জাতিক সুনাম তাঁর গবেষণালব্ধ বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য। গ্রন্থগুলির মধ্যে Kwashiorkor, Non-Infective Disease in Africa, Refined Carbohydrate Foods and Disease প্রভৃতি অন্যতম।

প্রিটিকিন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিজেনারেটিভ রোগের নিবারণ ও নিরাময় প্রসঙ্গে Dr. Trowell বিভিন্ন গবেষকদের অনুসন্ধান ও মন্তব্য তথা নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকাশ করেছেন এক মূল্যবান তালিকা :

(ক) **প্রিটিকিন প্রোগ্রাম যে-সমস্ত ডিজেনারেটিভ রোগের সম্পূর্ণ নিবারণ এবং সম্পূর্ণ নিরাময়ে ষোল আনা সফল সেগুলি হল :**

অ্যানজাইনা পেকটোরিস।

অ্যাথেরোসক্লেরোসিস ও তার সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপসর্গ—হাইপার-কোলেসটেরোলেমিয়া (কোলেসটেরল-মাত্রাবৃদ্ধি) এবং হাইপার-ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া (ট্রাইগ্লিসারাইডস বা রক্ত-ফ্যাটের মাত্রাবৃদ্ধি)।

হাই ব্লাডপ্রেশার।

ইসকেমিক হৃদরোগ ও তার সমস্ত উপসর্গ।

ডায়াবেটিস মেলিটাস (প্রাথমিক বা চূড়ান্ত অবস্থায়)।

মেদ-বৃদ্ধি (obesity)।

ওজন বৃদ্ধি।

রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস।

স্পনডিলাইটিস (অ্যাঙ্কাইলোসিং)।

সেনাইল ডিমেনশিয়া (অ্যাথেরোসক্লেরোটিক)।

পেরিফেরাল ভ্যাসকুলার রোগ (অ্যাথেরোমেটস)।

কোষ্ঠকাঠিন্য।

(খ) **প্রিটিকিন প্রোগ্রাম যে-সমস্ত রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সেগুলি হল :**

বাতব্যাধি।

অর্শ।

হার্নিয়া (হায়াটাস)।

আলসার।

কোলাইটিস (ক্ষতযুক্ত)।

গল স্টোন বা পিত্তপাথরী। এছাড়া

গলগণ্ড, নিওপ্লাজম ও অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগত রোগ।

ব্রংকাইটিস।

প্লুরিসি।

হাঁপানী।

নিউমোনিয়া।

এমফিসিমা।

মিক্সিডেমিয়া।

প্রসটেট গ্রন্থির রোগ।

পারনিসাস অ্যানিমিয়া ও প্রাসঙ্গিক ক্ষয়।

ডিপ-ভ্যেন থ্রমবোসিস এবং পালমোনারি এমবোলিজম।

মাল্টিপল স্কেল্‌রোসিস।

অসটিও-আরথ্রাইটিস।

ডাইভারটিকুলার রোগ।

হাইপার-ইউরেমিয়া।

সেনাইল অসটিও-পোরোসিস।

ভেরিকোজ ভ্যেনস।

থাইরো-টকসিকোসিস (প্রাইমারি).।

অ্যাডিসন রোগ।

থাইরয়ডিটিস।

ক্রনস রোগ।

(গ) উল্লিখিত রোগগুলি ছাড়াও প্রিটিকিন প্রোগ্রাম অনুসারী আরও যে-সব রোগ থেকে চিরজীবন মুক্ত থাকতে পারেন সেগুলি হল :

সর্ববিধ ক্যানসার।

পাকস্থলীর নানা রোগ।

কিডনি ও লিভারের বিবিধ রোগ।

ইডেমা।

প্রস্রাব-সংক্রান্ত রোগ।

জননেন্দ্রিয়-সংক্রান্ত রোগ।

চর্মরোগ।

নানাবিধ শ্রবণ-সমস্যা।

ছানিপড়া।

গ্লুকোমা।

বিবিধ দৃষ্টি-সমস্যা।

দন্তক্ষয় ও দাঁতের বিভিন্ন রোগ।

চুল ওঠা।

নিউরোসিস।

সুরাপানের বিষক্রিয়া।

মাথাধরা।

বিষন্নতা।

লাবণ্যহীনতা।

অকাল-বার্ধক্য।

□ আজকাল রোগীরা অনেক বেশি সচেতন। 'রোগ হয়েছে, ভোগ তো হবেই, ওষুধ খাচ্ছি'—এ ধরনের ঔদাসীন্য আর নেই বললেই চলে। এখন তাঁরা যথাসম্ভব আগ্রহ সহকারে নিজেদের রোগ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে চান। তবে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেন ইংরেজিতে। আর পাণ্ডু রোগের বদলে জনডিস বললেই আমরা বুঝি ভালো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বিভিন্ন রোগের ইংরেজি নামগুলিই মূলত ব্যবহার করা হল।

সূত্রাবলী

১. M. Winitz (1970) *Amer. J. Clin, Nutr*/23

২. Atheroslerotic Vascular Disease. H. K. Hellerstein

৩. Increased cell agglutination following ingestion of fat, a factor contributing to cardiac ischemia, coronary insufficiency & anginal pain. A. V. Willum (1957). *Angiology* 8 : 29.

৪. K. Lund—Oleson (1970) *Arthritis Rheumatoid*/13

৫. Preliminary report of the effect of smoking on size of visual fields. Johnson (1965) *Life Sc*/4

৬. Oxygen for deafness : H. Miyake (1973) *Med. Tribune.*

৭. Retaining memory in older people : E. Jacobs (1972.) *Sci. News.* 101 : 188-89

৮. The Prime cause and prevention of Cancer. : O. Warburg : *National Cancer Institute*, Bethesda, Md.

৯. Blood lipid and Uric acid interrelationships. D. Berkowitz (1964) : *J. A. M. A*, 190 : 856-58.

১০. A. P. Hall (1967) : *Amer. J. Med* 42 : 27.

১১. J. P. Felber & A. Vannotti (1964), *Med. Exp.* 10.

১২. J. S. Sweeney (1927) : *Arch. Int. Med.* 40 : 818-30

১৩. Effect of the high carbohydrate, low-calorie diet upon carbohydrate tolerance in Diabetis mellitus : I. M. Robinowitch (1935) : *Canad. Med. Assos. J.* : 33

১৪. Low fat diet and therapeutic doses of insulin in Diabetes mellitus : I. Singh (1955) : *Lancet*, 1 : 422-25.

১৫. The New Health Revolution : Ross Horne (1983)

১৬. A. R. P. Walker (1970) : *Lancet* : II : 51

১৭. Sinnett (1969) *J. A. M. A.* 270 : 1687-88

১৮. বেশি খাওয়াও কি ক্যানসারের কারণ হতে পারে ? সমরজিৎ কর : দেশ

১৯. আরোগ্য দিগ্‌দর্শন : মহাত্মা গান্ধী।

২০. The Art of Living : M. K. Gandhi.

২১. টক দই আর মিষ্টি দই : মনীষা ভট্টাচার্য : পরিবর্তন,, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫।

২২. তদেব।

২৩. দইয়ের চমক : অমিয়কুমার সরকার : আনন্দবাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), ২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

২৪. Time, March 26, (1984)

২৫. The Pritikin Pragram for Diet and Exercise : N. Pritikin & P. M. Mc Grady. Jr. (1981)

২৬. Beveridge (1956). Canad. J. Bio & Phys. 34 : 441

২৭. Effect of unsaturated fats upon lipemia & conjunctival circulation : M. Friedman (1965) JAMA 21 : 145-52.

২৮. The effects of unsaturated fats on absorption, excretion, synthesis & distribution of cholesterol in man. S. T. Grundy (1970) : J. Clin. Invest. 49 : 1135-53.

২৯. কী খাবেন ? কতখানি খাবেন ? : বিনতা রায়চৌধুরী : পরিবর্তন, ২৫ সেপ্টেম্বর; ১৯৮৫

৩০. The Pritikin Program for Diet and Exercise : N. Pritikin & P. M. Mc Grady. Jr. (1981)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

□ Pritikin Promise : 28 days to a longer healthier life : Nathan Pritikin (1983).

□ The Pritikin Program for Diet and Exercise : N. Pritiikin & P. M. McGrady. Jr. (1981)

□ খাদ্য ও পুষ্টি : ডঃ নারায়ণী বসু।

□ Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institute of Nutrition, I. C. M. R,1979.

□ আমাদের খাদ্য : ডাঃ নীলরতন ধর।

□ I. C. M. R. Reports.

□ Food Value Chart : Indian Council of Medical Research.

□ ভাইটামিন : ডাঃ রুদ্রেন্দু পাল।

□ আহার ও আহার্য : ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য।

□ The New Health Revolution : Ross Horne (1983)

□ Health facts prove Pritikin progam. : Ross Horne (1984)

□ Blood Viscosity in Heart Disease and Cancer 1981) : Dr Leopold Dintenfas.

□ Aerobics (1968) : Dr. K. Cooper.

□ Old Age Deferred : Arnold Lorand.

প্রিটিকিনী রান্না

Christchurch
NEW ZEALAND.

প্রিয় শ্রী সেনগুপ্ত,

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম নিয়ে 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো সাগ্রহে পড়েছি। শুনে খুশী হবেন, প্রায় এক বছর ধরে আমরা প্রিটিকিন অনুসারী।

প্রিটিকিনী রান্নার রেসিপির কথা লিখেছেন। প্রথমটায় আমিও Longevity Center-এর নির্দেশমত বিদেশী উপাদান দিয়ে বিদেশী ধরনে প্রিটিকিনী রান্না করেছি। কিন্তু জানেন তো আপনাদের ডঃ সেন কী ভয়ংকর খাদ্যরসিক! একটানা ঐ বিদেশী রান্না, উনি খাবেন? চাই সফেন ঝরঝরে ভাত, চাই ছোলার ডাল, কপির তরকারি, রাই দিয়ে মাছ। শুধু তাই নয়, প্রতিটি রান্নাও হওয়া চাই তেল-ঘি-চিনি-ছাড়া প্রিটিকিন-সম্মত।

শেষে তাই হল। বহু experiment, observation, inference-এর গণ্ডী পেরিয়ে তৈরি হল প্রিটিকিনী পদ্ধতিতে ষোল আনা বাঙালী রান্না।

আপনার অনুরোধ মতো আমার তৈরি একগুচ্ছ রেসিপি পাঠালাম। সেই সঙ্গে মুদ্রণের অনুমতি! আশা করি পাঠিকাদের এই রেসিপিগুলো খুব কাজে লাগবে। এবং ওঁদের মাধ্যমেই প্রিটিকিন ডায়েট পৌঁছে যাবে দেশের ঘরে ঘরে।

মানসী সেন

'সিদ্ধ' নয়, প্রসিদ্ধ প্রিটিকিনী রান্না

---

* চিহ্নিত রেসিপিগুলি লিখেছেন শ্রীমতী অপর্ণা সেনগুপ্ত।

বাঙালীর প্রিটিকিনী রান্না

প্রিটিকিনী রান্নার মূল কথাটি হল রান্নায় তেল-ঘি-চিনি অল্প মাত্রায় নয়, পুরোপুরি বর্জন। আর নুনের ব্যবহার অনুমোদিত পরিমাণে (সর্বমোট জনপ্রতি প্রত্যহ ৩-৪ গ্রাম)।

বস্তুত, তেল-না, ঘি-না, মিষ্টি-না, স্বল্প-নুন প্রিটিকিনী রান্না বললে এককথায় আমরা বুঝি 'সিদ্ধ'। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করেও রান্নাটি করা করা যায় সুস্বাদু, লোভনীয়।

অভ্যস্ত রান্নার থেকে প্রিটিকিনী রান্নার আর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, শুধু এক্ষেত্রে রান্নাতে তেল-ঘি-চিনি বাদ দিয়ে, নুন কমিয়ে, পক্ষান্তরে base হিসাবে নানাবিধ মশলা, লেবুর রস, দই প্রভৃতি দিয়ে সুস্বাদু রান্নার আয়োজন। এখানে রান্নার যে-সমস্ত প্রণালী বলব তার সবগুলিই হল প্রচলিত বাঙালী রান্নাকে প্রিটিকিনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কীভাবে সুস্বাদু করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। আপনারা নিজেরাও এগুলি থেকে একটা প্রাথমিক ধারণা করে নিয়ে, পরীক্ষা করে, পছন্দমত খাবার তৈরি করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, অভ্যস্ত রান্নার থেকে মুখ বদল করে প্রিটিকিনী রান্নার সম্পূর্ণ স্বাদ পেতে গেলে কয়েকদিন সময় লাগবে। কিন্তু কিছুদিন পর শাক-সব্জি-ফল প্রভৃতির যে স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ আছে তার আস্বাদ পেলে পুরনো রান্নায় ফিরে যেতে আর মন চাইবে না। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, শুরুতে দিন ৮-১০ একটু অস্বস্তি হয়ে ছিল কিন্তু পরে এ-রান্না খাওয়াটা এমনই অভ্যেস হয়ে গেল যে এখন মুখ বদলাতেও ২-১ দিনের বেশি পুরনো ধরনের রান্না আমরা খেতে পারিনা। আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, আপনাদেরও এই একই অভিজ্ঞতা হবে।

তবে প্রাথমিকভাবে প্রিটিকিন ডায়েট আহারীরা সপ্তাহে ৫-৬ দিন প্রিটিকিন পথ্য খেয়ে ২-১ দিন মুখ বদলাতে অ্যানটি-প্রিটিকিন রান্না খেতে পারেন। তাছাড়া মাঝে মধ্যে বিয়ে বাড়ি বা অন্যান্য উৎসবে একটু নিয়মভঙ্গ করা যেতেই পারে।

প্রিটিকিনী রান্না প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ জরুরী কথা

১। প্রিটিকিন ডায়েট আহারীরা রাতারাতি নুন খাওয়া ছেড়ে দেবেন না। ধীরে ধীরে নুন গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে অনুমোদিত পরিমাণে নিয়ে আসুন।

২। প্রিটিকিনী রান্নায় কোন কিছুই তেলে ভেজে নিতে হয় না, রান্না করতে সময় এবং খরচ তুটোই কম পড়ে তবে একটি প্রেসার কুকার ও একটি নন-স্টিকিং ফ্রাই প্যান এজন্য বিশেষ প্রয়োজন।

৩। দই-টা এ রান্নায় প্রায়ই লাগে। বাড়িতে স্কীমড মিল্কের দই করে নেবেন অথবা নিরুপায় হলে দোকানের টক দই ব্যবহার করবেন। ক্ষতিকারক মিষ্টি দই প্রিটিকিন নিষিদ্ধ।

৪। আমরা এমনিতেই ভাতের পাতে প্রায় সময়ই লেবু, কাঁচালংকা মেখে খাই। প্রিটিকিনী রান্নাও লেবু-কাঁচালংকা দিয়ে খেলে, খেতে আরও সুস্বাদু হবে।

৫। প্রায় রান্নাতেই গুঁড়ো মশলা ব্যবহারের কথা থাকবে। যাঁরা রাটা মশলা ব্যবহারের অভ্যস্ত তাঁরা সমপরিমাণে বাটা মশলা-ই ব্যবহার করবেন। গুঁড়ো মশলাও ব্যবহার করার আগেও সামান্য জলে ভিজিয়ে নেবেন। জিরে, ধনে ইত্যাদি যদি গুঁড়ো না বলা থাকে তবে গোটা বুঝতে হবে।

৬। মাংস, মাছ প্রভৃতি রান্নায় গরম মশলা ব্যবহার করলে খুবই ভালো হয়। অন্যান্য রান্নায় যদি গরম মশলা না দেন তবে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা একটু বেশি দেবেন।

৭। যে-সমস্ত সব্জি ব্যবহারের কথা থাকবে যদি সব সময় তা পাওয়া না যায় তাহলে নিজেরা বিবেচনা করে তার কোন close substitute ব্যবহার করবেন। যেমন পেঁয়াজকলির বদলে শুধু পেঁয়াজকুচি অথবা টমেটোর বদলে ভিনিগার বা পেঁয়াজকুচি আর লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন।

৮। দেশী রান্নায় garnishing অর্থাৎ রান্নার পর পরিবেশনের আগে তার উপর মশলা বা অন্য কিছু ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি খুব একটা নেই। কিন্তু garnish করে পরিবেশন করলে দেখতে ভারি সুন্দর লাগে আর খেতে আরও সুস্বাদু হয়। সেজন্যে বেশির ভাগ প্রিটিকিনী রান্নাতেই garnishing অন্তর্ভুক্ত।

●

সকালের খাবার / জলখাবার

১। আটার পাঁউরুটি (মাখনের বদলে উপরে স্কিমড মিল্কের ছানা দিয়ে, গোলমরিচ / খেজুরের ছোট ছোট টুকরো / ২-৪টি কিসমিস ছড়িয়ে)+কলা/আপেল+স্কিমড মিল্ক।

২। ছাতু/চিঁড়ে/মুড়ি+স্কিমড মিল্ক+কলার টুকরো +২-৪টি খেজুর।

৩। সুজি ঃ শুকনো কড়াইতে প্রথমে সুজি ভেজে নিন। তারপর তাতে পরিমাণমত স্কিমড মিল্ক মিশিয়ে দিন। চিনির বদলে কলা টুকরো করে কেটে দেবেন। সঙ্গে ২-৪টি কিসমিস বা খেজুর দিলে খুব ভালো হয়।

৪। পাঁউরুটি+স্কিমড মিল্ক+কলা (পাঁউরুটি টোস্ট করে গরম স্কিমড মিল্কের মধ্যে দিয়ে সঙ্গে কলা স্লাইস করে কেটে দিন)।

৫। তুষ-যুক্ত আটার রুটি+আলুর দম বা অন্য কোনো আলু-লালিত খাবার।

আলুর দম—১ (৪-৫ জনের জন্য)

৬টি মাঝারি আলু
¾ পেয়ালা মটরশুঁটি
৩টি মাঝারি পাকা টমেটো
½ চা-চামচ সরষে
২ চা-চামচ আদা বাটা
১-৩টি শুকনো লংকা
১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
½ পেয়ালা গরম জল
২ টেবিল-চামচ লেবুর রস
১ চা-চামচ গরম মশলা
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
৩ টেবিল চামচ টক দই (স্কিমড মিল্ক দিয়ে ঘরে তৈরি)
½ চা-চামচ জিরে
২ টি কাঁচালংকা কুচি (প্রয়োজনে ¼ চা-চামচ নুন)

● আলুগুলো খোসা না ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ হলে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন।

মটরশুঁটি আলাদা সিদ্ধ করে নিন। এবাব বাসনে টমেটো টুকরো করে কেটে তাতে ¼ পেয়ালা জল দিয়ে নেড়েচেড়ে মাখা-মাখা করে নিন। প্রয়োজন হলে বেশি জল দেবেন। সরষে, জিরে, আদা, শুকনো লংকা দিয়ে ৩-৪ মিনিট নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন। ধনে ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে ৩-৪ মিনিট আরও নেড়ে নিন। এবার আলুর টুকারাগুলো আর মটরশুঁটি দিয়ে ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ½ পেয়ালা গরম জল দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে একটু বেশি জল দেবেন। মিনিট ১০-১৫ পরে নামিয়ে নেবেন।

বেশ ঘন ঝোল থাকবে। এবার লেবুর রস, গরম মশলা আর গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন।

একটা শুকনো কড়াইয়ে জিরে ভেজে নিয়ে, গুঁড়ো করে নিন। দইটা ফেটিয়ে নিয়ে, জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে আলুর দমের উপর ঢেলে দিন। সবশেষে কাঁচালংকা কুচি উপরে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।

আলুর দম—২ (৪-৫ জনের জন্য)

৬টি মাঝারি আলু
¾ পেয়ালা মটরশুঁটি
২টি পাকা টমেটো (৪ টুক্‌রো করে কাটা)
২ চা-চামচ আদা বাটা
১/২টি শুক্‌নো অথবা পাকা কাঁচালঙ্কা
১ চা-চামচ গরম মশলা
২ কোয়া রসুন বাটা
২টি বড় পেঁয়াজ, বাটা
২টি কাঁচালঙ্কা কুচি
¾ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২০০ গ্রাম টক দই—(স্কিমড মিল্ক দিয়ে ঘরে তৈরি)
প্রয়োজনে ¾ চা চামচ নুন
১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
২টি তেজপাতা
১ চা-চামচ জিরে ও ১টি শুক্‌নো লঙ্কা গুঁড়ো চাটুতে নেড়ে ভেজে গুঁড়ো করা

● আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে মাঝামাঝি ২ টুক্‌রো করুন। টুক্‌রোগুলো লম্বা হবে না, মাঝারি করে কাটা হবে। দই ভাল করে ফেটান। আলুগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে লবণ, দই,

মটরশুঁটি, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ২টি লঙ্কার কুচি হলুদ ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ১ ঘণ্টা মেখে রাখুন। প্রেসার কুকার চাপিয়ে আধকাপ গরম জল দিন এবং ঐ গরম জলে টমেটোর টুকরোগুলো, রসুন বাটা ও তেজপাতা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। টমেটোগুলো নরম হলে মশলা-মাখা আলুগুলো ঢেলে দিয়ে নেড়ে নেড়ে দিন। ১ কাপ গরম জল দিয়ে প্রেসার দিন। ৫ মিনিট হলেই নামিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে প্রেসার খুলে গরম থাকতে থাকতে গরম মশলা গুঁড়ো, ভাজা জিরে ও লঙ্কা গুঁড়ো উপর ছড়িয়ে দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে রাখুন। খাওয়ার করার সময় গরম গরম পরিবেশন করবেন।

আলুর চাট (২-৩ জনের জন্য)

৬-৮টি ছোট আলু
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
½ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
১টি বড় পেঁয়াজ কুচি
¼ পেয়ালা পুদিনা পাতা কিম্বা ধনেপাতা কুচি
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

● আলু সিদ্ধ করে টুকরো করে কেটে নিন। কড়াইতে পেঁয়াজ-কুচি ২ টেবিল চামচ জলে নেড়ে নরম করে নিয়ে আলুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। জিরে, লংকা, গরম মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর লেবুর রস দিন। পুদিনা পাতা কিম্বা ধনে পাতা কুচি উপরে ছড়িয়ে দেবেন।

আলু পাঁপড়ি (২-৩ জনের জন্য)

১০-১২টি ছোট আলু (অথবা ৬টি মাঝারি আলু)
১ টেবিল চামচ তেঁতুল
$\frac{1}{4}$ পেয়ালা গরম জল
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
$\frac{1}{2}$ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
$\frac{1}{2}$ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
$\frac{1}{2}$ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
$\frac{3}{4}$ পেয়ালা টক দই
২টি পাঁপড়
১চা-চামচ পাঁচফোড়ন
$\frac{1}{2}$ পেয়ালা ছোলা কিংবা কাবলি ছোলা*

● আলু সিদ্ধ করে গোল গোল পাতলা করে কেটে নিন। তেঁতুল, গরম জলে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে, জলটা ছেঁকে নিন। ছোলা আলুর মধ্যে দিন। জিরে, লংকা, গোলমরিচ, গরম মশলা আলুর সঙ্গে মেখে নিন। এরপর তেঁতুলের জলটা দিন। পাঁপড় সেঁকে ছোট ছোট টুকরো করে আলুর ওপর ছড়িয়ে দিন। দইটা ফেটিয়ে এর ওপর ঢেলে দিন। পাঁচফোড়ন শুকনো কড়াইয়ে ভেজে গুঁড়ো করে দই-এর ওপর ছড়িয়ে দিন।

* ছোলা আগের দিন সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখবেন। কাবুলি ছোলা ব্যবহার করলে ভেজানোর পর সিদ্ধ করে নরম করে নিলে ভালো হয়।

শুখে আলু (৪-৫ জনের জন্য)

৬টি মাঝারি আলু
৩-৪টি পেঁয়াজ কুচি
½ চা-চামচ আদা কুচি
৪টি টমেটো
২-৩টি কাঁচা লংকা
½ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
½ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
(প্রয়োজনে ১ছিটে নুন)

● আলু সিদ্ধ করে টুকরো করে কেটে নিন। কড়াইতে ৪ টেবিল চামচ জল দিয়ে পেঁয়াজ, আদা আর টমেটোর টুকড়ো নেড়েচেড়ে নরম মাখামাখা করে নিন। এবার কাঁচালংকা, ধনে জিরে দিয়ে আরও ২-৩ মিনিট নেড়েচেড়ে নিন। গোলমরিচ গুঁড়ো ও লেবুর রস উপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

□ আলুর বিবিধ রান্না প্রসঙ্গে আলু সম্পর্কে একটু বলা দরকার।

আলু খাওয়া—মোটা হওয়া

আজকাল 'ওল খেওনা—ধরবে গলা'-র মতো 'আলু খাওয়া—মোটা হওয়া'—এই ব্যাপারটিও প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু আলু খেলে মোটা হয় এটা একটা রীতিমত ভুল ধারণা। আপনি যদি প্রকৃতিজাত কারবোহাইড্রেট, যেমন—আলু আর রুটি, শুধুমাত্র এ-দুটি খাদ্যেরই কোনো ডায়েট গ্রহণ করেন তাহলেও মেদভার বা বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলতে পারবেন।

নানাভাবে সরাসরি আলু খেলে মেদ জন্মাবার কোনো কারণ নেই আসলে আলু খেতে গিয়ে তার সাথে তেল, ঘি প্রভৃতি যে-সমস্ত স্নেহপদার্থ যোগ করি সেই সব স্নেহ-ই মেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তেল-ঘি প্রভৃতি বাদ দিলে আর সে ভয় থাকেনা। বস্তুত, আলু এমনই একটি চমৎকার সুষম খাদ্য যার মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান।

ফ্রায়েড্ রাইস্ (২জনের জন্য)

১ চা-চামচ আদা কুচি
অথবা ½ চা-চামচ আদা বাটা
½ চা-চামচ সরষে গুঁড়ো
১ কাপ গাজর, সরু সরু লম্বা করে কুচানো
১ কাপ পেঁয়াজ কুচি
১ কাপ ফুলকপি, ছোট ছোট টুকরো করা
১ টেবিল চামচ টমেটোর সস্
২ কাপ সরু চালের ভাত
½ কাপ রান্নাকরা মুরগির মাংসের টুকরো (ইচ্ছে হলে)
⅓ কাপ কিস্‌মিস্ (ইচ্ছে হলে)
গরম মশলা গুঁড়ো (১টি দারুচিনি, ৪টি লবঙ্গ, ৩টি ছোট এলাচ)

● একটি বড় সস্‌প্যানে ½ কাপ জলে আদা বাটা ও সরষে গুঁড়ো দিয়ে আঁচে বসিয়ে মিশ্রনটি ফুটিয়ে নিন। এবার সব্‌জিগুলো সব ঢেলে দিয়ে অল্প আঁচে পরিমাণ মতো জল দিয়ে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন (১০-১৫ মিনিট সময় লাগবে)। টমেটোর সস্ এবং ২কাপ ভাত দিয়ে সব্‌জি আর মশলার সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে নরম করে নিন।

পরে ইচ্ছে হলে মুরগির মাংসের টুকরোগুলো আর কিস্‌মিস্ তৈরি ফ্রায়েড্ রাইসের মধ্যে দিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে দিন। এবার নামিয়ে গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

অরেঞ্জ রাইস্ (৪ জনের জন্য)

৩/৪ কাপ পেঁয়াজ কুচি, খুব সরু করে কাটা

১/৩ কাপ পেঁয়াজ কলিকুচি

২ কাপ সরু চালের ভাত

১/৪ কাপ কমলালেবুর রস

২ চা-চামচ পুদিনা বাটা

১১/২ চা-চামচ পেঁয়াজ বাটা

পরিমাণ মত কমলালেবু কোয়ার টুক্‌রো (cut in a half)

● একটি মাঝারি পাত্রে ১/৩ কাপ জল নিয়ে ফোটান। ঐ জলে পেঁয়াজ কুচি ও পেঁয়াজকলি দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে-চেড়ে মাখামাখা করে নিন (যতক্ষণ পর্যন্ত না নরম হয়) এবং জলটা শুকিয়ে ফেলুন। সিদ্ধ ভাত ঐ পাত্রে দিয়ে ২ মিনিট চামচের পিছন দিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করুন যাতে ভাতগুলো আলগা হয়ে যায়। এবার কমলালেবুর রস ঢেলে দিয়ে আবার ২ মিনিট নেড়েচেড়ে পুদিনা বাটা ও পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভাতের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে একটি ছড়ান পাত্রে (বেকিং ডিস্) নামান। কমলালেবুর টুকরাগুলো রান্নাভাতের চারপাশে সাজিয়ে ঢেকে দিয়ে ১৫ মিনিট আঁচ কমিয়ে বসিয়ে রাখুন। গরম নরম পরিবেশন করুন। টমোটার সস্ দিয়ে খেতে উপাদেয়।

ডালের সুপ (৪-৫ জনের জন্য)

পেয়ালা মসুরির ডাল

১টি পেঁয়াজ কুচি

১ চা-চামচ আদা কুচি

২টি তেজপাতা

৬-৮টি কারিপাতা

২টি মাঝারি টমেটো, টুকরো করে কাটা

½ পেয়ালা পেঁয়াজকলি কুচি

৬ পেয়ালা জল

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো,

২ টেবিল চামচ লেবুর রস, (প্রয়োজনে ১ ছিটে নুন)

কয়েকটি লেবুর টুকরো, পাতলা গোল করে কাটা

● ডাল ধুয়ে একঘণ্টা মতো ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। জল ঝরিয়ে, একটা সস্‌প্যানে লেবুর রস, লেবুর টুকরো আর গোলমরিচ ছাড়া, অন্য সব কিছু দিয়ে, জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ জলে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিন। এবার ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন। যেটুকু ছাঁকনিতে থাকবে সেটা রেখে দেবেন। যদি মনে হয় সুপটা বেশি ঘন হয়ে গেছে, একটু জল মিশিয়ে নেবেন। পাতলা ডালের মত হবে।

পরিবেশন করার আগে ঝাঁকনিতে যতটুকু ছিল সেটা সুপের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে গরম করুন। গরম হলে লেবুর রস আর গোলমরিচ দিন। ছোট ছোট আলাদা বাটিতে দুটি করে লেবুর টুকরো দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ডাল-সব্‌জি সুপ (৫-৬ জনের জন্য)

১ পেয়ালা মসুরির ডাল

৬ পেয়ালা জল

২ চা-চামচ আদা কুচি

১টি পেঁয়াজ কুচি

৩ পেয়ালা মেশানো সব্জি খুব টুকরো করে কাটা

২টি টমেটো

২টি তেজপাতা

৫-৬টি কারিপাতা

½ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক

২ টেবিল চামচ লেবুর রস

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো,

কটি লেবুর টুকরো পাতলা গোল করে কাটা

(প্রয়োজনে ১ ছিটে নুন)

● ডাল ধুয়ে এক ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর আদা আর পেঁয়াজ দিয়ে জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। ডাল মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসে সব সবজি ও তেজপাতা, কারিপাতা ডালের মধ্যে দিন। সিদ্ধ করার সময় মাঝেমাঝে নেড়ে মিশিয়ে নেবেন। সবজি-গুলো ভালো সিদ্ধ হয়ে নরম হয়ে এলে আবার নেড়ে মিশিয়ে নিন। এবার ছাঁকনিতে একটা হাতা কিম্বা বড় চামচের পেছন দিয়ে চেপে চেপে ছেঁকে নিন। ছাঁকনিতে যতটুকু থাকবে রেখে দেবেন।

পরিবেশন করার আগে ছাঁকনিতে যেটুকু ছিল সেটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার ½ পেয়ালা দুধ স্যুপের মধ্যে দিয়ে গরম করুন। গোলমরিচ দিন। আঁচ থেকে নামিয়ে লেবুর রস দিন। আলাদা ছোট মোট বাটিতে ঢেলে, ২ টুকরো করে লেবু দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ডালের স্পেশাল স্যুপ

৫ কাপ সব্‌জির স্টক অথবা জল
১ কাপ মসুর ডাল
১ টি পেঁয়াজ, মিহি করে কুচি
কয়েকটি পেঁয়াজকলি কুচি
১টি গাজর কুচি
১টি রসুন কোয়া, মিহি করে বাটা
১টি ছোট কাঁচালংকা, মিহি করে কুচি
১টি ছোট আলু, (খোসা ছাড়ান) ছোট ছোট করে কাটা
২ কাপ টমেটো সস্‌
½ চা-চামচ কারি পাউডার

● সবজির স্টক মুসুর ডাল, পেঁয়াজকুচি, পেঁয়াজকলি কুচি, গাজর, রসুন একত্রে একটি বড় পাত্রে আঁচটা কমিয়ে ঢাকা দিয়ে উপকরণগুলি সিদ্ধ করুন। প্রায় ৩০ মিনিট লাগবে। সিদ্ধ হলে পর

কাঁচালঙ্কা, আলু, টমেটো সস্ এবং কারি পাউডার দিয়ে নেড়ে নিয়ে ঢাকা দিন। যতক্ষন পর্যন্ত না আলুর টুকরোগুলো সিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বাল দিন, ১৫ মিনিট মত সময় লাগবে।

প্রায় ৮ কাপ স্যুপ হবে।

বেগুন-টমেটোর স্টু

১টি বড় বেগুন, খোসা ছাড়ানো এবং ছোট ছোট টুকরো করা

১টি লম্বা কাঁচালঙ্কা কুচি	৪ কাপ টমাটোর রস
১টি বড় পেঁয়াজ কুচি	½ কাপ টমেটো কুচি
৪টি রসুনের কোয়া, কুচি	১½ চা-চামচ লঙ্কার গুঁড়ো
১ কাপ সবজি স্টক্ অথবা জল	(প্রয়োজনে ১ ছিটে নুন)

১ চা চামচ করে রসুন বাটা, কারি পাউডার ও জিরে গুঁড়ো

● একটি বড় পাত্রে বেগুনের টুকরোগুলো, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন, কুচি এবং ১ কাপ সব্জির স্টক রাখুন। মাঝারি আঁচে এগুলো ঢেকে সিদ্ধ করতে দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ক্রমাগত নাড়্তে থাকুন। এবার টমেটোর রস ও অন্যান্য উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করুন। ২৫ মিনিট অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখুন। আঁচ থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। ৬ পেয়ালা মত স্টু হবে।

সব্জির স্টক

বাঁধাকপি, ফুলকপি, কুমড়ো, গাজর, বিন্, টমেটো প্রভৃতি যে সময়ে যে সবজি সুলভে পাওয়া যায় সেগুলি প্রয়োজন মতো নিয়ে ভালো করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে, কুচো কুচো করে কাটুন। ৪-৬ কাপ জল একটি পাত্রে নিয়ে, ফুটিয়ে সব্জিগুলো ছেড়ে ঢাকা দিয়ে দিন। সিদ্ধ হলে পর নামিয়ে রাখুন। তারপর সব্জিগুলো ভালো করে ছেঁকে সিদ্ধ জলটি রেখে দিন। এই সব্জির স্টক্ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করুন।

মসুরের ডাল (৪-৬ জনের জন্য)

১ পেয়ালা মসুরের ডাল
১টি বড়ো পেঁয়াজ কুচি
১ চা-চামচ রসুন কুচি
১ চা-চামচ আদা কুচি
৩ পেয়ালা গরম জল
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ চা চামচ হলুদ (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● ডাল ধুয়ে ভাল করে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। একটা বাসনে চার টেবিল চামচ ডাল দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা অল্প নাড়াচাড়া করে নিন (২ মিনিট)। তারপর হলুদ দিন। এবার ডাল ছেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। গরম জল দিয়ে ঢেকে দিন। অল্প আঁচে বসিয়ে সিদ্ধ করলে, ৩ পেয়ালা জল লাগবে।

Pressure Cooker-এ কিম্বা উনুনে করলে আন্দাজ মত কম-বেশি জলে দেবেন। ডাল সিদ্ধ হওয়ার পরে গরম মশলা আর গোলমরিচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। পরিবেশন করার আগে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, পেঁয়াজকুচি/পেঁয়াজকলি ছড়িয়ে দিলে ভালো হয়।

সবজি ডাল (৪—৫ জনের জন্য)

১ পেয়ালা মসুর/মুগ ডাল
½ ফুলকপি
২০০ গ্রাম বিন
১ পেয়ালা মটরশুঁটি

৩টি বড় টমেটো
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
½ চা-চামচ আদা বাটা
২ টেবিল চামচ লেবুর রস (প্রয়োজনে ১ ছিটে নুন)

● একটা বাসনে টমেটো টুকরো করে কেটে সামান্য জল দিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে একটু নরম করে নিন। আদা, জিরে, গোলমরিচ দিয়ে কয়েক মিনিট নেড়ে নিন। তারপর ডাল আর সব সব্‌জি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে জল দিয়ে ঢেকে দিন। আন্দাজমত জল দেবেন। সিদ্ধ হয়ে গেলে লেবুর রস দেবেন, আর গরম মশলা ছড়িয়ে দেবেন। (অন্য যে-কোন সব্‌জি দিয়ে এই ডাল করা যায়)।

ছোলার ডাল (৪—৫ জনের জন্য)

১½ পেয়ালা ছোলার ডাল
১½ চা-চামচ আদা কুচি
২/৩টি তেজপাতা
১টি ছোট টুকরো দারচিনি
½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
২টি আলু সিদ্ধ
১ টেবিল চামচ তেঁতুল
½ পেয়ালা গরম জল
১টি পেঁয়াজ কুচি ২টি শুকনো লংকা
১টি টমেটো ½ ছোট চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
½ চা-চামচ সরষে, গোটা (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)
½ ছোট চামচ জিরে, গোটা

● চার পেয়ালা জলে ডাল, আদা, তেজপাতা, দারচিনি আর হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করতে দিন। সিদ্ধ হলে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে রাখুন।

আলু সিদ্ধ করে গোল গোল করে কেটে নিন। বেশি পাতলা করে কাটবেন না। তেঁতুল, জলে ভিজিয়ে জলটা ছেঁকে নিন।

কড়াইতে ½ পেয়ালা জল দিয়ে পেঁয়াজকুচি আর টমেটোর টুকরো নেড়েচেড়ে নরম করে নিন। প্রয়োজন হলে একটু বেশি জল দেবেন। পেঁয়াজ ভাজার সময় সরষে, জিরে আর শুকনো লঙ্কা দেবেন। এবার ডাল আর আলু সিদ্ধ দিয়ে মিশিয়ে নিন। গোলমরিচ আর তেঁতুলের জলটা দিন। ৫ মিনিট মত আঁচে বসিয়ে রেখে, ২-৩ বার সাবধানে নেড়ে, আলুগুলো যাতে ভেঙে না যায়, নামিয়ে নিন।

পরিবেশন করার আগে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস দেবেন। কাঁচালংকা কুচি আর কয়েকটা পাতলা পাতলা লেবুর টুকরো ছড়িয়ে দিতে পারেন।

কাবুলি ছোলা (ছোলে) (৪ জনের জন্য)

১ পেয়ালা কাবুলি ছোলা
২টি তেজপাতা
২টি বড় পেঁয়াজ কুচি
২ চা-চামচ রশুন কুচি
২ চা-চামচ আদা কুচি
½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
১ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
২টি বড়ো পাকা টমেটো

২টি কাঁচা লংকা
½ পেয়ালা ধনেপাতা কুচি
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ পেয়ালা টক দই
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● রান্না করার আগের দিন সারারাত কাবুলি ছোলা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভালো হয়। জল ঝরিয়ে ধুয়ে সিদ্ধ করতে দিন। মাথায় মাথায় জল দেবেন। প্রেসার কুকারে ২০ মিনিট লাগবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে তুলে নিয়ে জলটা আলাদা করে রখেবেন। একটা বাসনে টমেটো টুকরো করে কেটে তার সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন আর আদা কুচি দিয়ে সামান্য জলে নাড়াচাড়া করে বেশ মাখামাখা করে নিন। হলুদ দিয়ে অল্পক্ষণ নাড়ুন। ধনে, গরম মশলা, লংকা আর কিছুটা ধনে পাতা দিন। তারপর ছোলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে, সিদ্ধর জলটুকু দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে একটু বেশি জল দেবেন। ছোলা বেশ ভালো নরম হলে নামিয়ে নেবেন। লেবুর রস দিন। পরিবেশন করার আগে টক দই ফেটিয়ে নিয়ে, জিরে গুঁড়ো ছড়িয়ে, ছোলার উপর ঢেলে দিন। ধনেপাতা কুচি উপরে ছড়িয়ে দেবেন।

মেশানো তরকারি (৩ -৪ জনের জন্য)

২টি বড় আলু
১টি মাঝারি বেগুন
২৫০ গ্রাম কুমড়ো
২৫০ গ্রাম বরবটি কিম্বা সিম
৩টি বড় টমেটো
২টি কাঁচা লংকা

½ চা চামচ পাঁচফোড়ন

২টি তেজপাতা

½ চা-চামচ আদা বাটা

১ চা-চামচ ধনে বাটা/গুঁড়ো

½ চা-চামচ জিরে বাটা/গুঁড়ো

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

২ টেবিল চামচ লেবুর রস (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● কড়াইতে টমেটো টুকরো করে কেটে দিয়ে, সামান্য জল দিয়ে (৩ টেবল চামচ) ২ মিনিট নেড়েচেড়ে মাখামাখা করে নিন। পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, আদা, ধনে, জিরে দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে মিশিয়ে নিন। সব সব্জি আর কাঁচালংকা দিয়ে ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে, তারপর গোলমরিচ দিন। আধকাপ জল দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন (২০-২৫ মিনিট লাগবে)। উনুনে কিম্বা প্রেসার কুকারে করলে প্রয়োজনমত কম-বেশি জল দিতে হবে। রান্না হয়ে গেলে লেবুর রস দেবেন।

কপি-মটর কারি (৪ জনের জন্য)

১টি ফুলকপির ফুলগুলি

¼ চা-চামচ সরষে

¼ চা-চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো

১টি কাঁচা লংকা কুচি

১ চা-চামচ অ্যারারুট

১ কাপ মটরশুঁটি সিদ্ধ

২ টেবিল চামচ লেবুর রস (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● ফুলকপির ফুলগুলো সমানভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। সরষেগুলো ফ্রাইং প্যানে নিয়ে আঁচে বসিয়ে নাড়াচাড়া করে

শুক্‌নো ভেজে কোনো পাত্রে ঢেলে রাখুন। এবার একটি পাত্রে ১ কাপ গরম জল করে তাতে সরষে, হলুদ গুড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লংকা কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। জল ফুটতে থাকলে ফুলকপির টুক্‌রোগুলো ছেড়ে, ঢাকা দিয়ে, মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত ফুলকপিগুলো নরম না হয়। প্রয়োজন হলে আরো গরম জল মেশাতে পারেন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তলা ধরে না যায়। এবার একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ জলে অ্যারারুট পেস্ট করে ফুলকপির মধ্যে ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন। খাবারের ঘন ঝোল হাতা দিয়ে তুলে তুলে ফুলগুলোর উপর মাখিয়ে দিন। সিদ্ধ মটরশুঁটি দিয়ে ৪ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। পরিবেশন করার আগে লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন।

ভাত বা রুটির সঙ্গে খেতে খুব উপাদেয়।

কলক্যাননন (৬ জনের জন্য)

৩টি বড় আলু
½ চা-চামচ টমেটো সস্
১টি বাঁধাকপি, কুচানো
½ কাপ গরম স্কিম্‌ড মিল্ক
১ টেবিল চামচ লেবুর রস
২ চা-চামচ পেঁয়াজ বাটা
২ টেবিল চামচ কারিপাতা কুচি (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● একটি বড় সস্‌প্যানে আলুগুলি সিদ্ধ করুন। পরে আঁচ কমিয়ে দিয়ে ৩৫—৪৫ মিনিট খুব নরম হওয়া পর্যন্ত আঁচে রাখুন। সিদ্ধ আলুগুলি পাত্র থেকে বের করে ঠাণ্ডা হতে দিন। একটি বড় পাত্রে ½ কাপ জল দিন। জলটা ফুটলে টমেটোর সস্ দিয়ে ভালো করে

নেড়ে মিশিয়ে দিন এবং কুচানো বাঁধাকপি পাত্রে ঢেলে দিয়ে মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট ধরে বারবার নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না নরম হয়। ঠাণ্ডা আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে চট্‌কে নিয়ে দুধ, লেবুর রস, পেঁয়াজবাটা, ১ টেবিল চামচ কারিপাতা দিয়ে একত্রে মিশিয়ে নিন। ঐ মিশ্রণ বাঁধাকপির মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে একটি মণ্ড প্রস্তুত করুন। মণ্ডটি একটি ছড়ানো পাত্রে ঢেলে রাখুন। পরিবেশনের আগে ঐ মণ্ডটির মাঝখানে একটি চামচের পেছন দিয়ে ১ ইঞ্চি গর্ত করুন। ঐ গর্তে অবশিষ্ট ১ টেবিল চামচ কারিপাতা দিয়ে ভর্তি করুন। গরম গরম পরিবেশন করবেন।

ফুলকপির তরকারি (৪ জনের জন্য)

১টি ছোট ফুলকপি
২টি বড় আলু
১ পেয়ালা মটরশুঁটি
২টি ক্যাপসিকাম (বড় লংকা)
৪টি মাঝারি পাকা টমেটো
½ চা-চামচ জিরে, গোটা
১ চা-চামচ আদা বাটা
২ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
২ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
৩-৪টি কাঁচালংকা, ২টি তেজপাতা
½ চা-চামচ গোলমরিচ
½ টি লেবুর রস (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● আলু, ফুলকপি কেটে রাখুন। টমেটো আর ক্যাপসিকাম টুকরো করে কেটে, জিরে ফোড়ন দিয়ে, অল্প জলে নেড়েচেড়ে নরম করে নিন। তেজপাতা, আদা, জিরে, ধনে, হলুদ দিন। কাঁচালংকা চিরে দিন। কিছুক্ষণ নেড়ে মশলাগুলো মিশিয়ে নিন। ফুলকপি, আলু, মটরশুঁটি দিয়ে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ১ পেয়ালা জল দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে আন্দাজমত কম-বেশি জল দেবেন। নামাবার আগে গোলমরিচ আর লেবুর রস দেবেন।

[আলু পটল ও কিছু নিরামিষ তরকারিও এইভাবে রান্না করা যায়]

চালকুমড়ার ঘণ্ট (৪-৫ জনের জন্য)

১টি মাঝারি চালকুমড়া/লাউ
১০০ গ্রাম পাকা কুমড়া
¼ চা-চামচ লবণ
১ চা-চামচ জিরে
½ পেয়ালা কুচানো ধনেপাতা
১ চা-চামচ আদা বাটা
১ চা-চামচ আটা
২টি তেজপাতা
২টি কুচানো কাঁচালঙ্কা
ভাজা মুগডাল একমুঠো (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● লাউ বা চালকুমড়ার খোসা ছাড়িয়ে বড় টুক্‌রো করে ধুয়ে খুব সরু করে কাটুন। ডেক্‌চিতে সিদ্ধ করে ভালো করে জল ঝরিয়ে রাখুন। ভাজা মুগডালটি আধসিদ্ধ করে নামিয়ে রাখুন। কুমড়ার খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে নিন। আঁচে কড়াই চাপিয়ে জিরে ভেজে আধকাপ জল দিয়ে কুমড়াগুলো ছেড়ে দিন। কুমড়োগুলো নেড়েচেড়ে

জল শুকিয়ে গেলে আদা বাটা, লঙ্কাকুচি, তেজপাতা দিয়ে সিদ্ধ চালকুমড়াগুলো ছেড়ে দিন। বেশ মাখামাখা হলে সিদ্ধ ডালগুলো মিশিয়ে সামান্য আটা দিয়ে নেড়েচেড়ে ধনেপাতা কুচানো ছড়িয়ে দিয়ে নামান।

* লাউ রান্না করলে পাকা কুমড়া দেওয়া চলবে না।

□ লাউপোস্ত বা চালকুমড়া পোস্ত রান্নার পদ্ধতি একই শুধু পাকা কুমড়া, ধনেপাতা কুচানো চলবে না। ভাজা মুগডালের বদলে ৩০ গ্রাম পোস্ত, ২টি কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেটে নিয়ে তরকারিতে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নামাবেন।

সরষো বিন মটর (৪-৫ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম বিন অথবা সিম
১ পেয়ালা মটরশুঁটি
৩ টেবিল চামচ টক দই
২টি কাঁচালংকা কুচি
৩ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি
২ চা-চামচ সরষে বাটা
১ চ-চামচ জিরে গুঁড়ো
২ চা চামচ লেবুর রস
২টি মাঝারি টমেটো
½ চা-চামচ আদা কুচি
½ চা-চামচ জিরে
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● বিন অথবা সিম কেটে মাঝারি টুকরো করে নিন। মটরশুঁটি ছাড়িয়ে রাখুন।

একটি বাটিতে দই, লংকা, ধনেপাতা, সরষে, জিরেগুঁড়ো, লেবুর রস একসঙ্গে ৩ টেবিল চামচ জল দিয়ে মিশিয়ে নিন।

কড়াইতে ¾ পেয়ালা জল দিয়ে টমেটো টুকরো করে কেটে দিয়ে তার সঙ্গে আদা কুচি আর জিরে দিয়ে নেড়েচেড়ে মাখামাখা করে নিন। প্রয়োজন হলে এই সময় একটু বেশি জল দেবেন। এবার বিনগুলো আর মটরশুঁটি দিয়ে ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে নিন। দইয়ের মশলাটা একবার ফেটিয়ে সবজির মধ্যে ঢেলে, মিশিয়ে নিন। ২-৩ মিনিট নাড়ার পর ঢেকে নিন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেবেন। জল শুকিয়ে গেলে আরও একটু জল দিতে পারেন। সিদ্ধ হলে নামিয়ে দিন। বেশ মাখামখা হবে, বেশি ঝোল থাকবে না। গরমমশলা আর গোলমরিচ উপরে ছড়িয়ে দেবেন। রুটি দিয়ে খেতে ভালো লাগবে।

পুঁইশাকের চচ্চরি (৪-৬ জনের জন্য)

২৫০ গ্রাম পুঁই শাক
৩টি মাঝারি আলু
১০০ গ্রাম কুমড়া
১০০ গ্রাম সিম
১টি মাঝারি বেগুন
২ টেবিল চামচ সরষে
¾ চা-চামচ লবণ
৪টি কাঁচালংকা
১ চা-চামচ পাঁচফোঁড়ন
½ চা-চামচ আটা (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)
এক আঁটি ধনেপাতা কুচানো

● খারাপ পুঁইপাতাগুলো বেছে ফেলে দিন। ডাঁটা থেকে ভালো-পাতাগুলো নিয়ে ২ টুকরো করে কাটুন। ডাঁটাগুলো আধ আঙ্গুল

লম্বা করে টুকরো করে নিয়ে মাঝখানে খানিকটা করে চিড়ে দিন। আলুগুলো আড়ভাবে লম্বা পাতলা করে কাটুন। কুমড়া মাঝারি রকম টুক্‌রো করুন। সিমের আঁশ ছাড়িয়ে দু-টুক্‌রো করুন। বেগুনটি চচ্চরি কাটার তরকারিগুলোর সঙ্গে মানানসই করে কাটুন সব তরকারিগুলো ধুয়ে একটি পাত্রে রাখুন। সরষেগুলো ২টি কাঁচালংকা দিয়ে মিহি করে বেটে রাখুন।

এবার আঁচে কড়াই চাপান। কড়াই তেতে উঠলে পাঁচফোড়ন দিয়ে অপর দুটি কাঁচালংকা সহ তরকারিগুলো ছেড়ে ঢাকা দিন। মাঝে মাঝে ঢাকাটা খুলে নাড়াচাড়া করুন। তরকারির জলটা শুকিয়ে গেলে. ¼ চা-চামচ নুন ছড়িয়ে দিয়ে ও এক কাপ গরম জল ঢেলে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট পরে খুলে সরষে বাটা সবটা দিয়ে বেশ নাড়াচাড়া করুন যাতে সরষে বাটা তরকারির সাথে মাখান হয়ে যায়। এইভাবে সিদ্ধ হলে সামান্য আটা দিয়ে নেড়ে মাখামাখা করে নামান। নামানো হলে ধনেপাতার কুচি ছড়িয়ে ঢেকে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

বাঁধাকপির তরকারি (৬ জনের জন্য)

১টি বড় পেঁয়াজ কুচি
১ কোয়া রসুন কুচি
১ চা-চামচ আদা কুচি
৪টি টমেটো
২টি মাঝারি আলু (সিদ্ধ করে টুকরো করা)
১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
¾ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
½ বড় বাঁধাকপি (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● একটা বাসনে ৪ টেবিল চামচ জল দিয়ে পেঁয়াজকুচি২ মিনিট নেড়েচেড়ে নিন। আদা, রসুন দিয়ে ১ মিনিট আরও নেড়ে নিন। তারপর টমেটো টুকরো করে কেটে দিন, হলুদ আর লংকা দিন। বেশ মাখামাখা মত হলে সিদ্ধ আলুর টুকরোগুলে ও বাঁধাকপি কুচো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। ঢেকে দিন। রান্নার সময় দেখবেন যেন তলা না ধরে যায়।

আলু পোস্ত (৪-৬ জনের জন্য)

৬টি মাঝারি আলু
৫০ গ্রাম পোস্ত
৪টি কাঁচালংকা
১ চা চামচ জিরে
২টি তেজপাতা
১ চিম্‌টে নুন

● খোসা ছাড়িয়ে আলুগুলি ছোট ছোট টুক্‌রো করে কেটে নিন। ২টি কাঁচালংকা দিয়ে পোস্ত বেটে রাখুন। কড়াই উনুনে চাপিয়ে. জিরে শুক্‌নো কড়াইতে ভেজে ২টি তেজপাতা, ২ কাপ জল ও ১ চিমটে নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে আলুগুলো ছেড়ে ঢাকা দিন। দেখবেন যেন আঁচটা মাঝারি থাকে।

আলুগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে বাটা পোস্ত ও দুটি আস্ত কাঁচালংকা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মাখামাখা হলে নামিয়ে, ধনেপাতা কুচো ছড়িয়ে একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন।

প্রেসার কুকার ব্যবহার করলে একই পদ্ধতিতে চাপাবেন। শুধু জলের পরিমাণ ১ কাপ এবং আলু, পোস্ত বাটা ও ২টি কাঁচালংকা নুন সহ একসাথে বসিয়ে ৫ মিনিট (১টি হুইসেল দেবার পর) নামিয়ে রাখুন। পাত্রে ঢালবার আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেবেন।

বেগুনের ভর্‌তা (৪ জনের জন্য)

২টি মাঝারি বেগুন
২টি মাঝারি পেঁয়াজ কুচি
১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
২টি কাঁচালংকা কুচি
১টি বড় পাকা টমেটো
২টি টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি
৩-৪টি পেঁয়াজকলি কুচি
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● বেগুন পুড়িয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, একটু লেবুর রস দিয়ে মেখে রাখুন। এবার একটা বাসনে টমেটো আর পেঁয়াজ সামান্য জলে নেড়েচেড়ে একটু নরম করে নিন। ধনে, জিরে লংকা দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার বেগুন, ধনেপাতা, পেঁয়াজকালি দিন। কিছুক্ষণ নাড়ার পর বেশ মাখামাখা হলে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেবেন।

দই-বেগুন (৪-৬ জনের জন্য)

১টি বড় বেগুন
½ চা-চামচ সরষে
¼ চা চামচ করে ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো
সামান্য কাঁচালংকা কুচি
½ চা-চামচ লংকার গুঁড়ো
২টি রসুনের কোয়া, থেতো করা
¾ কাপ স্কিমড্ মিল্কের দই (প্রয়োজনে এক ছিটে নুন)

● বেগুনটা কাঁটাচামচে দিয়ে ফুটো ফুটো করে নিয়ে ভালো করে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা করুন। তারপর খোসা ছাড়িয়ে একটি পাত্রে মেখে রাখুন। সরষেগুলো ফ্রাইং প্যানে শুকনো ভেজে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিন। একটি সসপ্যানে ৩ টেবিল চামচ জল ফুটিয়ে ঐ সরষে এবং দই ছাড়া বেগুন সহ অন্যান্য উপকরণগুলি ঢেলে দিন। মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট নাড়তে থাকুন। আঁচ কমিয়ে নিয়ে দই দিয়ে ভালো করে মেশান এবং ঢেকে দিয়ে আঁচের উপরে ২-৩ মিনিট ঢেলে রাখুন। অল্প নরম থাকা অবস্থায় পরিবেশন করুন।

বরবটির তরকারি (৪ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম বরবটি
১টি বড় পেঁয়াজ কুচি
½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
¼ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো

● বরবটি কেটে (১৫ মিনিট) সিদ্ধ করে নিন। কড়াইতে ২ টেবিল চামচ জল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি নাড়াচাড়া করে নিন (৩ মিনিট)। তারপর হলুদ, লংকা আর গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নিন। এবার মশলার মধ্যে বরবটি দিয়ে ৫ মিনিট মত নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

সস্ দিয়ে ফুলকপি (৪ জনের জন্য)

১টি ছোট ফুলকপি
২ টেবিল চামচ cornflour
২ টেবিল চামচ স্কিমড মিল্ক পাউডার
১ টেবিল চামচ ময়দা

১½ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ পেয়ালা পেঁয়াজকলি কুচি
১টি পেঁয়াজ কুচি
১ চা-চামচ আদা কুচি
¾ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, ½ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
কয়েকটি শশার টুকরো, পাতলা গোল করে কাটা

● ফুলকপি কেটে সিদ্ধ করে নিন। বেশি নরম হওয়ার আগেই নামিয়ে নেবেন।

একটি বাটিতে Cornflower, স্কিমড মিল্ক পাউডার আর ময়দা মিশিয়ে নিন। তার মধ্যে দুধ আর লেবুর রস দিয়ে মিশিয়ে সস্ তৈরি করে নিন।

একটা বাসনে কিম্বা কড়াইতে ১ পেয়ালা জল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজকলি, পেঁয়াজ, আদা দিয়ে নেড়েচেড়ে নরম করে নিন (২—৩ মিনিট)। এবার দুধের mixture (সস্) ঢেলে দিয়ে সারাক্ষণ নাড়বেন, যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসছে। একটু ঘন হতেই নামিয়ে নেবেন। ফুলকপির টুকরো আর হলুদ, সসের মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে নিন। গোলমরিচ উপরে ছড়িয়ে দিন। কয়েকটি শশার টুকরোর উপরে একটু গোলমরিচ আর লংকাগুঁড়ো ছড়িয়ে যে পাত্রে পরিবেশন করবেন তার চারদিকে কপির উপরে গোল করে সাজিয়ে দেবেন। অন্যভাবেও garnish করা যায়—

ধনেপাতা ও কাঁচালংকা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে, অথবা
টমেটো পাতলা গোল করে কেটে, কিম্বা
লেবু পাতলা গোল করে কেটে দিতে পারেন।

□ ফুলকপি ছাড়াও অন্য কোনো সব্জি দিয়ে একই প্রণালীতে রান্না করতে পারেন। যেমন বাঁধাকপি, কিম্বা শুধু আলু দিয়েও করা যেতে পারে।

বিবিধ সস্ ও রায়তা

টমেটোর সস্

২টি মাঝারি পেঁয়াজ কুচি

৪ কোয়া রসুন কুচি

১ চা-চামচ আদা কুচি

¼ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো

¼ চা-চামচ সরষে, গোটা

¼ চা-চামচ জিরে, গোটা

৪টি বড় পাকা টমেটো

● একটা বাসনে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লংকা, সরষে আর জিরে দিয়ে একটু জলে (২ টেবিল চামচ) নেড়েচেড়ে নিন (৩-৪ মিনিট)। এবার টমেটোর টুকরো দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে অল্প জল দেবেন। ১০ মিনিট সিদ্ধ হওয়ার পর নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। আরও ১০ মিনিট আঁচে রেখে নামিয়ে নিন। ২½ পেয়ালা সস্ হবে।

সাদা সস্

২ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক, ১ টেবিল চামচ cornflour বা এরারুট

⅛ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

● ¼ পেয়ালা দুধের সঙ্গে Cornflour ভাল করে মিশিয়ে নিন। বাকি দুধ আঁচে বসান। ফোটবার ঠিক আগে Cornflour-এর mixtureটা ঢেলে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিন। একটু ফুটতেই নামিয়ে নিয়ে গোলমরিচ ছড়িয়ে দেবেন। ২ পেয়ালা মত সস্ হবে।

ছোট পেঁয়াজ আর টমেটোর সস্ (৪ জনের জন্য)

২৫০ গ্রাম ছোট পেঁয়াজ গোটা

½ পেয়ালা টমেটোর সস্ (পূর্ববৎ)

৩ চা-চামচ ভিনিগার

১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি

● পেঁয়াজ সিদ্ধ করে নিন। টমেটোর সস্ আর ভিনিগার আঁচে বসিয়ে গরম করে নিন। সিদ্ধ পেঁয়াজগুলো দিয়ে মিশিয়ে নিন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেবেন।

পুদিনা চাটনি

২ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১টি কাঁচা লংকা কুচি

১½ কাপ পুদিনা বাটা, ১ টেবিল চামচ আদা বাটা

● একটি পাত্রে লেবুর রস রাখুন। পুদিনা বাটার সঙ্গে লেবুর রস ভালো করে মেশান এবং কাঁচা লংকা কুচি ও আদাবাটা ঐ পুদিনার সঙ্গে দিয়ে ভালো করে নাড়ুন যতক্ষণ পর্যন্ত না মিশ্রণটি মসৃণ হয়।

রায়তা (৬ জনের জন্য)

২টি শশা

২ টেবিল চামচ পেঁয়াজকলি কুচি

১ পেয়ালা টক দই / বাড়িতে পাতা দই

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

১½ চা-চামচ জিরে, গোটা

১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কিম্বা পুদিনাপাতা কুচি

● শশা কুচি করে কেটে নিন। দই আর পেঁয়াজকলির সঙ্গে মিশিয়ে নিন। জিরে শুকনো কড়ায় ভেজে গুঁড়ো করে দইয়ের উপরে ছড়িয়ে দিন। গোলমরিচ, ধনেপাতা/পুদিনাপাতা ছড়িয়ে দিন।

কয়েকটি ডেশার্ট (আহারের শেষ পদ)*

রাইস পুডিং (৬ জনের জন্য)

১/৩ পেয়ালা চাল, ৩১/২ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক

২টি কলা, ১টি ডিম (শুধু সাদা অংশটি)

১/২ পেয়ালা ছানা

১/৩ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক, কয়েকটি কিসমিস

● দুধের মধ্যে চাল দিয়ে ফুটিয়ে ঘন করে নিন। ঠিক যেমন-ভাবে চালের পায়েস করা হয়। চাল সিদ্ধ হলে আর দুধ ঘন হয়ে এলে একটি বাটিতে ঢেলে রাখুন।

ডিমের সাদা অংশটি ভালো করে ফেটিয়ে নিন, যতক্ষণ না খুব ঘন ফেনার মত হচ্ছে। এবার ছানা আর দুধ আলাদা একটি বাটিতে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন। পাতলা ক্ষীরের মতো হবে। প্রয়োজন হলে মেশানোর সময় একটু বেশি দুধ দেবেন। মেশানোর পর একটা কাঁটা দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এবার ডিমের ফেটানো সাদা অংশটির সঙ্গে মিশিয়ে নিন। কয়েক ফোঁটা Vanilla essence দিন। সামান্য এলাচ গুঁড়ো দিতে পারেন।

এবার কলা খুব ছোট ছোট টুকরো করে কেটে পায়েসের মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে নিন। কয়েকটি কিসমিস দিতে পারেন। তারপর ছানার mixture-টা পায়েসের মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে নিন। কয়েকটি আপেলের টুকরো সিদ্ধ করে পায়েসের উপর ছড়িয়ে দিতে পারেন, কিম্বা আরও কয়েকটি কলার টুকরো দিতে পারেন। যেদিন রান্না করবেন সেদিন খেয়ে শেষ করলে ভাল হয়। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে খেলে ভালো লাগবে।

* আমিষ রান্নার আগেই ডেশার্ট-এর রেসিপি বলছি, নিরামিষাশীদের সুবিধার্থে।

সুজির পায়েস (৪-৫ জনের জন্য)

½ পেয়ালা সুজি, ৩ পেয়ালা স্কিমড মিল্ক
২টি তেজপাতা, ২টি কলা, Vanilla essence.

● সুজি শুকনো কড়াইতে ভেজে নিন। দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। তারপর কলা খুব ছোট টুকরো করে মিশিয়ে নিন। বেশ পাতলা থাকতে নামিয়ে নেবেন। কলা দেওয়ার পর একটু চেখে দেখবেন। যদি মনে হয় মিষ্টি কম হয়েছে, তাহলে আর একটি কিংবা আধখানা কলার টুকরো দেবেন। বেশি ঘন হয়ে গেলে আরও একটু দুধ মিশিয়ে পাতলা করে নেবেন। কয়েক ফোঁটা vanilla essence দেবেন। কয়েকটি কিসমিস দিলে খুব ভালো হয়।

হরেক রকম ফলের স্যালাড

* ছানার সঙ্গে স্কিমড মিল্ক মিশিয়ে নিন। পাতলা ক্ষীরের মত হবে। একটু vanilla essence দিতে পারেন। এর সঙ্গে যে কোন মিষ্টি ফলের রস মিশিয়ে নিতে পারেন। যে কোন ফল কেটে ফলের টুকরোর উপর ঢেলে পরিবেশন করুন।

মিষ্টি—এক

**বাড়িতে-পাতা চিনি-ছাড়া দই কিম্বা দোকানের সাদা টক দই
যে কোন মিষ্টি ফল**

* দইয়ের সঙ্গে ইচ্ছেমত যে কোন মিষ্টি ফল মিশিয়ে নিতে পারেন। আপেল কেটে সিদ্ধ করে/কলা slice করে কেটে, কমলা লেবুর রস মিশিয়ে আর কয়েকটি কোয়া ছাড়িয়ে দইয়ের উপর ছড়িয়ে দিতে পারেন।

মিষ্টি—দুই

* ছানার সঙ্গে যে কোন মিষ্টি ফল কেটে বা ফলের রস মিশিয়ে দিতে পারেন।

মাছের বিভিন্ন রান্না

মাছের স্টু (৬ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ
৪ টেবিল চামচ ভিনিগার
১টি মাঝারি পেঁয়াজ কুচি
৩-৪টি পেঁয়াজকলি কুচি
৮টি আস্ত ছোট পেঁয়াজ
১ চা-চামচ আদা কুচি
৪টি গাজর
৪টি পাকা টমেটো
½ পেয়ালা মটরশুঁটি
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২টি মাঝারি আলু সিদ্ধ

● প্রথমে মাছের টুকরোগুলো ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখুন। একটা বাসনে ½ পেয়ালা গরম জল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আস্ত ছোট পেঁয়াজ, পেঁয়াজকলি আর আদা ২-৩ মিনিট নেড়েচেড়ে নিন। গাজর টুকরো, টমেটো টুকরো, মটরশুঁটি দিয়ে, আরও ½ পেয়ালা জল দিয়ে, ঢেকে সিদ্ধ করতে দিন। প্রয়োজন মতো লেবুর রস, গোলমরিচ আর মাছের টুকরো ভিনিগার থেকে তুলে দিয়ে মিনিট ১৫ ফুটিয়ে নিন। সব শেষে সিদ্ধ আলুর টুকরোগুলো দেবেন। নামবার আগে অল্প একটু ময়দা জলে গুলে দেবেন, যদি ঝোলটা একটু ঘন করতে হয়।

সবজি মাছ (৫-৬ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ, ছোট টুকরো করা– মাছের jillet হলে ভালো হয়, অর্থাৎ fish fry করার জন্য যেমনভাবে পাতলা স্লাইস করে মাছ কাটা হয়।

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
১টি গাজর, ছোট টুকরো করা
½ পেয়ালা মটরশুঁটি
৪ টেবিল চামচ টক দই
২ চা-চামচ corntlour কিম্বা ময়দা
১টি পেঁয়াজ কুচি, খুব ছোট করে কাটা
১ চা-চামচ আদা কুচি
১-২টি টমেটো
১টি ক্যাপসিকাম (ছোট টুকরো করা) / কাঁচালংকা
১টি ছোট লেবু, পাতলা গোল করে কাটা
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

● মাছে লেবুর রস আর গোলমরিচ মাখিয়ে ½ ঘণ্টা খানেক ফ্রিজে রেখে দিন। এমনি বাইরেও রাখতে পারেন। মটরশুঁটি, গাজর সিদ্ধ করে রাখুন।

একটা পাত্রে দই, cornflour কিংবা ময়দা, পেঁয়াজ আর আদা, ৪ টেবিল চামচ জল দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার এটা মাছের টুকরোগুলোর উপর ঢেলে মাছের সঙ্গে মেখে নিন। মশলা সহ মাছের টুকরোগুলো একটি বড় মুখ ঢাকা বাসনে পাশাপাশি করে রাখুন। টমেটো গোল করে কেটে মাছের চারদিকে ছড়িয়ে দিন। গাজর, মটরশুঁটি, কাঁচালংকা কুচি মাছের উপর ছড়িয়ে দিন। শেষে লেবুর টুকরো দেবেন।

একটি বড় ডেকচিতে কিংবা বাসনে জল দিয়ে মাছ সহ ঢাকা পাত্রটি তার মধ্যে বসিয়ে একটি ঢাকনা দিয়ে ডেকচির মুখটা ঢেকে দিন। মিনিট ২০-২৫ পরে, মাছগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে নামিয়ে নেবেন। এতে কিছুটা ঝোল থাকবে, বেশি শুকনো হবে না। রান্না হয়ে গেলে গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন।

দই মাছ (৪ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ
২ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
১ চা-চামচ আদা বাটা
১ পেয়ালা টক দই
২টি তেজপাতা, ৩-৪টি পেঁয়াজকলি কুচি
৪টি কাঁচালংকা, ২টি পাকা টমেটো
½ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
½ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি

● মাছের টুকরোগুলোতে প্রথমে গোলমরিচ আর লেবুর রস মেখে নিন। তারপর হলুদ দিয়ে মেখে নিন। দই ভালো করে ফেটিয়ে আদা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে মাছ দিয়ে মেখে নিন। কড়াইতে অল্প জল দিয়ে টমেটোর টুকরো, পেঁয়াজকলি কুচি, কাঁচালংকা, তেজপাতা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে মাখামাখা করে নিন। ধনে, জিরে দিয়ে মিশিয়ে নিন। এরপর মাছ দিয়ে তার ওপর গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। আন্দাজমতো জল দিয়ে ঢেকে দেবেন। পরিবেশন করার আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন।

সস্ দিয়ে মাছ (৬ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ
৪টি বড় টমেটো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
১ পেয়ালা সাদা সস্ (কিভাবে করতে হবে বলা হয়েছে)
ধনেপাতা, পেঁয়াজকলি, কাঁচালংকা, প্রতিটি কুচি করে কাটা

● মাছের টুকরোগুলো অল্প জলে সিদ্ধ করে নিন। বেশি সিদ্ধ করবেন না। টুকরোগুলো আস্ত থাকবে। সিদ্ধ হলে লেবুর রস আর গোলমরিচ মাখিয়ে নিন।

টমেটো সিদ্ধ করে রসটা ছেঁকে নিয়ে মাছে ঢেলে দিন। তারপর সাদা সস্ দিন। গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজকলি কুচি ও লংকা কুচি সসের উপর ছড়িয়ে দেবেন।

সরষে দিয়ে মাছ (৬ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ (যে কোন মাছের টুকরো কিম্বা আস্ত ছোট মাছ)
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২টি টমেটো
১ চা-চামচ সরষে বাটা
১ চা-চামচ আদা বাটা
১ পেয়ালা ধনেপাতা কুচি
২ টেবিল চামচ লেবুর রস

½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো

২টি কাঁচালংকা কুচি

১টি ছোট লেবু, পাতলা গোল করে কাটা

● মাছ ধুয়ে লেবুর রস, গোলমরিচ, তারপর হলুদ দিয়ে মেখে নিন।

টমেটো, জলে অল্পক্ষণ সিদ্ধ করে, টমেটোর রসটা ছেঁকে নিন। এবার একটা বাটিতে সরষে, আদা আর টমেটোর রসটা ৩ টেবিল চামচ জল দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে মাছের টুকরোগুলোতে ঐ মশলাটা ভালো করে মেখে নিন। একটা ঢাকা দেওয়া বড় বাসনে মশলা সহ মাছের টুকরোগুলো পাশাপাশি রেখে, লংকা কুচি উপড়ে ছড়িয়ে দিন। এরকমভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা রেখে দিলে ভাল হয়।

একটা বড় ডেকচিতে কিম্বা বাসনে জল দিয়ে মাছ সহ ঢাকা পাত্রটি তার মধ্যে বসিয়ে একটা বড় ঢাকনা দিয়ে ডেকচিটা ঢেকে দিন। মিনিট ২০-২৫ পরে, ভালো সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নেবেন। বেশি ঝোল থাকলে পাত্রটি আঁচে বসিয়ে ঝোলটা একটু শুকিয়ে নেবেন। পরিবেশনের পাত্রে ঢেলে মাছের উপরে লেবুর টুকরো গোল করে সাজিয়ে দেবেন।

মাছের টক (৬ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম মাছ

২ টেবিল চামচ লেবুর রস

½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

১ টেবিল চামচ তেঁতুল

১ পেয়ালা গরম জল

২টি টমেটো

১/৩ চা-চামচ সরষে, গোটা

১টি পেঁয়াজ কুচি

২ চা-চামচ আদা কুচি

১/২ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো

২ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো

১/২ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

৪ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি

মাছের টুকরোগুলোতে লেবুর রস, গোলমরিচ মাখিয়ে নিন। তেঁতুল, গরম জলে ভিজিয়ে জলটা ছেঁকে নিন।

একটা কড়াইয়ে ১/৪ পেয়ালা জল দিয়ে টমেটো টুকরো করে দিয়ে নেড়েচেড়ে গরম করে নিন। তারপর সরষে, পেঁয়াজ আর আদা দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট নেড়েচেড়ে মাখা মাখা করে নিন। এই সময় প্রয়োজন হলে আরও একটু জল দেবেন। এবার হলুদ আর জিরে দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর তেঁতুলের জল আর গোলমরিচ দিয়ে ঝোলটা ফুটতে আরম্ভ করলে মাছের টুকরোগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিন। মাছ সিদ্ধ হলে নামিয়ে নেবেন।

পরিবেশন করার আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে আরও একটু লেবুর রস আর গোলমরিচ দেবেন।

মাংসের বিভিন্ন রান্না

মাংস (৫ জনের জন্য)

৫০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস
৩টি মাঝারি পেঁয়াজ বাটা
১ চা-চামচ আদা বাটা
১ চা-চামচ রসুন বাটা
১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
২ চা-চামচ ধনে বাটা
১ চা-চামচ জিরে বাটা
২ টেবিল চামচ ভিনিগার কিম্বা লেবুর রস
½ পেয়ালা টক দই (ফেটানো)
৩-৪টি কাঁচা লংকা
২টি বড় পাকা টমেটো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি
১ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো

● মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা, ভিনিগার আর দই মেখে রাখুন (১ ঘন্টা মতো)। একটা বাসনে টমেটোর টুকরো অল্প জলে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটু নরম করে হলুদ, ধনে, জিরে বাটা দিয়ে মিশিয়ে নিন। কাঁচালংকা, মাংস তারপর আর বাকি সব মেশানো মশলা দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে আন্দাজমতো জল দেবেন। নামাবার আগে গোলমরিচ, ধনেপাতা কুচি আর গরম মশলা ছড়িয়ে দেবেন। পরিবেশন করার আগে কয়েকটি পেঁয়াজকলি কুচি করে কেটে মাংসের উপরে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

মাংসের কোপ্তা (৮-১০ জনের জন্য)

১ কিলো মাংসের কিমা
১ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
১ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
৪ টেবিল চামচ এরারুট
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
৩ টেবিল চামচ ঠাণ্ডা জল
২ চা-চামচ আদা কুচি
১ পেয়ালা পেঁয়াজকলি কুচি
২ টেবিল চামচ বেসন
২ পেয়ালা টক দই
(১টি দারুচিনি, ৪ টি লবঙ্গ, ৩টি এলাচ) গোটা গরম মশলা
২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি

● কিমার সঙ্গে (দেখবেন যেন কিমার মধ্যে একদম হাড়ের টুকরো না থাকে, থাকলে কোপ্তা নরম হবে না) গরম মশলা, জিরে, গোলমরিচ আর এরারুট ঠাণ্ডা জলে গুলে ভালো করে মেখে, গোল গোল করে বড় মার্বল সাইজের করে নিন। একটা বড় বাসনে জল বসিয়ে ফুটতে আরম্ভ করলে কোপ্তাগুলো দিয়ে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে নিন।

আর একটি বাসনে আদা আর পেঁয়াজকলি ৪ টেবিল চামচ জলে নাড়াচাড়া করে একটু নরম করে নিন। আঁচ থেকে সরিয়ে বেসন দিয়ে আবার আঁচে বসিয়ে ১ মিনিট নেড়ে নিন। দইটা ভালো করে ফেটিয়ে দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার কোপ্তাগুলো ছেড়ে দিন। গোটা গরম মশলা দিন। যে জলে সিদ্ধ করেছেন, প্রয়োজনে কম-বেশি করে মাথায় মাথায় সেই জল দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝেমাঝে নাড়তে হবে। ভালো নরম হতে ৩০-৪০ মিনিট লাগবে। কম আঁচে

করলে ভালো হয়। কম আঁচে করার সুবিধা না থাকলে, আন্দাজ মতো জল দেবেন। রান্নার পর বেশ ঘন ঝোল থাকলে ভালো হয়। পরিবেশন করার আগে উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবেন।

মুরগির মাংস (৬ জনের জন্য)

১টি মাঝারি মুরগির মাংস
১টি বড় পেঁয়াজ বাটা
২ কোয়া রসুন বাটা
১ চা-চামচ আদা বাটা
১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
½ পেয়ালা টক দই
৩-৪টি বড় পাকা টমেটো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২-৩টি কাঁচা লংকা
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
১ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ পেয়ালা ধনেপাতা কুচি

● মুরগির টুকরোর সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, টক দই মেখে ঘন্টা খানেক রেখে দিন। একটা বাসনে টমেটোর টুকরো সামান্য জলে কিছুক্ষণ নেড়ে নরম করে হলুদ, ধনে, গোলমরিচ, লংকা দিন। মুরগি আর বাকি মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে ½ পেয়ালা জল দেবেন। ঠিক সিদ্ধ হয়ে আসার আগে গরম মশলা, ধনেপাতা কুচি আর লেবুর রস দিন।

তন্দুরি চিকেন (৬ জনের জন্যে)

১টি মাঝারি মুরগি (বড় বড় টুকরো করা)
১½ চা-চামচ লংকা গুঁড়ো
৩ টেবিল চামচ লেবুর রস
৪½ টেবিল চামচ টক দই
৫ কোয়া রসুন, বাটা
২ চা-চামচ আদা বাটা
১ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো
১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
½ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো
½ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো

● ছুরি দিয়ে মুরগির টুকরোগুলোর ওপর সামান্য চিরে চিরে নিন, যাতে মশলাগুলো ভালো করে মাংসের মধ্যে ঢোকে। লংকাগুঁড়ো, লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ জলে মিশিয়ে মাংসের টুকরোগুলোতে ভালো করে মেখে নিন। আধঘণ্টা এইভাবে রেখে দিন। রসুন, আদা, জিরে, ধনে, গোলমরিচ, গরম মশলা আর হলুদ একসঙ্গে মিশিয়ে তারপর টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাংসের টুকরোগুলোতে মশলাটা ভালো করে মেখে নিন। ফ্রিজ থাকলে এইভাবে ঢেকে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিলে ভালো হয়। নয়তো ২-৩ ঘণ্টা এমনি ঢেকে রেখে দেবেন।

Oven-এ রান্না করলে অবশ্যই ভালো হয়। Oven থাকলে ৪০ মিনিট মত গরম Oven-এ বসিয়ে বেক করে নেবেন। বেক করার সময় ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই।

প্রেসার কুকার কিম্বা উনুনেও সাধারণভাবে রান্না করা যেতে পারে। ঠিক তন্দুরির স্বাদ না হলেও খেতে ভালো হবে।

প্রেসার কুকার কিম্বা উনুনে করলে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ½পেয়ালা গরম জল দিয়ে ঢেকে বসিয়ে দেবেন। মাংস সিদ্ধ হলে বেশ শুকনো করে নেবেন, ঝোল থাকবে না। পাত্রে ঢেলে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালংকা কুচি, ধনেপাতা আর লেবুর রস উপরে ছড়িয়ে দেবেন।

মুরগির ভিনডালু (৬ জনের জন্য)

১টি মাঝারি মুরগি
২ টেবিল চামচ জিরে
১ টেবিল চামচ আদা কুচি
১ টেবিল চামচ রসুন কুচি
½ পেয়ালা ভিনিগার
১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো
½ চা-চামচ গরমমশলা গুঁড়ো
½ চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো
২টি পাকা বড় টমেটো

● জিরে, সরষে, লংকা, আদা, আর রসুন একসঙ্গে বেটে ভিনিগারের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই মশলার মধ্যে ধনে, গরমমশলা আর গোলমরিচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর মুরগির টুকরোগুলোতে ভালো করে মেখে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন।

একটা বাসনে টমেটোর টুকরো সামান্য জলে নেড়েচেড়ে নরম করে মুরগির টুকরোগুলো মশলা সহ দিয়ে টমেটোর সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে রান্না করার সুবিধে থাকলে, কম আঁচে বসিয়ে ঢেকে দেবেন যতক্ষণ না সিদ্ধ হচ্ছে। মাঝেমাঝে নাড়তে হবে যাতে না তলা ধরে যায়। প্রেসার কুকারে করলেও ভালো হয়। দরকার হলে ½ কাপ গরম জল দেবেন রান্নার সময়। রান্নার পর ঘন ঝোল থাকলে ভালো হয়।

সস্ দিয়ে চিকেন (৫ জনের জন্য)

১টি মুরগি, ৫০০ গ্রাম, ছোট টুকরো করা
৩ পেয়ালা জল
১টি বড় পেঁয়াজ কুচি
১ চা-চামচ আদা কুচি
৩-৪টি তেজপাতা
১ পেয়ালা পেঁয়াজকলি কুচি
(৪টি লবঙ্গ, ৪টি এলাচ, ১টি ছোট দারুচিনি) গোটা গরম মশলা
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
½ চা-চামচ গোলমরিচ

½ পেয়ালা মটরশুঁটি
৩-৪টি গাজর, পাতলা লম্বা করে কাটা

---

৩ টেবিল চামচ Cornflour
৩ টেবিল চামচ স্কিমড মিল্ক পাউডার
২ টেবিল চামচ ময়দা
২ টেবিল চামচ লেবুর রস
২ পেয়ালা স্কিমড দুধ

½ পেয়ালা পেঁয়াজ কুচি
১ চা-চামচ আদা কুচি

একটি মাঝারি টমেটো, পাতলা গোল করে কাটা
১-২টি কাঁচা লংকা কুচি

● মুরগির টুকরোগুলো ৩ পেয়ালা জলের মধ্যে পেঁয়াজ, আদা, তেজপাতা, পেঁয়াজকলি, গরম মশলা, লেবুর রস আর গোলমরিচ

দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। প্রয়োজন হলে বেশি জল দেবেন। খুব ভালো সিদ্ধ হলে, টুকরোগুলো তুলে নিয়ে, জলটা ছেঁকে নিন। জলটা আলাদা করে রেখে দেবেন। এবার মুরগির টুকরোগুলো থেকে হাড়গুলো বাদ দিয়ে মাংস ছোট লম্বা লম্বা টুকরো করে নিন। এরকম ভাবে রান্না করলে খেতে ভালো হয়। তবে যদি এ-ভাবে করতে না চান, তাহলে টুকরোগুলো গোটা রাখতে পারেন।

গাজর আর মটরশুঁটি সিদ্ধ করে রাখবেন। এবার একটা বাটিতে Cornfiour, মিল্ক পাউডার আর ময়দা মিশিয়ে নিন। তারপর দুধ আর লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

মুরগি সিদ্ধ করা জলটা যে-বাসনে রান্না করবেন তাতে ঢেলে আঁচে বসান। ২½-৩ পেয়ালা মতো জল থাকলে ভালো হয়। জলের মধ্যে পেঁয়াজ আর আদা দিয়ে ২-৩ মিনিট নেড়েচেড়ে নরম করে নিন। এবার দুধের mixtureটা ঢেলে সারাক্ষণ নাড়তে থাকুন, ঘন হওয়া অবধি। ঘন হলে কাটা টমেটো ছড়িয়ে ও লংকা দিয়ে নামিয়ে রাখুন।



সত্তর বছরের যুবক নাথান প্রিটিকিন

তুকতাক কিংবা ম্যাজিক নয়
অপারেশন বা অলৌকিক জড়িবটি নয়
... খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন
আর স্বাভাবিক চেষ্টা

সব রকমের হৃদরোগ,
ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস,
হাঁপানী

সেই হাজার রোগের একটি দাওয়াই
শিথিল যৌবনের পুনরুত্থান পর্বের
গান

প্রিটিকিন প্রোগ্রাম
নাথান প্রিটিকিন থেকে
চিন্ময় সেনগুপ্ত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতবর্ষ
এ এক নয়া অভ্যাস, নয়া সাধনার
আশ্চর্য দলিল

আর ওষুধের হিজিবিজি নয়
বিনা ওষুধেই রোগ নিরাময়



